বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—ভাদ্র)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অহল্যা	বীরবল	২২৮
অচলায়তন	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩০০
একটি ঘটনা	প্রবোধ ঘোষ	৯৪
কৌতুকময়ী	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৯৫
কথা ও সুর	প্রমথ চৌধুরী	২১০
জাপানের কথা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২
টী-পার্টি	হারিতকৃষ্ণ দেব	১০৫
তপস্বিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৮
দুখানি চিঠি	„ „	২৩৭
ধরতাই বলি	ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৯৭
নূতন ও পুরাতন	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৪৮
পয়লা নম্বর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭১
পরমায়ু	„ „	৯২
প্রাণের কথা	প্রমথ চৌধুরী	১৯৯
বর্ত্তমান সাহিত্য	বরদা চরণ গুপ্ত	৩৩
বৈজ্ঞানিক ইতিহাস	অতুল চন্দ্র গুপ্ত	৬৫
বাঙ্গলা ভাষার কুলের খবর	প্রমথ চৌধুরী	২১৬
ভাষার কথা	নলিনীকান্ত ভট্টশালী	৫৩
ঐ	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৮০

মন্তব্য	প্রমথ চৌধুরী	... ... ৫৭
ঐ	„ „	... ... ৮৭
মুখরক্ষা	সতীশ চন্দ্র ঘটক	... ... ১৩৯
লিখিবার ভাষা	প্রমথ চৌধুরী	... ... ১৭
শিক্ষা-সমস্যা	প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	... ... ৩১২
সম্পাদকের কৈফিয়ৎ	প্রমথ চৌধুরী	... ... ৩
সাহিত্যের সার্থকতা	বীরবল	... ... ৭
সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য	দয়াল চন্দ্র ঘোষ	... ... ১৫৫
সঙ্গীতের মুক্তি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ... ২৫৫
স্বামী-স্ত্রী	বরদা চরণ গুপ্ত	... ... ২৮৭

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(আশ্বিন—চৈত্র)

বিষয়			পৃষ্ঠা
অন্নচিন্তা	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	...	৩২১
আচার ও বিচার	শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ ...	...	৩৪৬
আমার ধর্ম্ম	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	...	৩৬৮
কংগ্রেসের দলাদলি	বীরবল ...	...	৩৫৮
গীতি-কবিতা	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৪২১
গ্রীসে ভাষার লড়াই	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	...	৫৮০
'ঘরে-বাইরে'	শ্রীঅরবিন্দ সেন ...	...	৫৪৯
ছন্দ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	...	৬১৫
জাতীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা	শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার	...	৬২৪
তোতা কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬০৮
দুখানি ফরাসী চিঠি	(শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ প্রাপ্ত)		৪১৮
'পঙ্ক'	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	৪৮২
পাত্র ও পাত্রী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	...	৪৯৫
পত্র	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	...	৫৯২
ফরমায়েসি-গল্প	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	...	৭০৪
বাংলার ভবিষ্যৎ	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	..	৪০৫
বাংলার বেথাপ বর্ণমালা	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৪৬৭
বালাই	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ...	...	৬০৩
বাজে তর্ক	শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন ...	...	৬৬৪

বিত্তাপতি	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ৩৪৮
বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়	শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত ...	... ৪০৬
বেহিসাবের নিকাশ	শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত ...	... ৬১৭
ভদ্রতা	শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ৫২১
লাভালাভ	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ...	... ৫৪৬
শরৎ	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	... ৩৫৭
শক্তিমানের ধর্ম্ম	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী...	... ৫৫৫
সুর ও তাল	শ্রীশিশির কুমার সেন...	... ৫৬৯
সাহিত্য-বিচার	শ্রীশিশির কুমার সেন...	... ৩৩৭
হৈমা	শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য	... ৬৪০

বৈশাখ, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

গত বৎসর সবুজ পত্র আমি দস্তুরমত চালাতে পারি নি, এর জন্য ও পত্রের গ্রাহকসমাজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ছাপার ভুলকে আমি তেমন মারাত্মক দোষ বলে মনে করি নে,—কেননা পাঠকমণ্ডলী ও ভুল নিজগুণেই অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারেন।

কিন্তু সবুজ পত্র যে, শেষ ছমাস ঠিক মাসে মাসে বেরয় নি, এইটেই হয়েছে তার মহাত্রুটি। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তারিখের শাসন না মানবার পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন,—কিন্তু সে সব যতই সুযুক্তি হোক না কেন, তদনুসারেই যে ফাল্গুনের পত্র চৈত্রে এবং চৈত্রের পত্র বৈশাখে বেরিয়েছে, এ কথা বল্‌লে ঠিক কথা বলা হবে না। রায় মহাশয়ের সুমুখে অনেক সময় পড়ে আছে, সুতরাং সে সময়ের তিনি ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার কর্‌তে পারেন, এবং তাঁর পক্ষে তা করাই স্বাভাবিক, কেন না দিনগোনা যৌবনের ধর্ম্ম নয়। অপরপক্ষে এ পৃথিবীতে আমাদের কাজের সময় সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে—সুতরাং আমাদের পক্ষে সময়ের একটা হিসেব করে চলা আবশ্যক, অর্থাৎ আমরা তারিখের শাসন মান্‌তে বাধ্য। আমরা যে এ ক্ষেত্রে সে শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, তার একমাত্র কারণ—সে নিয়ম রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর হয় নি।—

কলম চালানো আমার সখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়। এর প্রমাণ, ব্যবসায়ীর হাতে পড়্‌লে সবুজ পত্র হয় এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত, নয়ত তার চেহারা বদলে যেত। অব্যবসায়ীর হাতে পড়েছে বলে, সবুজ পত্র আজও প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেই একই কারণে তা অকালে প্রচারিত হচ্ছে। এই কালবিলম্বের জন্য আমরা অবশ্য লজ্জিত আছি, তবে সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, এ পত্রের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকেরা আমাদের কাছ থেকে কোনও দস্তুরমাফিক জিনিস পাবার বিশেষ প্রত্যাশা রাখেন না।

গত বৎসরের শেষাশেষি সবুজ পত্রের যে কখন কখন পঁয়ত্রীশ দিনে মাস হয়েছে—তার আরও একটি কারণ আছে। সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম থাকা সত্ত্বেও তার একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে প্রথম দু বৎসর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল—কি ওজনে, কি পরিমাণে—এ পত্রের প্রধান সম্পদ।—সবুজ পত্র বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যদি কোনরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ করে থাকে ত সে মুখ্যতঃ তাঁর লেখার গুণে। সুতরাং গতবৎসরের আরম্ভেই তিনি যখন সমুদ্রযাত্রা কর্‌লেন, তখন জলে পড়্‌লুম আমি!

রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে এ কাগজ চালাতে পারব, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি। সুতরাং মাসের পর মাস একখানি করে গোটা সবুজ পত্র আমার পক্ষে একহাতে গড়ে তোলা যে অসম্ভব,—এ জ্ঞান আমি কখনই হারাই নি। আর যদি আমি এ কাগজ চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে নিতে

উদ্যত হতুম, তাহলে সমালোচকেরা আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌তেন না। এ ত গেল লেখার কথা। তারপর আসে পরের লেখার সম্পাদনের কথা; সে বিষয়েও আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কেননা সবুজ পত্রের সম্পাদককে ও কাজের ব'লাই নিয়ে বড় একটা ভুগতে হয় নি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পৃথিবীর কোন দেশের কোন সম্পাদকেরই নেই—দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার চিরদিনই ছিল,—কিন্তু সে লেখক হিসেবে, সম্পাদক হিসেবে নয়। এই কারণে গত বৎসর আমি সবুজ পত্র বন্ধ করে দেবারই পক্ষপাতী ছিলুম। শেষটা কিন্তু যাঁর অভিপ্রায়মত সবুজ পত্র প্রকাশ করা হয়, তাঁরই ইচ্ছামত ও পত্র বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আমি প্রতিশ্রুত হই। আমি বেশ জানতুম যে, রবীন্দ্রনাথ যে দেশেই থাকুন, বাংলার মায়া তিনি কাটাতে পার্‌বেন না,—এবং সবুজ পত্র তাঁর প্রতিভার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হবে না। এ আশায় আমি নিরাশ হই নি। প্রথম ছ'মাস তিনি নিয়মিত সবুজ পত্রের খোরাক জুগিয়েছেন। তার পর থেকেই সবুজ পত্র, অসাময়িক পত্র হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় যে ও কাগজ আমরা টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পেরেছি, এতেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।—দু'দিন পরে হলেও সবুজ পত্র যে মাসের পর মাস সশরীরে দেখা দিয়েছে, সে সবুজ পত্রের নবীন লেখকদের গুণে। তাঁদের একান্ত সহানুভূতি ও আনুকুল্য ব্যতীত, আমার পক্ষে সবুজ পত্র চালানো অসম্ভব হত। যখন সবুজ পত্রের উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ চলছিল, যখন

বান্ধবেরাও আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ছিলেন, তখন যে যুবকের দল কায়মনোবাক্যে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি। সবুজ পত্রের প্রতি এঁদের প্রীতির মূল্য আমার কাছে যে এত বেশী, তার কারণ এ প্রীতির মূলে এক সাহিত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। এ স্থলে এঁদের নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কেননা সবুজ পত্রের পাঠকমাত্রেরই নিকট এখন তাঁরা নামে পরিচিত। মনের ভাব স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করবার সংকল্প ও শক্তি এঁদের সকলেরই আছে, সুতরাং এঁদের হাতে যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং আশা করি সাহিত্য-চর্চ্চার সখটা এঁরা কোন কালেই ত্যাগ কর্‌বেন না।

রবীন্দ্রনাথ আবার স্বদেশে ফিরেছেন, সুতরাং সবুজ পত্রের সকাল-মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই; অতএব এ কথা আমি অনেকটা ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, ভবিষ্যতে আমরা তারিখের শাসন মেনে চল্‌তে না পারলেও, মাসের শাসন সম্ভবতঃ লঙ্ঘন কর্‌ব না।

সাহিত্যের সার্থকতা।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্যের আসরে মুখ খুললেই ম্যালেরিয়ার কথা তোলেন,—অমনি নবীন সাহিত্যিকদের দলে হাসির গর্‌রা পড়ে যায়। এ হাসির কারণ কি,—তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ম্যালেরিয়া যে এদেশে আছে, এবং ও পাপ দূর না হলে দেশের যে মঙ্গল নেই—এ কথা এক পাগল ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আর নবীন সাহিত্যিকদের সকলেরই যে মাথা খারাপ, এ কথা বল্‌লে একটু বেশী বলা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, নবীনদেরও মস্তিষ্ক এবং হৃদয় ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, আর সে হৃদয়ের মাপ ও সে মস্তিষ্কের ওজনও গড়পড়তায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। এ সত্ত্বেও তাঁরা ম্যালেরিয়া দমনের প্রস্তাব শুনলে হাসেন কেন?—হাসেন এই কারণে যে, প্রস্তাবটা করা হয় সাহিত্যের আসরে। ম্যালেরিয়াকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ও-বস্তুকে কেঁদেও ভাসিয়ে দেওয়া যায় না! তাই সরকার মহাশয় যখন এই নিয়ে করুণরসের অবতারণা করেন, তখন সভাস্থলে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। কেননা সকলেই জানেন—অন্ততঃ সকলের জানা উচিত যে, ম্যালেরিয়া কাব্যের বিষয় নয়; যদিচ ও-বস্তুর সংস্পর্শে স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়! বাংলা দেশের ঘাড় থেকে ও ভূত নামানোও

বান্ধবেরাও আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ছিলেন, তখন যে যুবকের দল কায়মনোবাক্যে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সবুজ পত্রের প্রতি এঁদের প্রীতির মূল্য আমার কাছে যে এত বেশী, তার কারণ এ প্রীতির মূলে এক সাহিত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। এ স্থলে এঁদের নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কেননা সবুজ পত্রের পাঠকমাত্রেরই নিকট এখন তাঁরা নামে পরিচিত। মনের ভাব স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করবার সংকল্প ও শক্তি এঁদের সকলেরই আছে, সুতরাং এঁদের হাতে যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং আশা করি সাহিত্য-চর্চ্চার সখটা এঁরা কোন কালেই ত্যাগ করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ আবার স্বদেশে ফিরেছেন, সুতরাং সবুজ পত্রের সকাল-মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই; অতএব এ কথা আমি অনেকটা ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, ভবিষ্যতে আমরা তারিখের শাসন মেনে চল্‌তে না পারলেও, মাসের শাসন সম্ভবতঃ লঙ্ঘন করব না।

সাহিত্যের সার্থকতা।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্যের আসরে মুখ খুললেই ম্যালেরিয়ার কথা তোলেন,—অমনি নবীন সাহিত্যিকদের দলে হাসির গর্‌রা পড়ে যায়। এ হাসির কারণ কি,—তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ম্যালেরিয়া যে এদেশে আছে, এবং ও পাপ দূর না হলে দেশের যে মঙ্গল নেই—এ কথা এক পাগল ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আর নবীন সাহিত্যিকদের সকলেরই যে মাথা খারাপ, এ কথা বল্‌লে একটু বেশী বলা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, নবীনদেরও মস্তিষ্ক এবং হৃদয় ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, আর সে হৃদয়ের মাপ ও সে মস্তিষ্কের ওজনও গড়পড়তায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। এ সত্ত্বেও তাঁরা ম্যালেরিয়া দমনের প্রস্তাব শুনলে হাসেন কেন?—হাসেন এই কারণে যে, প্রস্তাবটা করা হয় সাহিত্যের আসরে। ম্যালেরিয়াকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ও-বস্তুকে কেঁদেও ভাসিয়ে দেওয়া যায় না! তাই সরকার মহাশয় যখন এই নিয়ে করুণরসের অবতারণা করেন, তখন সভাস্থলে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। কেননা সকলেই জানেন—অন্ততঃ সকলের জানা উচিত যে, ম্যালেরিয়া কাব্যের বিষয় নয়; যদিচ ও-বস্তুর সংস্পর্শে স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়! বাংলা দেশের ঘাড় থেকে ও ভূত নামানোও

সাহিত্যের কাজ নয়—কেননা কোনও সাহিত্যিক এ ব্যাপারের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র জানেন না। ফরমায়েস পেলে অবশ্য অনেক সাহিত্যিক বীররসাত্মক মশকবধকাব্য, অথবা রৌদ্ররসাত্মক জ্বরান্তক নাটিকা রচনা করতে পারেন—কিন্তু তাতে করে ম্যালেরিয়ার একটি কীটাণুও মারা যাবে না, লাভের মধ্যে শুধু সাহিত্যরাজ্যে ম্যালেরিয়া ঢুকবে। সরকার মহাশয় যখন প্রবীণ সাহিত্যিক—তখন সাহিত্যের এ অক্ষমতার কথা যে তিনি জানেন না, তা হতেই পারে না। সুতরাং আসলে তাঁর প্রস্তাব এই যে, সকলে মিলে আগে দেশের এই দুরবস্থা দূর করো, পরে অবসরমত আরামে সকলে মিলে সাহিত্যচর্চ্চা করা যাবে। দিনে কর কাজকর্ম্ম, গান-বাজনা হবে এখন রাত্তিরে,—ইতিমধ্যে যদি না সকলে ঘুমিয়ে পড়ো! আগে কাজ, পরে সখ। সাহিত্যচর্চ্চা যে একটা অকাজ—অন্ততঃ বাজে কাজ—এ ধারণা লক্ষ লোকের আছে। সরকার মহাশয়ের অপরাধ—তিনি মুখ ফুটে কথাটা শুধু বলেছেন, এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার দোহাই দিয়েছেন।

এর বদলে রাজনীতি কি সমাজনীতির দোহাই দিলে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা তাঁর ভয়ে নিশ্চয়ই জড়সড় হয়ে যেতেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে সাহিত্যের সৃষ্টি যে একটা অনাসৃষ্টি মনে করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সচরাচর মানুষে, কথা ও কাজের ভিতর একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ দেখে, এবং সেই সঙ্গে মনে করে যে, এর একটা হচ্ছে আর একটার উল্টো;—আর তাও যদি না হয় তাহলেও কাজের ওজন যে কথার ওজনের চেয়ে ঢের বেশী, সে বিষয়ে ও-মহলে বড় কারও মতভেদ নেই, এবং ভবের হাটে ওজন অনুসারেই বস্তুর মূল্য নির্ণয় হয়। রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরীর"

চাইতে একখানা রণতরীর মূল্য যে লক্ষগুণে বেশী, এ সত্য এত মোটা যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তা না দেখে থাক্‌তে পারে না। এর প্রতিবাদ করতে হ'লে বল্‌তে হয় যে, প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ এক জিনিস নয়; তাহলেই ওঠে স্যায়ের তর্ক, আর সরল বুদ্ধির লোকের কাছে সে তর্ক হচ্ছে কূটবুদ্ধির বাগ্‌জাল, এবং সে জালে জড়িয়ে পড়তে অনেকেই নারাজ। অবশ্য সত্য কথা এই যে, কাজও এক রকমের কথা, আর কথাও বিশেষরকমের কাজ। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়, দরকারও নেই। কথা মাত্রেই কাজ, আর কাজ মাত্রেই কথা হলেও, এর ভিতর অবশ্য ছোট বড়র প্রভেদ বিস্তর। মানুষের অনেক কথাই যে অকেজো, তা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মানুষের অনেক কাজই যে অকথ্য, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। সুতরাং বহুলোকে সাহিত্যিকদের হয় চুপ করে থাক্‌তে উপদেশ দেন, নয় কাজের কথা কইতে আদেশ করেন। ফুলের গাছকে ফুল ফোটানো বন্ধ করতে উপদেশ দেওয়া, কিম্বা তাকে ফল ফলাতে আদেশ করা অবশ্য সুবুদ্ধির কার্য্য নয়—কেননা সে উপদেশ, সে আদেশ পালন করতে সে বেচারা নৈসর্গিক কারণে অসমর্থ। এ বিশ্ব ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং এতে এমন সব বস্তু আছে আর হয়—যা দু-সন্ধ্যে গেরস্থালির কাজে লাগে না। এ সবের উপর এই কারণেই সাংসারিক লোকের একটা আক্রোশ আছে,—সুতরাং হয় তাদের বাতিল নয় বদল করবার জন্য তাঁরা সদাই উৎসুক। খোদার উপর খোদকারী করবার প্রবৃত্তিটে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল। এই সব কারণে সাংসারিক লোকেরা, মানব-সমাজে সাহিত্যের জন্মও বন্ধ করতে পারে নি, তার

শ্রীবৃদ্ধিরও হানি কর্‌তে পারে নি; যদিচ সাহিত্যিকদের উপর অত্যাচার করতে, অন্ততঃ তাদের লাঞ্ছনাগঞ্জনা দিতে জনসাধারণ কখনও কসুর করে নি। যদি কোথায়ও দেখ যে, কোনও সাহিত্যিকের স্বসমাজে আদর হয়েছে—তখনই বুঝবে যে, সে ভদ্রলোক সাহিত্যের নামে বেনামি করে শুধু সাংসারিক কাজের কথা কয়েছেন।

(২)

আমি যে কাজের লোকের কথা বলছি, সে হচ্ছে কাজের কথার লোক। যারা যথার্থ কাজের লোক,--অর্থাৎ যারা লাঙ্গল চষে, ধান ভানে, চরকা কাটে, কাপড় বোনে, যারা হাত গুটিয়ে বসলে আমাদের দু'দিনেই বাক্‌রোধ হয়ে যায়,—তারা অবশ্য সাহিত্যের উপর কোনই অত্যাচার করে না; বরং সাহিত্যই তাদের উপর চিরদিনই অত্যাচার করে আস্‌ছে। যারা পড়্‌তে জানে না, লেখার উপর তাদের ভক্তি যেমন অযথা তেমনি অচলা। বারোমাস তারাই সরস্বতীর পূজা করে, যারা একদিনও দোয়াতকলম ছোঁয় না। যে কথা বইয়ে আছে, তাদের বিশ্বাস সে কথা মন্ত্র; এবং সে মন্ত্র যত বেশী দুর্বোধ তত বেশী তার মাহাত্ম্য। লোকশিক্ষার আসল দরকারটাই এই জন্যে যে, লেখাপড়া না শিখলে লোকের লেখাপড়ার ভয় ভাঙ্গে না। যে স্বল্পসংখ্যক লোক লেখাপড়ার সাহায্যে অসংখ্য নিরক্ষর লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এবং সেই দলিলে নিজেদের কাজের লোক মনে করেন,—সাহিত্য রচনা করা তাঁদের মতেই অকাজ। যারা নথি পড়ে কিম্বা পুঁথি পড়ায়, মন্ত্র

পড়ে ও মন্ত্র পড়ায়, খাতা লেখে কিম্বা পত্র লেখে,—তারাই সাহিত্যকে হয় অবজ্ঞা নয় উপেক্ষা করে। সামাজিক জীবনে এ সব লেখাপড়ার দরকার আছে, সুতরাং গুরুপুরোহিত, উকীল মোক্তার কেরাণী মাষ্টারের দল যে কাজের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এবং সে কাজের মূল্য যাই হোক, তার বাজার দর আছে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শুধু নিজের ভাবনা ভাবেন, আর দু'চার জন অবসর মত পরের ভাবনাও ভাবেন। প্রথম দলের মতে সাহিত্যচর্চ্চাটা বাজে কাজ, দ্বিতীয় দলের মতেই অকাজ। এই পরোপকারীর দল হয় রাষ্ট্রীয় নয় সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে সদাই ব্যস্ত, এবং তাও একমাত্র লেখাপড়া অর্থাৎ কথার সাহায্যে। তাই মানুষের সকল কথাকে তাঁরা তাঁদের কাজে লাগাতে চান্, এবং যে কথায় হাল-ফিল সমাজের কি রাজ্যের বদল না হয়, তাঁদের বিশ্বাস সে কথার অপব্যয় হয়। যাঁর কথার ভিতর রূপ নেই কি শক্তি নেই, তিনি অবশ্য সাহিত্যিক নন্। অপরপক্ষে যাঁরা আগে নিজের উপকার করে, পরে পরের উপকার করতে ব্রতী হন, প্রায়শঃই দেখা যায় যে তাঁদের উপর লক্ষ্মীর যতটা কৃপা আছে, সরস্বতীর ততটা নেই। এঁরা সাহিত্যের উপর বিশেষ বিরক্ত, কেননা ভাল কথার এ ক্ষেত্রে বাজে খরচটা এঁদের কাছে একেবারেই অসহ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথাও যা, এঁদের কথাও তাই—শুধু যে ম্যালেরিয়া তাড়াবার প্রস্তাব এঁরা করেন, সে হচ্ছে এর ওর দেহের নয়—সমগ্র সমাজ-দেহের ম্যালেরিয়া। সে ম্যালেরিয়া যে এ দেশে আছে, আর যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ স্থলেও সাহিত্যিকেরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য যে, এ রোগের চিকিৎসা

করাও সাহিত্যের কাজ নয়। সরস্বতী যে ধন্বন্তরী—এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না।

(৩)

এ কথা শুনে কাজের লোকেরা বল্‌বেন যে, তবে সাহিত্যের কি কাজ?—এক কথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত, কেননা সাহিত্যের কাজ প্রথমতঃ এক নয়—বহু; দ্বিতীয়তঃ একদিনের নয়—চিরদিনের। ভগবানের সৃষ্টির যেমন একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই, তেমনি মানুষের সৃষ্টিরও একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। নানা লোকে নানা যুগে তার ভিতর নানা অর্থ দেখ্‌তে পায়—এতেই ত সৃষ্টির বিশেষত্ব। সাহিত্যের বিশিষ্টতাও ঐ গুণে। সৃষ্টির জানাশোনা সকল অর্থই আংশিক হিসেবে সত্য এবং সমগ্র হিসেবে মিথ্যা, কেননা তার পূরো অর্থটা একটা রহস্য—ইংরাজিতে যাকে বলে mystery। যে উক্তির অন্তরে তার সকল ব্যক্ত স্পষ্টতার ভিতরেও একটা অব্যক্ত রহস্য ফুটে না ওঠে—তা সাহিত্য নয়। এবং মানুষের পক্ষে এই চির-রহস্যের দর্শন লাভটা নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ সে নিজের হাতের মাপে অনন্তের ইয়ত্তা করবে, নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের হিসেব থেকে সৃষ্টির প্রয়োজন আবিষ্কার কর্‌বে—এক কথায়, তার ক্ষুদ্র অহংকে বিরাট আত্মার রাজাসনে বসাবে। সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে তার সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়া,—আত্মাকে অহংএর হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। দেহের মত মনেরও একটা প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনসূত্রেই

সাহিত্য জন্মলাভ করেছে, এবং সেই প্রয়োজনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

এর উত্তরে অসাহিত্যিকরা বল্‌বেন,---এ সব দর্শনের কথা, অর্থাৎ গাঁজাখুরি। দর্শনের কথা যে শুধু বাজে কথা নয়, উপরন্তু মিছে কথা—এ কথা আমিও মানি। তার কারণ, প্রতি দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির একটি স্পষ্ট অর্থ বার করা, এবং তার ভিতর যে রহস্য আছে তা' নেই—এই প্রমাণ করা। সুতরাং যে মনোভাব থেকে দর্শন জন্মলাভ করে, সাহিত্য জন্মায় তার ঠিক উল্টো মনোভাব থেকে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই বিশ্বের একদেশদর্শী, এবং সেই জন্য এ সব শাস্ত্রের ভিতর একটা একগুঁয়েমি আছে—যা কাজের বেলায় গোঁয়ারতুমিতে পরিণত নয়।—সমগ্র দৃষ্টি আছে শুধু সাহিত্যের; সুতরাং সাহিত্য, দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়, ধর্ম্ম-শাস্ত্রও নয়, নীতিশাস্ত্রও নয়—কিন্তু একাধারে ঐ সবই। মনোরাজ্যে এ প্রতিটিরই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হয়ে ওঠবার দিকে ঝোঁক আছে,—সাহিত্য এ দুষ্কার্য্যে বাধা দেয়, অর্থাৎ এ সবের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করে তাদের নব্যবীর দাবী অপ্রমাণ করে। তা ছাড়া, এই সকল একগুঁয়ে গোঁয়ার শাস্ত্র, সব পরস্পার পরস্পরের বিরোধী, এবং এরা মনোজগতে যে কুরুক্ষেত্র বাধায়, সাহিত্য তার মধ্যস্থতা করে' সে জগতে শান্তি স্থাপন করে। তর্কের খাতিরে এ সব কথা মেনে নিলেও, পাঁচজনে বল্‌বেন,—সাহিত্য মানুষের মনের যে কাজেই লাগুক, মানুষের জীবনের কোনও কাজে ত লাগে না? দর্শন বিজ্ঞান, ধর্ম্ম নীতি, এ সবারই একটা ব্যবহারিক দিক্ আছে। মানব সমাজ যে অসভ্য অবস্থা থেকে ক্রমে সভ্য অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সে সবই ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে। কিন্তু

সাহিত্য জীবনের কোন কাজে লেগেছে? মানুষকে চলাবার কিম্বা কল চালাবার কোন উপায় সাহিত্য উদ্ভাবন করেছে? জীবন-ছাড়া মন পরলোকে থাক্‌তে পারে, ইহলোকে নেই। সুতরাং সাহিত্য যদি জীবনের সহায় না হয়, তাহলে তার পরলোকগামী হওয়াই উচিত। সংক্ষেপে সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সাহিত্য ম্যালেরিয়া দূর করতে পারে না। এ কথা ঠিক, ও হচ্ছে ফলিত-বিজ্ঞানের কাজ, ফলিত-সাহিত্যের নয়;—কেননা ফলিত সাহিত্য বলে কোনও বস্তু নেই। এ অভিযোগের উত্তর হচ্ছে যে, যে-মনে পৃথিবী হতে ম্যালেরিয়া দূর কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মায়, সে মন গড়ে সাহিত্যে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের দেহ থেকে ম্যালেরিয়ার বিষ নামানো কেন আমাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের সর্ব্বজনীন উত্তর—এই কারণে যে, ও বিষ সাংঘাতিক, অর্থাৎ জীবনের পরিপন্থী; ম্যালেরিয়া হয় আমাদের মারে, নয় আমাদের সারে। অতএব ও-বস্তুকে দেশ-ছাড়া করা একটা মহৎ কাজ। মানুষের যত কাজ, সে সবেরই ত এক উদ্দেশ্য—মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজনটা কি?—এ প্রশ্নের উত্তর কাজ দিতে পারে না, কোন কর্ম্ম-শাস্ত্রও দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও নীতি-শাস্ত্র নিরুত্তর থাক্‌তে বাধ্য; বাচাল হয়ে উঠবে শুধু দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র। বেশীরভাগ ধর্ম্ম দর্শন এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন,—বেঁচে থাক্‌বার কোনই প্রয়োজন নেই; জীবনটাই হচ্ছে জগতের প্রধান উৎপাত। সহজ মানুষে দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ, তার কারণ ও শাস্ত্র মানুষকে মার্‌তে না পারুক, আধমরা করতে পারে; ও হচ্ছে মনোরাজ্যের ম্যালেরিয়া-বিশেষ। অপরপক্ষে ধর্ম্মের প্রতি যে মানুষের ভক্তি

আছে, তার কারণ ধর্ম্ম মানুষকে ইহলোকের ও-পারে আর এক লোকের সন্ধান বলে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া নেই। শুধু তাই নয়, ধর্ম্ম সে লোকে যাবার পথও আমাদের দেখিয়ে দেয়। তবে মানুষে যে ধর্ম্মকে ভক্তির চাইতে ভয় করে বেশী, তার কারণ,—ধর্ম্ম আর একটি লোকেরও খবর জানিয়ে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নেই—এবং সেই সঙ্গে বলে দেয় যে, মানুষের পক্ষে সেই দ্বিতীয় লোকে যাওয়াটাই সহজ, এবং সেই কারণে বিশেষ সম্ভব!

সাহিত্যই জীবনের একমাত্র সহায়, কেননা একমাত্র সাহিত্যই মানুষকে বেঁচে থাক্‌তে শেখায়; জীবনধারণের কোনও অবান্তর ফলের লোভ দেখিয়ে নয়, মানুষকে নিত্য নবজীবনে জীবিত করে। সাহিত্য জীবনের অর্থ জীবনের মধ্যেই খোঁজে, তার উপরে নীচে কিম্বা আশে পাশে নয়; এবং এই কারণেই তার চির-রহস্যের সাক্ষাৎ পায়,—বৈদান্তিক যেমন আত্মার সাক্ষাৎ আত্মার মধ্যেই লাভ করেন। জীবনের আসল অর্থ যে জীবনের মাত্রা বাড়া'নো, এ সত্য সরস্বতী হাতেকলমে প্রমাণ করে দেন। সাহিত্য আমাদের কোন বিষয়ে শিক্ষিত করে না; —কেননা তার একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানুষকে জীবনে দীক্ষিত করা। সরস্বতীর স্পর্শে, যা মৃত তা জীবিত হয়ে উঠছে, যা সুপ্ত তা জাগ্রত হচ্ছে, যা অব্যক্ত তা ব্যক্ত হচ্ছে। এ সত্য প্রমাণ করা যায় না; কেননা এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ করবার বস্তু। মনোজগতেও অক্সিজেন আছে, যা না থাকলে সে জগতে কিছুই বাঁচে না, কিছুই জ্বলে ওঠে না। যে কথার ভিতর সেই অক্সিজেন আছে, তারই নাম সাহিত্য—তা সে গানই হোক, গল্পই হোক, দর্শনই হোক, বিজ্ঞানই হোক, ধর্ম্মই হোক আর নীতিই হোক। এই কারণেই ইউরোপের প্রথম আর শেষ দার্শনিক

প্লেটো, এবং বার্গসনের দর্শন কাব্য ; এবং এই কারণেই সেক্সপিয়র ও কালিদাসের কাব্যও দর্শন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, যখন দেখা যাবে সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা বেড়ে চলেছে, তখনই বুঝতে হবে নবসাহিত্য-সৃষ্টির যুগ এসেছে। জীবন পদার্থটা যখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই নে—তখনই আমরা তার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত হই। জীবনটা হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় সখ, এবং এই সখের চর্চ্চা করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। এ অবস্থায় সাহিত্যকে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার অনুরোধ করার অর্থ, মশা মার্‌তে এমন কামান পাতার উপদেশ দেওয়া, যার গ্যাসের স্পর্শে কিছুই মরে না, সবই বেঁচে ওঠে।

বীরবল।

লিখিবার ভাষা।

(বঙ্কিমচন্দ্রের মত)

বঙ্কিমচন্দ্র যে বহুবিধ প্রবন্ধ লিখেছেন, এ কথা আমার শোনা ছিল ; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের একটি প্রবন্ধের সঙ্গেও আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। এ নিতান্তই আপশোষের কথা ; কেননা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, যে-সব মতামত প্রচার করবার দরুণ সাহিত্য-সমাজের শুদ্ধাচারীরা আমাদের একঘরে করবার চেষ্টা করছেন, তার অনেক মতই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের ঠিক অনুবাদ না হলেও, এক রকম নূতন সংস্করণ। এ কথা পূর্ব্বে জানা থাকলে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতুম, তাতে আর কিছু না হোক্, বিপক্ষদল আমার উপরে এলোমেলোভাবে বাণ বর্ষণ করতে সঙ্কুচিত হতেন। সে যাই হোক, বঙ্গসাহিত্যে আমরা যে পথ ধরে চলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রই সে পথের প্রদর্শক। সে পথে যে আমরা তাঁর চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, তার কারণ—সেটা যথার্থই একটা পথ, চোরাগলি নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ পড়্‌লে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর মনের বেশী বদল হয় নি। আমাদের সমাজ নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, অতীত নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে যে তর্ক তাঁরা করুতেন, আমরাও তাই কর্‌ছি—এবং কতকটা একভাবেই কর্‌ছি। একালের পূর্ব্বপক্ষ যে সেকালের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরাধিকারী, তার

পরিচয় তাঁদের কথাতেই ধরা পড়ে, এবং উত্তরপক্ষের উত্তর সেকালে যা ছিল একালেও তাই আছে; সে জবাব এই যে, যা চলে আস্‌ছে তা চলবে কিনা, সে হচ্ছে বিচারসাপেক্ষ।

(২)

একটা চল্‌তি উদাহরণ নেওয়া যাক্। সকলেই জানেন যে, সাহিত্যের মাঠেঘাটে যে তর্কটা আজকাল জোরের সঙ্গে চল্‌ছে, সে হচ্চে ভাষা নিয়ে। এ তর্ক বহুকাল পূর্ব্বে তুলেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র; আমরা সেই তর্কটাই আবার নতুন করে তুলেছি। এ কথা আগে জান্‌লে, আমি তাঁর সূত্র অবলম্বন করে তার ভাষ্য রচনা কর্‌তুম, এবং তা'তে কেউ আপত্তি কর্‌তেন না; যদিচ সকলেই জানেন যে, টীকাভাষ্যে মূল-সূত্রের মর্ম্ম বদলে যায়, ও তার ধর্ম্ম বেড়ে যায়। এ বদল হয় ভাষ্য-কারের দোষে নয়—কালের গুণে। আমরা সব বিষয়ে একটা authority চাই; ইতিপূর্ব্বে সেই authority দেখাতে না পারাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী আমার কথা শুনে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছেন, নচেৎ নাড়তেন উপরনীচে। আমি যে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতেরই জের টেনে এনেছি, সেইটি দেখিয়ে দিতে পার্‌লে আশা করি আমাদের মাতৃভাষা সাহিত্যিকদের হাতে আর অত লাঞ্ছিত হবে না।

আমি আরম্ভেই বলেছি যে, আমি চল্‌তি ভাষার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু সে শুধু ক্রিয়াপদে—থিওরিতে তিনি চল্‌তি ভাষার দিকে আমাকে ঢের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে চল্‌তে হলে, বিষবৃক্ষ নয়, আলালের ঘরের

দুলালকেই আমাদের গদ্যের আদর্শ কর্‌তে হয়। কেন ?—তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(৩)

আমার নামে অভিযোগ এই যে, আমি সাধুভাষার উপর আক্রমণ করেছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি বঙ্গসাহিত্যকে নিজের জোরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছি। সাধুভাষার উপর যদি কেউ তীব্র আক্রমণ করে থাকেন ত সে বঙ্কিমচন্দ্র; এবং সে আক্রমণের বেগটা যে কত তীব্র, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকেই পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :—

"কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।............সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গলা ক্রিয়াপদের আদিমরূপের সহিত সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার অধিকার তাহার ছিল না।"

"তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গলা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গলা লিখিতে পারেই না।.........সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল.........তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গলা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল"—

এর পর, বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন্ ভাষার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, সে কথা বোধহয় আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই, কেননা তিনি এ স্থলে যথেষ্ট স্পষ্ট কথা বল্‌তে কসুর করেন নি। বাঙ্গলা-গদ্যের আদি লেখকদের কোনরূপ খাতির রাখাও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নি। তার কারণ তিনি চেয়েছিলেন ঐ সাধুভাষাকে মূলে হাবাৎ করতে। এবং সেই জন্যই তিনি ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের জয়গান করে' তাঁর প্রবন্ধ সুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা এই ঃ—

"টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।..... ... যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

আমিও সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, কিন্তু অত কড়া কথায় ও চড়া গলায় নয়; তার কারণ, ইংরেজি শিক্ষার আদিম ঝাঁঝটা আমাদের যুগে অনেকটা মরে এসেছে। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে বিষবৃক্ষের মূলে টেকচাঁদ ঠাকুর কুঠারাঘাত করেছিলেন, সেই বৃক্ষের কলমের চারায় আমাদের সাহিত্যজগৎ ছেয়ে গিয়েছে, এবং তারই ফলের অন্তরে পাঠক-সমাজ কাব্যামৃতের রসাস্বাদ লাভ করেন।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকে বল্‌তে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি ওকালতি করেন নি, জজিয়তি করেছেন। এবং এ মামলার তিনি যে রায় দিয়েছেন, তাকেই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে- কেননা সে হচ্ছে সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিলেত-আপিলের রায়।

এমন কথা যে অনেকে বল্‌তে পারেন, শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস কেউ কেউ ইতিমধ্যে তা বলেওছেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রথমে উকীল হয়ে সওয়াল জবাব করেছেন, পরে জজ হয়ে রায় প্রকাশ করেছেন। তিনি সাধুভাষার বিপক্ষে পূরোদমে লড়েছেন, কিন্তু "অপর ভাষার" পুরোদাবীর ডিক্রী দেন নি। তার কারণ, যেখানে রেষারেষী সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, সেখানে বুদ্ধিমান উকীলের পক্ষে সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাল করাটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এস্থলে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন নি—তিনি "অপর ভাষার" কোর্টই বজায় রেখেছেন, শুধু তার অতিরিক্ত দাবীটে ছেড়ে দিয়ে। সাধুভাষীদের কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্, তাঁদের কথা তিনি আমলেই আনেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "আলালের ঘরের দুলালের" বিরুদ্ধে এই আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, ও পুস্তক পিতাপুত্রে একত্র বসে পাঠ করা যায় না; এ কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :—

"তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্ত্তণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না"—

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ভাষাই প্রমাণ, তিনি সেকালের সাধুভাষীদের কোনরূপ তোয়াক্কা রাখ্‌তেন না। "অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা" করতে আমরাও বারণ করি, কিন্তু তাই বলে

সাধুভাষাকে, "বিদ্যাসাগরী" এই অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে বিশিষ্ট কর্‌তে আমরা সঙ্কুচিত হই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা গদ্যের গড়ন দেন, এ সত্য আমি প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখার একটি মহাগুণ ছিল। বাঙ্গলা তাঁদের হাতে অপ্রাকৃত হলেও, সংস্কৃত তাঁদের হাতে বিকৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়, সেটি একটু রাগের মাথায় লেখা; এবং বোধহয় তার কারণ এই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় "মৃণালিনীকে" শুধু "আলালের ঘরের দুলাল" নয়, "হুতুমপেঁচার" সঙ্গেও এক পর্য্যায় ভুক্ত করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার (ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই"। এ অবশ্য ভাষায় যাকে বলে উল্টোচাপ;—পাল্টা জবাব হিসেবে এ কথা অসঙ্গত নয়। আজকের দিনে আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই যে, মৃণালিনীর ভাষার সঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষার বিশেষ প্রভেদ নেই; কিন্তু এ দুয়েরই টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।—বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের যতই গুণগান করুন না কেন, তাঁর কলমের মুখ থেকে যা বেরিয়েছে, তা আলালী ভাষা নয়—যদি কিছু হয়ত দুলালী ভাষা। তর্কান্ধ হলে সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখ্‌তে পান্ না, তার প্রমাণ এ যুগেও দুর্ল্লভ নয়। নিত্য দেখ্‌তে পাই, সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন।

(৫)

বঙ্কিমীযুগে এ মামলার বাদী ও প্রতিবাদীরা বেশ স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।—শিক্ষায় দীক্ষায় এ দুই দলের পরস্পরের

সঙ্গে পরস্পরের কোনও মিল ছিল না। সেকালে এই ভাষার ঝগড়াটা ছিল টোলের সঙ্গে কলেজের ঝগড়া। এর পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেই পাওয়া যায়। তাঁর কথা এই ঃ—

"এক্ষণে বাঙ্গলাভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য"।—

এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য "সংস্কৃত ভাঙ্গা" অর্থেই "সংস্কৃতমূলক" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রতিবাদী দলের পরিচয়ও তাঁর কাছথেকেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ—

"অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে, উহা আমরা কেন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা, তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সুশিক্ষিত বল্‌তে বুঝতেন ইংরাজিশিক্ষিত। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষার ভক্ত হন, এবং এ শিক্ষায় বঞ্চিত হলেই লোকে "অনুস্বরবাদী" হয়।

টেকচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ—

"তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই

বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না ? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন”—

বিপক্ষদলের সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ—

“সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি”.........ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরাজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে।.........পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত”—

এই পক্ষাপক্ষ সুনির্দ্দিষ্ট থাকার দরুণ, সে যুগের ভাষার মামলার ইষু ছিল সবে একটি, এবং সেটিও ছিল অতি স্পষ্ট। এ তর্কটা যে আজকাল গোলযোগে পরিণত হয়েছে তার কারণ, এ কালের সাধু-বাদীরা “সংস্কৃতে সুশিক্ষিত নন, কিন্তু” “ইংরাজি জানেন”। তার পর “পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে”—এমন কথা মুখে আনবার সাহস অনেকের নেই। কেননা ও কথা বল্‌তে গেলে রাশ রাশ ইংরেজী কোটেসনের মার সহ্য করবার জন্য বক্তাকে প্রস্তুত হতে হয়; সেই ভয়েই ত আমরা ছন্দ নিরুক্ত কল্প ব্যাকরণ ইতিহাস পুরাণের দোহাই দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙ্গালী, সাহিত্যে বুদ্ধির পরিচয় দিত, এ যুগে আমরা পরিচয় দিই বিদ্যের। বাঙ্গলা সাহিত্য যে বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখা উচিত, এই সোজা কথাটাকে শক্ত করে তোলবার জন্য, আমরা অপরাবিদ্যার ভাণ্ডার খালি করেছি—এর পরে পরাবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সম্ভবতঃ এ তর্কের আর শেষ মীমাংসা হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র—বিদ্যার ও “কচকচি” ত্যাগ করে, সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই এ মামলার বিচার করেছিলেন।

(৬)

আমি পূর্ব্বে বলেছি সেকালে এ মামলার ইস্যুটা ছিল অতি স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, পণ্ডিতি মতে :—

"যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোনও অধিকার ছিল না।"—এবং কলেজি মতে :—

"রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থলেই অরূপান্তরিত সংস্কৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে"—

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন তদ্ভব ও দেশী শব্দকে বয়কট কর্‌তে, আর ইংরেজি-শিক্ষিতেরা চেয়েছিলেন তৎসম শব্দকে বয়কট কর্‌তে।

সেকালে তদ্ভব শব্দের বিরুদ্ধে ভট্টপল্লীতে যে ধর্ম্মঘট করা হয়েছিল, এ অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তারই এক জায়গায় আছে :—

"ঐরূপ (আলালী) ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা না দিলে ইত্যাদি"—

বলা বাহুল্য এ লেখায় তদ্ভব ও দেশী শব্দই প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস একালের সাধু-সাহিত্যে "ফলার" চলে না, এ যুগে সাহিত্যিকরা পাঠকদের ফলাহার করান্। এমন কি আমার কাণেও খাট্টা শব্দটি খোট্টাই লাগে। সুতরাং "ফোঁটাকাটার" দল যে বেজায় সানুনাসিক ছিলেন, এ অপবাদ সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে "হুতোমী" ভাষারও সাহিত্যে স্থান

আছে, অপরপক্ষে বঙ্কিমের মতেই সে ভাষা তিরস্কৃত। লোকের রুচি ভিন্ন, এবং সেকালের পণ্ডিত মহাশয়দের চাট্‌নিতে অরুচি ছিল না। তাঁরা যে রঙ্গরসের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন—তার প্রমাণ ও রসের আতিশয্য বশতঃ বাংলার আদি গদ্য-লেখক মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থ দুই বন্ধুতে একত্র বসে পাঠ করা যায় না।

(৭)

আসলে বাড়াবাড়িটে করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত দলের সেই মুখপাত্রেরা—যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের রাজ্য থেকে তৎসম শব্দকে বহিষ্কৃত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই টোল আর কলেজের ঝগড়াটা বঙ্গসাহিত্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়া। ইংরেজি শিক্ষার বলে যাঁরা বাঙ্গলার নব-ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিলেন, ক্ষত্রিয়ের তেজ তাঁদের শরীরেই ছিল। তাঁরা যদি তাঁদের মতানুসারে নব-বঙ্গসাহিত্য গড়ে তুলতেন—তাহলে সে সাহিত্য যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি হত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নবীন বয়েসের নবীন উৎসাহে একখানি কাব্য রচনা করেন, যার ভিতর যুক্তাক্ষরের নামগন্ধও ছিল না; সে কাব্যের নাম "গোচারণের মাঠ"। যদি গদ্যলেখকেরাও তাঁর দেখাদেখি সাহিত্য রচনা করতেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র যে গোচারণের মাঠ হয়ে উঠত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, ষোল-আনা না হোক চৌদ্দ আনা অনুমোদন করতেন, সে কথা তিনি নিজ জবানি কবুল করে

গেছেন। "সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য" অর্থাৎ দেশী ও বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ঃ—

"এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহারা (সাধুভাষীর দল) রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা দেখি না।.........এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।"

কার মত?—সেই ঘোরতর মূর্খ ইংরাজের মত, যিনি আসুরফি ফেলে গিনি রাখেন। উপমাটি অবশ্য উল্টো হয়েছে, কেননা গিনিই বাজারে চলে, আর আসুরফি অপ্রচলিত;—তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একালে অবশ্য আমরা, চলতি বাঙ্গলার পক্ষপাতীরা, সাধুভাষীদের প্রতি ওরূপ ভাষা ব্যবহার করি নে। আমরা হলে বলতুম এই পণ্ডিতেরা সেইমত পণ্ডিত।

সে যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্র যে এই দেশী বিদেশী শব্দের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে পাওয়া যায় ঃ—

"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দের প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে"—

আমাদের মত অবশ্য এত উদার নয়—কেননা অপর ভাষা হতে যদৃচ্ছাক্রমে শব্দ চয়ন করলে রচনা খিচুড়ি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ স্বাধীনতা সকলকে দেওয়া যায় না, কেননা কার কতটুকু "বলিবার" আছে, তার খবর শুধু তাঁর অন্তর্য্যামীই জানেন। আমরা এই

পর্য্যন্ত বলি যে, যে-বিদেশী শব্দ বাঙ্গলা হয়ে গিয়েছে—তা বাঙ্গলা কথা হিসেবেই ব্যবহার্য্য। সে যাই হোক্, যখন দেখতে পাচ্ছি যে, এক আরণ্যক-ভাষার উপদ্রবেই বঙ্গসাহিত্য অস্থির—তখন এ ক্ষেত্রে বন্য-ভাষার আবাদ কর্‌তে সাহিত্যিকদের পরামর্শ দেবার মত সাহস আমাদের নেই।

(৮)

আসলে কিন্তু দেশী শব্দকে সাহিত্যের জাতে তোলবার জন্য ওকালতির বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। কেননা দেশী শব্দ বাঙ্গলা-ভাষায় খুঁজে পাওয়াই ভার। যে সব শব্দ কাণে শুন্‌তে মনে হয় "সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য", তাদের কুলের খবর নিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা আর্য্যবংশোদ্ভব,—এক কথায় তদ্ভব। বাঙ্গালীর বুকে দ্রবিড়মঙ্গলের রক্ত থাকতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে মোগলতামলের ভাষা নেই। যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃতের জমি খুঁড়ে পাওয়া যায় না, তারা ভুঁইফোঁড় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার মতে সেগুলিকে দেশী না বলে, বিদেশীর দলে ফেলে দেওয়াই নিরাপদ।

সে যুগে আসল ঝগড়াটা ছিল তৎসমের সঙ্গে তদ্ভবের। শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য হতে তৎসম শব্দের উচ্ছেদের জন্য যে আড়েহাতে লেগেছিলেন, তার পরিচয় আলালী ও হুতোমা ভাষায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এই :—

"যদিও আমরা বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের ব্যবহার উচ্ছেদ করিতে হইবে, মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের

উচ্ছেদ করিতে হইবে, কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গলা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গলা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়"—

এর পর সাধুভাষার পক্ষে আর কোন কথা বলা চলে না। বঙ্কিম-চন্দ্র অবশ্য অকারণেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতে কি কারণে তৎসম শব্দ ব্যবহার্য্য—তারও সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

(৯)

সংস্কৃতের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সায় দিয়েছিলেম, তার একমাত্র কারণ—তাঁর মতে সকল সংস্কৃত শব্দ সাধারণের বোধগম্য নয়। তিনি বলেছেন:—

"এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিমরূপ সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিমরূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে"—

এ কথা এত জোর করে বল্‌বার কারণ, তাঁর মতে গ্রন্থের প্রয়োজন:—

"যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। যদি কোন লেখকের উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই।......আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।......... যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমন দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল

যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে তাহারা ভিন্ন অপর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।"...... ..

বাঙ্গলা ছেড়ে সংস্কৃত ব্যবহার করলেও, রচনা মধুর না হোক, তা যে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হতে পারে—উপরোক্ত বাক্যগুলিই তার প্রমাণ। এস্থলে সাধুভাষীদের প্রতি 'পাষণ্ড' 'বঞ্চক' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বোধ হয় "তোর শীল তোর নোড়া, ভাঙ্গি তোর দাঁতের গোড়া" এই বচন অনুসারেই করা হয়েছে।

(১০)

আমরা অবশ্য তৎসম শব্দের বিদ্বেষী নই; কেননা বঙ্গ-সরস্বতীর ভাণ্ডারে ও-জাতীয় বহুশব্দ আছে। তাদের সাহিত্য থেকে উচ্ছেদ করবার কোনই কারণ নেই, এবং তাদের স্বত্ব রক্ষা করবার জন্য কোন ওকালতিরও দরকার নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ তাঁর বিশ্বাস ছিল বাঙ্গালী মাত্রেই জানে।—কিন্তু একটা জিনিস তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে; সে হচ্ছে এই যে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ভিতর যে শুধু রূপের প্রভেদ আছে তা নয়, অল্পবিস্তর অর্থেরও প্রভেদ আছে। অনেকে বলতে পারেন যে, সে প্রভেদ অনেকস্থলেই অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু অর্থের এই সকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির প্রতি অমনোযোগী হয়ে লিখতে বসলে সে লেখা সাহিত্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ 'ঘর' ও 'গৃহ' শব্দ দুটি নেওয়া যাক্।—সকলেই জানেন যে "ঘরের কথাকে" "গৃহের বাক্য" বললে রচনার মস্তক ভক্ষণ করা না হো'ক, মাথা খাওয়া হয়। তারপর

গৃহস্থ ও "গেরস্থ", এ দুই একই ব্যক্তি নয়; আর গিন্নী ও গৃহিণীর ভিতর প্রায় সেই প্রভেদ আছে, যে প্রভেদ বাম্‌নী ও ব্রাহ্মণীর ভিতর আছে। তা ছাড়া বাঙ্গলা ভাষায় দু'কথার সমাস চলে; এবং সেই সূত্রে যেখানে তৎসম কথা চলে, সেখানে তদ্ভব কথা অচল। কেউ যদি "চন্দ্রগ্রহণ"-এর পরিবর্ত্তে বঙ্গসাহিত্যে "চাঁদ নেওয়া"র পক্ষপাতী হন্, তাহলে তাঁর ভাগ্যে জুটবে শুধু অর্দ্ধচন্দ্র। যিনি বামুন ভোজন করান, তাঁর বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করে না। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যে ইচ্ছামত অদলবদল করা যায় না, তা শত শত উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়;—সুতরাং আমাদের ও দুই চাই।

শুধু মানের হিসাবে নয়, কাণের হিসাবেও বঙ্গসাহিত্যে তৎসম কথার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, সেই ছন্দ রক্ষা করতে কোথায়ও বা 'নূতন' কোথাও বা 'নতুন' শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

তবে তদ্ভবের সঙ্গে কতখানি তৎসমের খাদ মেশাতে হবে—তার সন্ধান বলে দেবে লেখকের সুরুচি। ভাষা সম্বন্ধে যাঁর রুচি সু নয়, তিনি হাজার পণ্ডিত হলেও তাঁর লেখা সাহিত্য হবে না।—যাঁর হাতে তদ্ভব ও তৎসম শব্দের মিলন "সুবর্ণে সৌভাগ্য" হয়, সাহিত্য-জগতে তাঁর ভাগ্য যে প্রসন্ন নয়, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে সুতরাং নিষ্প্রয়োজনে তৎসম শব্দের ব্যবহার যে দোষের, বঙ্কিম-চন্দ্রের এ মত মেনে নিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই, যদি আমরা সাহিত্যের সকলরকম প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখি। আর এক কথা, নিষ্প্রয়োজনে তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও সমান দোষের।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কঠিন আঘাতেও সাধুভাষা যে সাহিত্যলীলা সম্বরণ

করেন নি, তার কারণ, তাঁর তর্কের এক জায়গায় ফাঁক ছিল। তিনি বলেছেন যে, ভাষাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কর্‌বার জন্য সংস্কৃত শব্দের আবশ্যক। এ হচ্ছে সদর ফটক বন্ধ করে খিড়কির দরজা খুলে রাখা। বাক্যের গড়নই যে তার প্রধান সৌন্দর্য্য, এ জ্ঞান সকলের নেই।—"শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল"—এরূপ যাদের ধারণা, সে বংশ আজও আছে। ঐ ভারি সোণার লোভে ঐ খোলা খিড়কির দুয়োর দিয়ে অলঙ্কার লোভীরা রাতারাতি সংস্কৃতের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যা হাতে পড়েছে, তাই নিয়ে এসে সরস্বতীর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন, ফলে অলঙ্কার পরার গৌরবে সাধুভাষা বঞ্চিত হয় নি। তবে তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান থাকলে বল্‌তে পার্‌তেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান সাহিত্য।

দেদার ভিস্তি নাকি গোয়ালা সেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের হাটে খাঁটী দুধ বলে হুবহু ঘোলাজল চালিয়ে দিচ্ছে,—এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর রটেছে! কতিপয় সাধু সাহিত্যিক ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমসাধ্য গবেষণার পরে, জল আর দুধের যে তত্ত্বগত তফাৎ, সেটা নিঃশেষে ও নিঃসন্দেহে আবিষ্কার কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন। আর তাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে কিছুদিন থেকে তাঁরা এমন কথাও খুব জোর গলায় যখনতখন বলে' আসছেন যে, সাহিত্যের পসরায় অজানা-অচেনা যা'-কিছু দেখা যাবে—সবই হবে অখাদ্য; অথবা সাহিত্যের আসরে বাঁধিগৎ ছাড়া যা'-কিছু বাজ্‌বে—সবই হবে বেসুরো!

তাঁদের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাতনের 'পরে নূতন আলোক-পাতের চেষ্টা—অনধিকারচর্চ্চা; আর নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত কর্‌বার প্রয়াস—সন্দেহজনক! এই সব সন্দেহ আর অনধিকার-চর্চ্চার হাত থেকে আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে গিয়ে, সাহিত্যিকদের ভিতরে যেরকম মারামারির সূত্রপাত হয়েছে, তাতে করে' সাহিত্য-ক্ষেত্র ক্রমশঃ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে! আর ইতিমধ্যেই এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ছোট বড় মাঝারি নানান্ রকমের চক্রব্যূহের পত্তন সুরু হয়েছে।—দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগ-সন্ধি-কাল এসে পড়েছে!

পার্ব্বত্য-প্রদেশ ছেড়ে, নদী যখন সমতলের বুকে গড়িয়ে পড়ে, তখন তার উচ্ছসিত কলহাসি পরিণত হয় মৃদুগুঞ্জনে, আর উদ্দাম অগ্রগতি পরিবর্ত্তিত হয় বিসর্পিত লাস্যে। অর্দ্ধশতাব্দী আগে বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে যে আলোড়ন ও অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল,—তা' থেকেই বাঙ্গলা সাহিত্যের উদ্ভব। নবীন সাহিত্য তখন নববলে, দৃপ্তবেগে, সমাজের বুকে, ভেঙ্গে-চুরে গলিয়ে-গুলিয়ে, তাণ্ডবতালে নেচে গেয়ে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে' নিয়েছিল,—কারও মুখ চায় নি, কোনো রাশ মানে নি!

আর এখন কালক্রমে সে স্পর্শ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমাদের সামাজিক মনের সে উত্তেজনা ও আবেগ অনেক কমে এসেছে;—তারি ফলে সাহিত্যের গতিও মন্দা হয়ে আসছে। সাহিত্য এখন প্রতি পদক্ষেপে সমাজের চাল-বিচার কর্‌ছে!—নিজের অধিকার অনধিকারের দর কষাকষি কর্‌ছে!—এ সব সাহিত্যের জড়তার লক্ষণ। যে অবস্থায় সাহিত্য কেবল সমাজকে পাশ কাটিয়েই যেতে চায়, নিজের উচ্চত অধিকারের প্রেরণায় দেশ-কালের অতীত হতে পারে না, সে অবস্থায় তার কাছ থেকে বেশী কিছু চাওয়া দুরাশা!—আমাদের সাহিত্যের এখন সেই অবস্থা।

বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি কিনা, তা' বুঝ্‌তে হলে প্রত্নতত্ত্বের দলিল, আর পুরাবৃত্তের জবানবন্দির প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতি যে অত্যন্ত ক্ষুধিত, সে কথা জান্‌তে সাক্ষীসাবুদ্ তলবের কোনই দরকার করে না, পেটে হাত দিলেই তা' মালুম হয়ে যায়! আর সব ক্ষিদের মত আমাদের সাহিত্যের ক্ষিদেও যথেষ্ট প্রবল। আর এ বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র;—তার কারণ ও রসের স্বাদ

আমরা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। বর্ত্তমান সাহিত্য আমাদের নতুন করে' বিশেষ কিছুই দিতে পার্ছে না।—কাজেই তাকে নিয়ে আমাদের এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি লেগে গেছে! ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে ছেলে মায়ের আঁচল ধরে টান্বেই!—বরং এমন টানাটানির সময়ে, একই দিক ধরে আমরা সবাই একযোগে যে একদিক পানেই টান্ছি নে, বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য না হলেও এই-ই যথা লাভ—অন্ততঃ মন্দের ভালো। আর, তা ছাড়া, ভাল-মন্দ'র ডিক্রি-ডিস্‌মিস্ যতই সোজাসুজি আমরা দিয়ে বসি না, সবসময়ে তা বাহাল থাকে না!—আজ আমাদের চোখে যা নেহাৎ খারাপ, কালে তা' থেকেই প্রচুর ভালোর সূত্রপাত হতে পারে। রাতের শেষে, ঊষার আগে, আঁধারের ধোঁয়া বেশী করে' ঘনিয়ে আসে।—কিন্তু সে কতক্ষণ!

অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে, আজকে যার উচ্ছেদ-সাধনে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, হয়ত তার'পরে ভিত্তি করেই আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হয়ে গেছে!

গ্রীষ্মের বিকেলে কাল-বৈশাখী যখন আমাদের খেলাধুলো সব মাটি করে দিয়ে, ঘরের দাবায় নজরবন্দী করে রেখে, আমাদেরই চোখের সাম্‌নে গোয়াল-ঘরের চালা উড়িয়ে, সুপুরিগাছের মাথা ভেঙ্গে, নানারকম অনর্থপাত কর্‌তো, তখন মনে হতো,—বাঁশ-ঝাড়ের মাঝখানে মাথাউঁচু করে ঐ যে বড় তেঁতুল গাছটা রয়েছে ওরই এ সব কারসাজি! রাজ্যের যত ঝড়-দম্‌কা সব ওর কালো কালো ডালগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকে; আর খেয়াল হ'লেই এইরকম সব হাঙ্গামা বাঁধায়।—এ বিষয়ে সন্দেহ আমাদের মোটেই ছিল না; কারণ প্রমাণ যা ছিল, তা' স্পষ্টরকমে প্রত্যক্ষ।—ঝড়ের যত আস্ফালন,

যত দাপট্, সব ওই তেঁতুলগাছের ডালপালার ইসারাতেই হতো, তা আমরা বেশ দেখ্‌তে পেতাম। তার যত ডাক-হাঁক সব ঐ বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর থেকেই আস্‌তো—তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। তখন মনে হতো তেঁতুলের গাছের গোড়া কেটে, অন্ততঃ মাথা মুড়িয়ে দিলেই, অতঃপর আর ঝড়ের আশঙ্কা থাক্‌বে না! এখন দেখে শুনে সে মত বদ্‌লাতে হয়েছে। এখন আমরা নিজেরাও বুঝি, ছেলেদেরও বুঝিয়ে থাকি যে, আবহাওয়ার যোগ-সাযোগেই ঝড় ঝাপটের উৎপত্তি হয়,—তেঁতুল গাছের মাথা মোড়ালে তার নিবৃত্তি বা উপশম কিছুই হয় না!

সব ঝড়ঝাপট্ সম্বন্ধেই ঐ এক কথা। ইদানীং আমাদের সাহিত্যে যে ঝড়-ঝাপ্‌টার আমদানী হয়েছে—তার মূলেও রয়েছে আমাদের দেশের আবহাওয়া। শিক্ষা দীক্ষার তারতম্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তারাজ্যে কোথাও বা তাপ বেড়েছে, কোথাও বা চাপের মাত্রাধিক্য হয়েছে, তারি ফলে, আমাদের সাহিত্য-প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় এ ঝড় ওঠা স্বাভাবিক, তাই ধীরে ধীরে এটা ঘনিয়ে উঠ্‌ছে।—বিশেষ করে কারো ঘাড়ে এর দোষ চাপিয়ে তার সম্বন্ধে কোনো সরাসরি হুকুম—মাথা ধর্‌লে মাথা কাট্‌বার ব্যবস্থার মতই সমীচীন হবে!

সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে সাহিত্যসেবীদের সমাহার যতই অপরিহার্য্য হোক না—সাহিত্যসৃষ্টির কাজে দ্বন্দ্ব একরকম অনিবার্য্য। দেশের সবারি মন যে একই সময়ে একই সুরে বাঁধা থাক্‌বে, এমন আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই অভাবের 'পরেই ত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার দৌড় আর বুদ্ধির ঝোঁক যদি সবারি সমান হতো;

সবাই যদি সব কথা একদিক দিয়ে আলোচনা করে একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতো ; কিছুই অজানা বা গোপন থাক্‌বার সম্ভাবনা যদি না থাক্‌তো—তা হ'লে আর প্রকাশের উত্তেজনা কারো ভিতরে আস্‌তো না ! অজ্ঞতার অন্ধকার, বা সন্দেহের গোধুলি না থাক্‌লে সাহিত্যের আলোক ফুট্‌তো না।

সাহিত্যিক ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুধু অনিবার্য্য নয়—স্বাভাবিক এবং দরকারী।—বারুদ যদি খাঁটী হয়, তাহ'লে আশপাশের চাপে তার কার্য্যকারীতা বাড়ে বই কমে না। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদও যতই তীব্র আর একাগ্র হয়, মীমাংসাও ততই ঘনিয়ে আসে ! তবে, সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে অসহিষ্ণু বা অধীর হয়ে পড়্‌লে—অর্থাৎ এক কথায় মাথা ঠিক না রাখ্‌লে, কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছনো সম্ভবপর হয় না—এ কথা সব সময়ে মনে রাখা উচিত।

তর্কের সময় মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লে, যা একটু-আধটু বস্তু ওখানে আছে তা বেবাক বাষ্পে পরিণত হয় ; আর তার বহির্ম্মুখীন চাপ ঠেলে কোনো যুক্তিই ভিতরে ঢুক্‌তে পায় না। ব্যাপারটাকে মাঝে মাঝে নিষ্ঠা বলে ভুল হলেও, প্রকৃতপক্ষে এ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয় ! নিষ্ঠার সংযম গোঁড়ামিতে থাকে না, আর গোঁড়ামির জ্বালা নিষ্ঠার রাজ্যে অচল। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যের অনেকটা শক্তিই ব্যয়িত হচ্ছে—এই গোঁড়ামির পোষণে এবং শাসনে।

সাহিত্যের গোঁড়ামি হচ্ছে—ভাবরাজ্যের দাসত্ব-প্রথা। সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই উচিত নিজেকে এবং অপরকে এর বন্ধন থেকে যথা-সম্ভব মুক্ত রাখা। বুদ্ধিকে মতের দুয়োরে বন্ধ রাখা আর যার পক্ষেই শ্রেয়ঃ হোক না, সাহিত্যিকের পক্ষে তা' মরণাধিক ! দেশের মনকে

সজাগ এবং সচল রাখবার ভার স্বেচ্ছায় যাঁরা নিয়েছেন—তাঁরা নিজে-রাই যদি মতের নেশায় অতি সামান্য কারণেই দিশেহারা হয়ে পড়েন—তা'হলে আর আমাদের আশা কোথায়?

আশা করি আমার কথায় এমন কেউ মনে কর্‌বেন না যে, আমি সাহিত্যিকদের জন্যে, মতামতের উপদ্রবের বাইরে, কোনো অনির্দ্দিষ্ট ধূম্রলোকের ব্যবস্থা কর্‌ছি। আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁদের বুদ্ধির অঙ্কুরগুলো সমস্তই যেন মত আঁক্‌ড়ে ধরেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট না থাকে। একহাতে ঢাল, আরেক হাতে তলোয়ার সত্বেও, সেপাইয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা মাঝে মাঝে সম্ভব হয়; কিন্তু সাহিত্য রথীর সব হাতিয়ারই যদি তাঁর অরক্ষনীয় মতের পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তাহলে প্রস্তাবিত অমতের আলোচনা তাঁর পক্ষে স্বভাবতঃই অসহনীয় হয়ে ওঠে।—আমাদেরও হয়েছে তাই। মত আমাদের এম্নি করেই পেয়ে বসেছে যে, মনন বা মনোনয়নের শক্তি এবং স্বাধীনতা কিছুই আর আমাদের নেই। এমন অবস্থা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না!

গোঁড়ামির তাড়নায় আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, এই পৃথিবীটা আমাদের গতিশীল।—কিছুই এখানে সুস্থির অবস্থায় নেই—কালের আবর্ত্তনে সবই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আর, এই অবিরাম পরিবর্ত্তন-পরম্পরা হ'তে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' মানব-সভ্যতার অব্যবহিত অতীত স্তরের ভিত্তির 'পরে নবতর এবং উন্নততর সোপানের প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান মানবের লক্ষ্য।

নূতনের সৃষ্টিকে আমরা আমাদের লক্ষ্য করে নিই নি, পুরাতনের মধ্যে বুদ্ধির গোঁজামিলন দিতেই আমরা এখন ব্যস্ত আছি!

বর্ত্তমানের জন্যে ভাব্‌বার এবং কর্‌বার সামর্থ্য বা আত্মনির্ভর কিছুই আমাদের নেই; অথচ অতীতের জন্যে মাথাব্যথা আমাদের অসীম। অতীতের নীচে মাথা গুঁজে, আমরা গায়ের জোরে তাকে উন্নতিশীল বর্ত্তমানের সাথে সমপর্য্যায়ে রাখ্‌বার বৃথা চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছি। ফলে, অতীতের উপযোগিতা একটুও বাড়্‌ছে না, কিন্তু তার চাপে আমাদের মাথাব্যথা ক্রমেই দুরারোগ্য হয়ে উঠ্‌ছে!

সামাজিক মনের এ ব্যাধি সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী। সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অতীত আমাদের সহায় না হয়ে অন্তরায় হয়েছে!—যা' আমাদের অতীতে নেই, তাকে আমরা করি অগ্রাহ্য; আর যার আলোচনা অতীতে হয়েছে, বর্ত্তমানে তা'তে হাত দেওয়া আমরা মনে করি ধৃষ্টতা! লোক-সাহিত্যের কোনো বিভাগেই যেন আমাদের নতুন করে শোন্‌বার বা বলবার কিছুই নেই। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রকার এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায় আমাদের সব বিষয়েরই শেষ কথা, সব অভিযোগেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেছেন।—আমাদের কাজ হয়েছে শুধু মাঝে মাঝে তার ঝুল ঝেড়ে চুণ ফেরান। তাঁরা আমাদের জন্যে যে আদর্শ, যে লক্ষ্য বাৎলে দিয়েছেন তা' থেকে চুল-মাত্রও এদিক ওদিক যেতে যদি কেউ ইঙ্গিত করে—তা'হলে সাহিত্য-সমাজে তার আর জল চলে না—কল্কে পাওয়া ত' অনেক দূরের কথা।

এমন বজ্র-আঁটুনী মাথা পেতে নেওয়া জীবিত সাহিত্যের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। সাহিত্য-স্রোত সচল এবং সতেজ রাখ্‌তে হলে জলের অত বাছ্‌-বিচার চলে না!—ভাগিরথী যদি কেবল সাম-গান-পূতা সরস্বতী আর শ্যাম-বেণু-অনুকারী যমুনাকে কোল দিয়ে, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী আদি করে সব অকুলীনদের প্রত্যাখ্যানে কর্‌তেন, তা হ'লে হয়ত

সগরবংশ উদ্ধারের ঢের আগেই বেহারের তাপদগ্ধ, পিপাসার্ত্ত কোনো জহ্নুমুনি-নম্বর-দুই-এর জঠরে আবার তাঁকে অন্তর্হিত হতে হতো !

আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাব আর ভাষার চৌহদ্দি নির্দ্দেশ কর্‌তে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা প্রায়ই এর গোড়ার কথাটি ভুলে যান। অতীতে যাঁদের প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্য নবকলেবর এবং শক্তিলাভ করেছিল—তাঁরা যথার্থ মুক্তপ্রাণ ছিলেন ! জ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানে কোনো প্রাচীর, হিন্দু-অহিন্দুর মাঝখানে কোনো পরিখা রচনা করেন নি ! নিজ নিজ বুদ্ধির কষ্টি পাথরে পরখ করে যা'-কিছু মূল্যবান মনে করেছেন, তাই দিয়েই তাঁরা সমাজ এবং সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে সমাজকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সাহিত্য গড়্‌তে বসেন নি।—আর সংস্কৃতমাত্রকেই শাস্ত্র, এবং শাস্ত্রমাত্রকেই অভ্রান্ত বলে' স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা সাহিত্যের আসরে নামেন নি ! এই স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভর তাঁদের ছিল বলেই বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তার আসনের আশা পোষণ করে !

অনেক সময়ে আমাদের তথাকথিত সাহিত্যিক রক্ষণশীলতার সাফাই হিসেবে আমরা অতীত সাহিত্যিকগণের কথার অবতারণা করে থাকি। অন্ধের মুখে হাতীর বর্ণনার মতন, এই সব প্রতিভার আলোচনা আমাদের হাতে যা-ইচ্ছে-তাই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ গোঁড়ামির মোহে আমরা আচ্ছন্ন ! হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণাগুণ নাকি ডাইল্যুসনের মাত্রাভেদে কম-বেশী হয়।—আমাদের মত হাতুড়ের হাতে পড়ে সাহিত্যিকদের গুণাগুণও স্থলভেদে সুবিধামাফিক কম-বেশী হয়েছে। কারণ দরকারমত আমরা সেগুলোকে আমাদের গোঁড়ামির

আরকে dilute করে নিতে ইতস্ততঃ কর্‌ছিনে! এম্নি ধারা গো-বধের সময় খুড়ো কর্ত্তা করে আমরা নিজেরই মনের কথা পরের মুখে সাজিয়ে দিচ্ছি।

• এতে করে সাহিত্যিক আলোচনা একটুও এগোচ্ছে না! অতীতের সাক্ষী যদি নিতান্তই আমাদের নিতে হয়—তবে তাকে সমগ্রভাবে দেখ্‌তে হবে। তার সাথে একপ্রাণ হয়ে তার কথা বুঝ্‌তে হবে। আগে-ভাগে নিজের রায় ঠিক করে ফেলে—পরিশেষে অতীতের সাক্ষী তলব করে— তা থেকে যতটুকু রায়ের অনুকূল তাই ছেঁটে কেটে নিলে—কোনোই ফল হবে না,—আমাদের সত্য-নিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হবে।

আর, তা ছাড়া, অতীতের ডিক্রি ডিস্‌মিসের পরে যে আর আপীল চল্‌বে না—এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। "অতীতের তাঁরা সব ছিলেন হাতী ঘোড়া, আর বর্ত্তমানের আমরা হচ্চি তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের প্রাণী" এ কথা যিনি বলেন, তাঁর সাথে এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে, আমার বিশ্বাস, অনেকেরই আপত্তি হবে।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

বৈশাখ, ১৩২৪।

জাপানের কথা।

—————:*:——— —

এসিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠেচে, একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে—এবং একবার পড়লে কোনকালে আর ওঠবার উপায় থাক্‌বেনা।

এই কথাটি যেম্‌নি তার মাথায় ঢুক্‌ল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন, যেন কোন্ আলাদ্দিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপন করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে—য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে' পড়ল

না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগ্‌ল। প্রথম কিছু-দিন এরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পূরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস ত যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে! শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মত মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুল্লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হল, অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা একান্ত ভেদ আছে, এমন কথা বল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চি, আমরা অভিমান করে বলি, "ওরা ভারি হাল্‌কা; আমাদের মত গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠ্‌তে পারে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে দিত পিষে।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙ্গালী

কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেচি।

যে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশী ঘটেচে, তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহলে বর্ব্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেচে, তারা অল্প-পরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই,আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচ্‌ল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেচে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও দ্রাবিড়ে আর্য্যে যে মিশ্রন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবি-মিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েচে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি, এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে

গেচি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েচে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেচে। বিচিত্র উপকরণ ভালরকম করে গলে' মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেচে। চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেচে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেচে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেচে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের

মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্ত ভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেচে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেচে, এবং তাতে-করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করচে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারচে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠচে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেচে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েচে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌চে। যে বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় করতে হয়—যে বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে

জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেচে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েচে কিনা সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়েছিল—তাতে করে' তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল। এই কারণেই বাঙালীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মত আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশী আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠচে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা-খোঁড়াখুড়ি করে মরচে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে

যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠ্‌ল—সেটা হচ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠেচে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা কর্‌চি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মত পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেচে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড় বেদনাই আমাদের মনে থাক্‌, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালীর উপরেই পড়েচে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে ত শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা এবং অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেচে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে

বসেচে। কিন্তু আমি যতটা দেখেচি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়।" জাপানী সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেচে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভাল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কি। কিছু-দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেচে, সেই ধর্ম্ম হয়ত তাকে শক্তি দিয়েচে—অতএব খৃষ্টানীকে কামানবন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েচে যে,

খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাবদুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বল্‌তে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা, ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেচে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করচে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চল্‌তে পারত না; কিন্তু জাপানে চল্‌তে পারচে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ করচে—সে জান্‌চে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংস্কার মূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মত এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আস্‌চে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়; পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্‌,

কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশী মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতা-য়াতের একটা পথচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, এই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙ্গালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার কথা।

-ঃ*ঃ-

চৈত্রের সবুজপত্রে ভাষার সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পড়িলাম। ভাষার কথা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমার মনে একটা সনাতন জড়তা আছে, এবং আমার বিশ্বাস খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমার মত দশাগ্রস্থ লোকের সংখ্যা কম নহে। এই বিষয়ে পরমহংস দেবের সুপরিচিত উক্তি মনে জাগিয়া আছে;—ভোজের সময় ততক্ষণই গোলমাল হয় যতক্ষণ পাত খালি থাকে,—পাত ভর্ত্তি হইবামাত্র বাজে কথা থামিয়া যায়। ভাষা লইয়া এত যে গোলমাল চেচামেচি চলিতেছে ইহা কাণে শুনিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু মনে ঠিক যেন যাইয়া পৌঁছিতেছে না। মনে হইতেছে এ বেবাক বাজে বকা, কেহই ঠিক জিনিসটী খুঁজিয়া পাইতেছেন না, পথে দাঁড়াইয়া মেলা কোলাহল বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ঠিক জিনিসটী পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে। পূজনীয় রবীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল,—এ কোলাহল নহে, ওকালতি নহে, দলাদলি মোটেই না, এ সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা; এ বিষয়ে প্রবন্ধ যত পড়িয়াছি, সবটাতেই ওকালতি দলাদলির গন্ধ পাইয়াছি। অবশ্য আমার নাসিকা যে সুস্থ, এমন স্পর্দ্ধা আমি কি করিয়া করি? তবে আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না,

এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে। তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, অভিসার মঙ্গলের দিকে—ইহা এই পক্ষের উকীল বা ঐ পক্ষের উকীলের লেখা নহে, দু'পক্ষেরই হিতৈষীর সসঙ্কোচ আবেদন। ঢাকা সাহিত্যসমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেশ-চন্দ্র সেন "ভাষার আকার ও বিকার" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-ছিলেন; ঢাকা রিভিউতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে মাত্র একবার তুল্যরূপ সমদর্শিতার ও সত্যানুসন্ধানচেষ্টার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় বরিশাল হইতে যে "পূর্ব্ব-বঙ্গের উক্তি" পাঠাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহা পত্রিকায় স্থানদান করিয়া সবুজ পত্র সম্পাদক সুরুচির পরিচয় প্রদান করেন নাই।

ভাষার কথা আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চাই, এবং যথাশক্তি মন খোলসা রাখিয়া আলোচনা করিতে চাই। এই বিষয়ে বক্তব্য এতই অল্প যে, কয়েকটা সূত্রাকারে বোধহয় আসল কথা কয়টা বলা যায়।

১। একটা জাতির কথিত ভাষাই হউক আর লিখিত ভাষাই হউক, তাহা কাহারও কথায় বা লেখায় ধাঁ করিয়া বদলিয়া যায় না, তা সেই বক্তা বা লেখক যত শক্তিশালী বা দেশমান্য হউন না কেন।

শক্তিশালী লেখক ও বক্তাগণ পন্থা নির্দ্দেশ করেন, এবং নিজেরা সেই পথে চলিয়া সেই পথের সুগমতা, আপদহীনতা ইত্যাদির উদাহরণ দেখান। দেশের লোক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল পরে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে।

২। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যন্তস্থিত জেলার শিক্ষিত লোকেরও মুখের ভাষা বদলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা এক কথ্য ভাষা গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে, তাহা অপ্রতিরোধ্যরূপে লিখিত ভাষায় ঢুকিয়া তাহাকে ক্রমশঃই আদিযুগের সংস্কৃত-ভাঙ্গা বাঙ্গলা হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

৩। উপরোক্ত প্রথায় ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া যাইতেছে, এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া যে আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে, তাহার দিকে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের লিখিত ও কথিত ভাষা অগ্রসর হইতেছে। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন ইহাকে কোনও বিশেষ স্থানের ভাষা বলিয়া সনাক্ত করা কঠিন হইবে; তবে ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য। এই ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

৪। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ইহা আপনা হইতেই গ্রহণ করিবে।

৫। তাহার পূর্ব্বে যদি কেহ বলেন যে, কথ্য ভাষায়ই লিখিতে হইবে, তবে সেই বাজে কথা কেহ শুনিবে না। আবার কেহ যদি বলেন যে, কেতাবী ভাষা ছাড়া লিখিলে পড়িব না, তবে তাহারই

ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাওয়া দরকার হইবে। এই বিষয়ে যেই পক্ষ যত জোরে কথা কহিবেন, সেই পক্ষেরই কথা তত ফাঁকা ও বেমানান হইবে। এমত অবস্থায় স্থীরধীর বক্তব্য এই যে, কথ্য ভাষায়ই লিখ আর সাধু ভাষায়ই লিখ, পড়িবার উপযুক্ত জিনিস থাকিলেই তাহা আদর করিয়া পড়িব আর পয়সা দিয়া কিনিব।

৬। শ্রীযুক্ত রবিবাবু সাধুভাষার দলের অসাধু ভাষা প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। কথ্য ভাষার দলের অকথ্য ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এখন আমরা পাঠক সাধারণ, ইহাদের দুই দলই চুপ করিলে বাঁচি। কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। ভাষার রূপটা কথার জোরে ঠিক করিবার চেষ্টা না করিয়া, কাজের দ্বারা তাহা করিবার সময় আসিয়াছে। কালে কথ্য এবং লেখ্য ভাষা মিলিয়া যাইয়া সেই মিলিত ভাষা সাহিত্যে চলিবে, এবং কাজেই দুই দলেরই জয় হইবে। শান্তিপ্রিয়ের পরামর্শ এই যে, রাতারাতি জয়ের আশাটা পরিত্যাগ করিলেই অনর্থক বাকবিতণ্ডা কমিয়া যায় এবং দেশ জুড়ায়।

৭। পরিশেষে বানর গড়িবার কথাটা যে রবিবাবু তুলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উণ্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ঢাকা।

মন্তব্য

—:০:—

ভট্টশালী মহাশয় এই প্রবন্ধের সংলগ্ন চিঠিতে লিখেছেন :—

"ভাষার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। সম্পাদককেও রেয়াৎ দেওয়া হয় নাই"।—

সম্পাদককে রেয়াৎ করা হয়নি বলেই এ প্রবন্ধটি "পত্রিকায় স্থানদান" করতে বাধ্য হলুম। নচেৎ লেখক এ লেখায় ভাষা ও ভাবের যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠকসমাজের কাছ-থেকে চেপে রাখতুম। ভট্টশালী মহাশয়ের বক্তব্য "স্থিরধীর" হতে পারে, কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গীটির ভিতর পরিচয় পাওয়া যায় শুধু অস্থিরতা ও অধীরতার। "বক্তব্য লিপিবদ্ধ" করবার যে তাঁর ত্বর সয়নি, তার প্রমাণ তাঁর লিপিচাতুরি। লেখকবিশেষের হাতে সাধু-ভাষা যে কত সহজে অশুদ্ধভাষা হয়ে ওঠে,—এ প্রবন্ধটি তার একটি পয়লা নম্বরের নমুনা। বানান ও ব্যাকরণের উপর ভট্টশালী মহাশয় যে স্বেচ্ছামত অত্যাচার করেছেন,—তার পরিচয় পাঠক এ প্রবন্ধের অনেক স্থলে পাবেন, কেননা পাছে ভট্টশালী মহোদয়ের প্রবন্ধের শুচিতা নষ্ট হয়, সেই ভয়ে আমি তার উপর হস্তক্ষেপ করিনি। "কথ্যভাষায়" যাই হোক, "লেখ্যভাষায়" যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাকী পদগুলির অন্বয় হওয়া দরকার,—এ বিশ্বাস সম্ভবত ভট্টশালী মহাশয়ের নেই, নচেৎ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির গড়ন অন্যরূপ হত।

"কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই"।

"ঠিক জিনিসটি পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে।"—

"তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই"।—

"চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উল্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।—

পাঠকমণ্ডলী ভট্টশালী মহাশয়ের লেখা না উল্টেও এমনি সোজা-সুজি ভাবে দেখ্‌লে দেখতে পাবেন যে, এ লেখা অতুলনীয়। ভট্টশালী মহাশয়ের স্বহস্তরচিত বাক্যগুলির অন্তর্ভূত অনেক পদই স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য। হইয়া করিয়া প্রভৃতি, ক্রিয়াপদের সাধুরূপ হতে পারে, কিন্তু তাদের উক্তরূপ ব্যবহার সাধুব্যবহার নয়। অসমাপিকা ক্রিয়াকে এ ভাবে সমাপন করায় শুধু ব্যাকরণ নয়, লজিকেরও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফরাসী দার্শনিক Bergson বলেন যে, মানুষ ছাড়া অপর জীবের মন থাকতে পারে, কিন্তু সে মনে subject, object এবং Predicate-এর সম্বন্ধজ্ঞান নেই; ও জ্ঞান যে কোন কোন মানুষেরও নেই, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধার করা যায়।

ভট্টশালী মহাশয় "কয়েকটা" "সূত্রাকারে" এই ভাষার তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু "এই বিষয়ে" তাঁর "বক্তব্য এতই অল্প," যে এক্ষেত্রে অতগুলি "সূত্রাকারের" দরকার ছিলনা—

একটিতেই কাজ চলে যেত। তাঁর সপ্ত "সূত্রাকারের" "অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে" সে এই :—

"ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে,........এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্ম অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ইহা আপনা হইতে গ্রহণ করিবে"।—

অর্থাৎ অবস্থার গুণে কালক্রমে যা আপনাহতেই হবে, তা হবে,—তার জন্য মানুষের কোনও ভাবনার আবশ্যক নেই। সাহিত্য জগতেও মানুষের মনের কোনও কাজ নেই, কেননা যা "নিজের অজ্ঞাতসারে" হয়, তাই গ্রাহ্য—জ্ঞাতসারে কিছু করবার চেষ্টা করাটাই অকর্ত্তব্য।—দেশসুদ্ধ লোককে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে পার্‌লে যে, তর্কবিতর্ক বিচার বিবেচনার কোনই বালাই থাকে না, তাতে আর সন্দেহ কি?—এবং তাতে করে, যাঁদের "মনে একটা সনাতন জড়তা" আছে, তাঁরা নির্ব্বিবাদে সেই জড়তার সনাতনত্ব রক্ষা কর্‌তে পারেন।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষের মন জড়পদার্থ নয়, সুতরাং জড়বস্তুর মত তা নিষ্ক্রিয় থাক্‌তে পারে না;—এবং মানুষ উদ্ভিদও নয়, যে সে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বলে, কালক্রমে "নিজের অজ্ঞাতসারে" ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ কর্‌বে। তবে মানুষ সচেতন পদার্থ হলেও, মানুষের মনে—ইংরাজীতে যাকে বলে inertia এবং সংস্কৃতে তমোগুণ—সেই জড়ধর্ম্ম আছে বলেই, সে মনকে ঈষৎ অগ্রসর কর্‌তে হলেও তার উপর তর্কবিতর্কের প্রবল ধাক্কা দেওয়া আবশ্যক।—এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সজ্ঞানে তা উপেক্ষা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই সহজ সত্যটি যে তাঁর

চোখে পড়ে নি, তার কারণ ভট্টশালী মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর মতেঃ—

"আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না, এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে।"—

কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। যে মত মানুষে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গড়ে তোলে, সেই মতই যথার্থ তার "আপনার মত"। বিচারবুদ্ধি যে মতের সৃষ্টির কারণ, বিচারবুদ্ধিই তার স্থিতিরও কারণ। অপর পক্ষে, যে মত হচ্ছে আসলে পড়ে-পাওয়া,—যে মত মানুষে অজ্ঞাতসারে অতএব নির্ব্বিচারে আত্মসাৎ করে,—তার রক্ষার জন্য বিচারবুদ্ধিকে মেঘমুক্ত করবার কোনই প্রয়োজন নেই,—"সনাতন জড়তাই" যথেষ্ট।—তা ছাড়া মানুষের কাছে পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্যও একটু বেশী; এ ক্ষেত্রে চৌদ্দ আনা যে ষোল আনা হিসেবে গণ্য হয়, সে কথা ত লোকমুখেই শোনা যায়। এবং পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্য বেশী বলে, মানুষের তার প্রতি মমতাও বেশী। এই কারণেই সে বস্তুর উপর কেউ হস্তক্ষেপ কর্‌লে লোকে—বিচার নয়, বিবাদ কর্‌তে প্রস্তুত হয়।

ভট্টশালী মহাশয় এ ক্ষেত্রে যে, বিচার নয় বিবাদ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছেন—তার প্রমাণ, তিনি আমাদের সকল কথা মেনে নিয়েও তার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেছেন! সম্ভবত আমাদের মতটা মেনে নিতে বাধ্য হওয়াটাই তাঁর অক্রোশের কারণ হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ—

"ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য।"—

এর পর জিজ্ঞাসা করি, আমার সঙ্গে তাঁর মতের প্রভেদটা কোথায়? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বল্‌বেন যে, "যা অনিবার্য্য, তা নিবারণ কর্‌বার চেষ্টা করাটাই লেখকদের কর্ত্তব্য। কেননা লেখ্যর সঙ্গে একাকার কথ্য "ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই"। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে সে ভাষা গড়ে উঠলে, তা আদর্শ ভাষা হবে। তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখকেরা যদি কথ্য-ভাষাকে লেখায় স্থান না দেন, তাহলে কি উপায়ে ও দুই ভাষার একীকরণ সম্ভব হবে?—এ প্রশ্নের এক উত্তর আছে—আপনা-আপনি। "সনাতন জড়তা" থেকে কিছুই যে আপনা-আপনি জন্মে না, এ কথা বলা বাহুল্য।

ভট্টশালী মহাশয় বলেছেন যে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্তের প্রবন্ধটিকে পত্রিকায় স্থান দান করে আমি সুরুচির পরিচয় দিই নি।—ও প্রবন্ধের ভিতর যে কি কুরুচি আছে, তা আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছি নে।—তবে ভট্টশালী মহাশয়ের সুরুচির জ্ঞান যে ঈষৎ অসাধারণ, তার পরিচয় তাঁর আগাগোড়া প্রবন্ধেই পাওয়া যায়।

পাঠকমাত্রেই দেখ্‌তে পাবেন, এ প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয় কি "ভদ্রতা", কি শালীনতা,—এ দুই গুণের কোনটারই পরিচয় দেন নি।

সম্পাদক।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৯

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস।

বাঙ্গালী যে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহহীন, স্বদেশের প্রাচীন কাহিনীর জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ, কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সব কথা তুলিয়া আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিয়া এ বিষয়ে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন এখন কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার গ্রাম খুঁজিয়া, মাটী খুঁড়িয়া বাঙ্গালীই এখন তাম্রশাসন এবং শিলালিপি বাহির করিতেছে, বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে, বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ তাহার ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল্য নির্ণয় করিতেছে। বাঙ্গালী ঐতিহাসিককে বাদ দিয়া এখন আর বাঙ্গলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের আকাশে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে আশা করা যায় ইতিহাসের মশাল তাহার একটা কোণ রক্তিম করিয়া রাখিবে।

আমাদের এই নবীন ইতিহাস চর্চ্চায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিতেছেন। তাঁরা বলেন তাঁরা যে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করিতেছেন তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়। তাঁদের রচিত ইতিহাস 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাস, এবং তাঁরা যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করেন তাহা 'বিজ্ঞানানুমোদিত-ঐতিহাসিক-প্রণালী'।

ইতিহাসের সম্বন্ধে এই 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'বিজ্ঞানুমোদিত' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির প্রকৃত অর্থটা কি তাহার আলোচনার সময়

হইয়াছে। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়ার, আর সকল রকম বিদ্যার আলোচনাকেই বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে, গত শতাব্দীর ইউরোপের ন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে। ইউরোপ এখন আবার এই রোগটাকে দূর করিতে সচেষ্ট। সে দেশ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাধিটা যাহাতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া না চাপে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এ দেশে যা একবার আসে তাতো আর সহজে বিদায় হয় না; তা শক হূণই কি আর প্লেগ ম্যালেরিয়াই কি। বিশেষতঃ দুর্ব্বল শরীরে সকল রকম রোগই প্রবল হইয়া উঠে। আর দেহের রোগের চেয়ে মনের ব্যাধি যে বেশী মারাত্মক তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যে বিদ্যার চর্চ্চাই করি না কেন তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নিদান হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি, আর সেই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। প্রথমটাতে পণ্ডিতকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে দ্বিতীয়টা। রেল, জাহাজ, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বন্দুক, কামান ইহাই হইল জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকট মূর্ত্তি। এমন অবস্থা বেশ কল্পনা করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলি ঠিক আজকার অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু সেগুলিকে ঘরগৃহস্থালীর কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাপ ও বাষ্পের সকল ধর্ম্মই জানা আছে কিন্তু রেল ষ্টীমার তৈরী হয় নাই। তাড়িত ও চুম্বকের নিয়মগুলি অজ্ঞাত নাই কিন্তু ঘরে ঘরে বিনা তেলে আলো জ্বলে না, বিনা কুলীতে পাখা চলে না। ফ্যারাডে ও

ম্যাক্স্‌ওয়েল জন্মিয়াছেন কিন্তু এডিসনের জন্ম হয় নাই। যদি সত্যই এই ঘটনাটা ঘটিত, তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আজ যে আদর ও মর্য্যাদা আছে তাহার কিছুই থাকিত না। এবং কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে কোনও পণ্ডিতই নিজের শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেন না। কারণ এই ব্যস্ততার মূলে আছে শাস্ত্রটাকে 'বিজ্ঞান' নাম দিয়া জনসমাজে জড়বিজ্ঞানের প্রাপ্য যে মর্য্যাদা তাহার কিছু অংশ আকর্ষণ করিবার লোভ। 'নামে যে কিছু যায় আসে না' এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে, এবং সেইখানেই ও তত্ত্ব শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের অর্দ্ধেক কাজ নামের জোরেই চলিয়া যাইতেছে, এবং পণ্ডিত-সমাজকেও সে সমাজ হইতে বাদ দিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

নিজের শাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রালোচনার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া নিজের ও পরের মনকে বুঝাইবার যে ইচ্ছা তাহার আরও একটু গভীরতর কারণ আছে। যখনি কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তখনি সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালী-টাকে সব তালার একমাত্র চাবী মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রেই সম্ভব অসম্ভব ফললাভের চেষ্টার পরিচয়, ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে। দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই রাশি-ক্রমটার গুণ আর শক্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কারণ নাই। যে গণনা মেধাবী পণ্ডিতেরও

দুঃসাধ্য ছিল ইহার বলে শিক্ষার্থী শিশুও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে লাগিল। এমন ব্যাপারে লোকের মন স্বভাবতঃই উৎসাহে ও আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা। ফলে এই রাশিক্রমের নিয়ম ও প্রণালীকে সকল রকম বিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। এবং অবশেষে পিথাগোরাস্ ঠিক করিলেন যে জগৎটা রাশিরই খেলা, রাশিক্রমেরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং এই রাশিক্রমের হের-ফের আরও ভাল করিয়া করিতে পারিলে বিশ্বসংসারের কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিবে না। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বীজগণিতের প্রয়োগে জ্যামিতি-শাস্ত্রের হঠাৎ আশ্চর্য্যরকম উন্নতি হইল তখন পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে স্থির করিলেন যে জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী। অমন যে ধীর স্থির বৈদান্তিক স্পিনোজা তিনিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রটীকে জ্যামিতির খোলসে আবদ্ধ করিলেন। এখন সেই কঠিন খোলস অতিকষ্টে সরাইয়া তবে তাঁর চিন্তার রস গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর আসিল নিউটনের আবিষ্কৃত গণিতের পালা। নিউটন যখন তাঁর গণিতের সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহের সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন তখন চোখের সম্মুখ হইতে যেন চিরকালের অজ্ঞানের পর্দ্দাটা সরিয়া গেল। জাগতিক ব্যাপারের মুলসূত্রটা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এবং কোনও রকমে এই গণিতটা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যে সকল বিদ্যাই জ্যোতিষের মত ধ্রুব হইয়া উঠিবে সকলেরই এই স্থির বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসের জের এখনও চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও গত শতাব্দীর প্রথমে যখন তাড়িত ও চুম্বকের অনেক ঘরের কথা

বাহির হইয়া পড়িল তখন আবার জ্ঞানসমুদ্রে একটা ছোটখাট ঢেউ উঠিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মনের বল যে তাড়িতেরই শক্তি ইহা ত এক রকম স্বতঃসিদ্ধই বোঝা গেল, এবং স্ত্রী পুরুষ, জলস্থল, ঠাণ্ডাগরম ইত্যাদি যেখানেই জোড়া বর্ত্তমান সেইখানেই যে চুম্বকের দুই প্রান্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম বিদ্যমান, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। জর্ম্মাণ পণ্ডিত শেলিং এই চুম্বক বেচারীর উপর একটা ভারী রকমের গোটা দর্শনশাস্ত্রই চাপাইয়া দিলেন। বিজ্ঞ পাঠকের এ রকম ছোট বড় আরও অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে ; এবং যদিও খুব ভয়ে ভয়েই বলিতেছি, আমাদের দেশে যে ত্রিগুণ তত্ত্বের চাবী দিয়া সংসারের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও আলোচ্য বিষয়ের আর একটা উদাহরণ।

সুতরাং আজ যে, সকল শাস্ত্রের আচার্য্যেরাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। এমন ঘটনা পূর্ব্বেও অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার ঘটিবে। বর্ত্তমান যুগের শরীর ও মন বিজ্ঞানের বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা একদিকে দেখিতেছি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির জ্ঞানের পথে অপূর্ব্ব সফলতা, অন্যদিকে দেখিতেছি কর্ম্মের জগতে তাদের বিস্ময়কর পরিণতি। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরের বিষয় লইয়া যাঁদের কারবার, তাঁরা যে একবার ঐ বিজ্ঞানের পথটা ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যখন দেখা যাইবে যে ও-পথটা যতই প্রশস্ত হোক্ ওটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই গন্তব্য পথ অন্য বিদ্যাগুলির

নয় তখনি গোড় ফিরিবার কথা মনে আসিবে। যাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে সে যদি হাটের পথের সোরগোল দেখিয়া সেই পথেই চলিতে সুরু করে তবে ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব ছাড়া আর কোনও ফল হয় না।

আমাদের নব্য-ইতিহাসের আচার্য্যেরা যে এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া, এই সব গভীর অগভীর কারণে চালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কেননা আমাদের দেশে এ কথাটা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মত একেবারে বিলাত হইতে তৈরী মালই আসিয়াছে; এবং ইংরাজী পুঁথির মাড়োয়ারী মহাজন ইহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস অনুসন্ধানের সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কথাটার মূলে কোনও বস্তু আছে কিনা সে আলোচনা আমাদের দেশে নিস্প্রয়োজন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

(২)

অবান্তর কথা বাদ দিয়া মূল কথা বলিতে গেলে কেবল এই মাত্রই বলিতে হয় যে বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ, প্রকৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানের কাজের প্রণালী ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও ধর্ম্মের আবিষ্কার করা। কিন্তু এই কাজ কিছু বিজ্ঞানবিদ্যারই একচেটে নয়। পৃথিবীতে যেদিন হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে, মানুষ যখন বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় বাস করিত সে দিন হইতে কেবল মাত্র দেহ রক্ষার জন্যই মানুষকে অল্প বিস্তর এই কাজে হাত দিতে হইয়াছে। মানুষ যে দিন আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছে সে দিন সে প্রকৃতির এক মহাশক্তি আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়াছে।

যে দিন কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে সেদিন ত প্রকৃতির বহু বিভাগের কাজের প্রণালী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কথা এই যে, জীবন যাত্রাটা চালাইবার জন্য মানুষকে তাহার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির যে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, বিজ্ঞানবিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহিত তাহার কোনও জাতিগত প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব তাহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়। সাধারণ ভাবে ঘরকন্নার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিরাট প্রকৃতির সমস্ত অংশের পরিচয় করা। সুদূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুর জীবন ইতিহাস পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে; বিজ্ঞান বিদ্যার লক্ষ্য একবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলের দিকে। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসে ভূয়োদর্শনের ফলে এই যে জ্ঞান, ইহা সাধারণ জ্ঞান। নির্দ্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেমন করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তন হয় সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, আর আহার অভাবে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয় এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান। জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে এবং পরিপক্ব অন্নরস কেমন করিয়া জীব-শরীরের ক্ষয়পূরণ ও উপাদান গঠন করে সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। সাংসারিক কাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্থূল হইলেও চলে। তাহাতে চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজন নাই; বরং সে হিসাব করিতে গেলে সুবিধা না হইয়া অনেক সময়ে কাজ অচল হইয়া উঠিবারই কথা।

কিন্তু বিজ্ঞান চায় সকল জিনিসেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। একটা চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়ে ইহা সকলেই জানি, ইহা সাধারণ জ্ঞান। গাছটা প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে তাহা জানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রচলিত ঘড়ির সময়ের বিভাগ সাংসারিক কাজের জন্য যথেষ্ট; আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রকে কতকগুলি পরীক্ষার জন্য এক সেকেণ্ড সময়কে হাজার ভাগে ভাগ করা যায় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়োজনের পরিমাপ যন্ত্র মুদির দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞান বিদ্যার চাই 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'।

যেমন জ্ঞানে তেমনি জ্ঞানের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণে কোনও ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টায় আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি সেই ইন্দ্রিয় গুলিই বিজ্ঞানেরও ভরসা। যে ন্যায় ও যুক্তি আমরা প্রতিদিনকার সাংসারিক কাজে ব্যবহার করি সেই ন্যায় ও যুক্তির প্রণালীই বিজ্ঞানেরও একমাত্র সম্বল। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আমরা জগৎ সংসারটার যেরূপ কল্পনা করি এবং যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটী তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক জগৎ নির্ম্মাণের চেষ্টা করে। এ বিষয়টী ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ এমন চমৎকার ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহার পর আর কাহারও বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রণালী মূলে এক হইলেও বিজ্ঞান যে ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান চায় তাহার জন্য তাকে নানা রকম কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এই গুলিই সেই কৌশল। ইহার কোনটীর লক্ষ্য

অতিদূর বা অতিসূক্ষ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনা, কোনটীর উদ্দেশ্য এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে তফাৎ করিয়া অন্য অবস্থায় তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা, কোনটীর চেষ্টা যে কাজের নিয়মটা, এমনি ভাল বোঝা যায় না তাকে গণিতের কলে ফেলিয়া আয়ত্ত করা। এই কৌশলগুলিতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশেষত্ব এবং ইহারাই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু এই বিশেষত্ব অতি বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব। অর্থাৎ যে কাজের জন্য যে কৌশলটীর দরকার সেই কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা বড় চলে না। কারণ এই কৌশলের আকার ও ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের বিষয় লক্ষ্যের দ্বারা। কাজেই এক বিজ্ঞানের কৌশলকে অন্য বিজ্ঞানে বড় কাজে লাগানো চলে না, এবং একই বিজ্ঞানের এক বিভাগে যে কৌশল চলে অন্য বিভাগে তাহা অনেক সময় অচল। গতি-বিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্বিজয়ী, রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না। রসায়ণের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী তাড়িত বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর যাহা বিশেষত্ব, তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাহিরে নেওয়া চলে না। এই বিশেষত্বের বেশীর ভাগই প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র, বিজ্ঞান বিশেষেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ। আর যাহা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই সাধারণ তাহা মোটেই বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ নয়। তাহা হইতেছে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের প্রণালী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানে ও সাধারণ জ্ঞানে কোনও ভেদ নাই। এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া কোনও লাভ নাই। কেননা এখানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই আসন এক জায়গায়।

সুতরাং ঐতিহাসিক যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা বলেন তখন প্রথমেই সন্দেহ হয় যে তাহার কথাটার অর্থ, যুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলিলে লোকের মনোযোগও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়টাকেও সে রকম মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময় কি যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।

দুই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' আমাদের দেশের নবীন ইতিহাসচর্চ্চার একটী প্রথম ও প্রধান ফল। সেই পুঁথি হইতেই দৃষ্টান্ত তুলিব।

দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে মহীপালদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে মহীপালদেব বাহুবলে সকল বিপক্ষ দল সংগ্রামে নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনেই তাঁহার পিতা বিগ্রহপাল দেবের বিষয় উল্লিখিত আছে যে তিনি সূর্য্য হইতে বিমলকলাময় চন্দ্রের মত উদিত হইয়া ভুবনের তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। এবং তাহার রণহস্তীগণ প্রচুরপয়ঃ পূর্ব্বদেশ হইতে মলয়োপত্যকার চন্দন বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া হিমালয়ের অধিত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে 'চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য 'কলাময়'ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা ও গজেন্দ্রগণ (আশ্রয় অন্বেষণে) নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শিশিরসংযুক্ত হিমাচলের

অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাখাল বাবু টীকা করিয়াছেন, "মৈত্রের মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২১১ পৃঃ।) এ কোন বিজ্ঞান? মৈত্রের মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুযুক্তিসঙ্গত এবং রসজ্ঞতারও পরিচায়ক বটে এবং তিনিও সেই ভাবেই কথাটা লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বেচারাকে টানিয়া আনা কেন?

কহ্লন রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের গৌড়ের রাজাকে হত্যার এবং রাজ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য গৌড়পতির ভৃত্যগণের 'পরিহাস কেশব' নামক দেবতার মন্দির অবরোধ ও তাহাদের বীরত্বের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'গৌড় রাজমালায়' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে এই কাহিনী সম্ভবতঃ অমূলক নয়, কেননা কহ্লন প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং মূলে সত্য না থাকিলে কাশ্মীরে গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনীর কোন জনশ্রুতি থাকিবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কহ্লন মিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্ব কাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি, অবলম্বনেই কহ্লন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কহ্লন কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয় কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ

করেন নাই। একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।" তারপর রাখাল বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদ কর্ত্তা ষ্টাইন সাহেব এ ঘটনাটা "সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১০৭ পৃষ্ঠা) ষ্টাইন সাহেবের মত সত্য হইতে পারে এবং রমাপ্রসাদ বাবুর ভুল হইতে পার, কিন্তু কোন জনশ্রুতির মুলে সত্য আছে কিনা তাহা স্থির করিবার কোন বাঁধা "বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী" নাই। চারিদিক দেখিয়া এ কথাটা বিচার করিতে হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ইহা অল্প বিস্তর মতামতের বিষয়ই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব কিছু নাই। সচরাচর দশজনে একটা কথার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে যে রকম ভাবে বিচার করে এও ঠিক সেই রকমের বিচার। তারপর সম্ভবতঃ একটু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে, রাখাল বাবু তাঁহার "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর" যে একটী সূত্রের কথা এখানে বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অচল। সে সূত্র আর কোনও বিচার না করিয়াই মানিয়া চলিতে হইলে, কি বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সমস্ত ইতিহাস রচনাই বন্ধ করিতে হয়। "বিজ্ঞানসম্মত" হইলেও প্রকৃত পক্ষে ও সূত্রটা কেহ মানিয়া চলে না, এবং প্রয়োজন হইলে রাখাল বাবুও মানেন না। তিব্বতের তারানাথ গোপালদেব গৌড়বাসীর রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রতিদিন একএকজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব

রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" এই রাজপত্নীর গল্প সম্বন্ধে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, "তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৫৩ পৃষ্ঠা)। সুতরাং 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস' যে একই গ্রন্থের একই বিষয়ে এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে কেবল তাই নয়, একই ছত্রের এক অংশকে উপকথা এবং অন্য অংশকে সত্য বলিয়াও সাব্যস্ত করে।

এইরূপে রাখাল বাবু তাহার সমস্ত গ্রন্থে বহুবার বহুস্থলে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথার অর্থ সাধারণ সুযুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য, ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে, সেই রকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। যে প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া মনে হয় বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছান যায়। এর চেয়ে ভুলধারণা আর নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা

রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের একদর হইত। কিন্তু প্রতিভাবান ছাড়া ত কেহ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ মজুরের দালান গাঁথা নয় যে ইটের উপর ইট বসাইয়া গেলেই হইল। যে উপাদান লইয়া সাধারণ লোকে কিছুই করিতে পারে না, ঐতিহাসিক প্রতিভা যাঁর আছে তিনি তাহা হইতেই সত্যের কল্পনা করিতে পারেন এবং অনুসন্ধানে সেই কল্পনা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। সব রকম বড় সত্যে পৌঁছিবারই এই পথ। তারপর এও ভুলিলে চলিবে না যে ঐতিহাসিকের আসল কাজ ধ্বংশ করা নয় গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া, হাতে ধরা দিবে এমনও বোধ হয় না।

হয় ত উত্তরে শুনিব যে বিজ্ঞানের যেটা লীলাভুমি সেই সাগর পারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের নিয়ম কানুন কাটা ছাটা হইয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই আইন কানুন যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তাহা হইল সমুদ্র-পারের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' খেলা। এ খেলার প্রবৃত্তি কেন হয় এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং লর্ড অ্যাক্টন বা সীলীর বচন তুলিয়া কোন লাভ নাই।

মানবজাতির মুক্তির জন্য ভগবান তথাগত যে চারটী মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটী এই যে সকল জিনিসই নিজের

লক্ষণে বিশিষ্ট; 'সর্ব্বং সলক্ষণং স্বলক্ষণং'। এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিস এক হয় না। বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

ভাষার কথা।

স্থিতি আর গতি—এ দুটী প্রকৃতির নিয়ম। একজন মনীষী লেখক হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—what it (Buddhism) destroyed no man has been able to restore and what it left no man has been able to destroy. এ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। What she destroys no man can restore and what she leaves no man can destroy, একটা জাতির মধ্যেও প্রকৃতির এই একই খেলা চল্‌ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এই যে লীলা তা একটা জাতির মধ্যে যতটা পরিস্ফুট ততটা আর কোথাও নয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে আমরা চিরকাল প্রকৃতির এই খেলা সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, তার শিল্পের ভিতরে, কথার ভিতরে, সাহিত্যের ভিতরে। আর সাহিত্যের যে ভাষা সে সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

সাহিত্যের এই ভাষা নিয়ে বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে একটা আন্দোলন ও তর্কবিতর্ক চল্‌ছে। একদল কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌তে চাচ্ছেন, অন্যদল লেখ্য ভাষার অর্থাৎ যে ভাষাটা এতদিন চলে আস্‌ছে তারই সমর্থনকারী। এই দুই দল আপন আপন মত সমর্থন করতে গিয়ে যে সব যুক্তি উপস্থিত করেন তা

আমরা সব বুঝি বা নাই বুঝি, আমরা একথা বুঝি যে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘট্‌বেই। কারণ বাঙ্গালীজাতি বা বাংলা-ভাষা সৃষ্টিছাড়া একটা পদার্থ নয় আর পৃথিবীতে এ যাবৎ সকল ভাষা সম্বন্ধে যে নিয়ম খেটে এসেছে, বাংলা-ভাষা সম্বন্ধেও সে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হবে না এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। বেদের ভাষা ও কালিদাসের ভাষায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! চসারের ভাষা, সেক্সপীয়রের ভাষা, ভিক্‌টোরিয়া যুগের ভাষা, প্রাচীন ও নব্য ফরাসী-ভাষা একটা ক্রম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। বাংলায় রামমোহনের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এই পরিবর্ত্তনের নিয়মেরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন যে বঙ্কিম পর্য্যন্ত এসে থেমে যাবে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ঊর্দ্ধগতিশীল বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যে, বঙ্কিমের ভাষাই যে শেষ কথা এ সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই সমীচিন নয়।

কিন্তু পরিবর্ত্তনের বিরোধী একদল চিরকালই আছে। মানুষের দুটী গুণ প্রকৃতিগত—একটী পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যটি নূতনের প্রতি টান। কিন্তু আমরা যে দলের কথা বল্‌ছি তাঁদের নূতনের প্রতি টান অপেক্ষা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রাই অধিক। সুতরাং এঁরা পুরাতনকেই আঁক্‌ড়ে ধরে' থাক্‌তে চান। এমন কি বঙ্কিম যখন কটমট পণ্ডিতী বাংলার পরিবর্ত্তে দুর্গেশনন্দিনীতে অপেক্ষাকৃত কথ্য-ভাষার কাছাকাছি ভাষা চালালেন তখনও একদল ছিলেন যাঁরা বঙ্কিমের সে ভাষাকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে পারেন নি। কিন্তু আজ যখন সেই পণ্ডিতী বাংলা আর বঙ্কিমের বাংলা তুলনা করে' দেখি তখন তাঁদের, বঙ্কিমের ভাষার বিরুদ্ধে সেই আপত্তি দেখে আশ্চর্য্য বোধ করি। তাঁরা সহজটাকে যে কেন বক্র করে দেখেছিলেন তা আমরা

বুঝেই উঠতে পারি নে। অন্যপক্ষে আবার আর একদল আছেন যাঁদের পুরাতনের উপর শ্রদ্ধার চেয়ে নূতনের উপর টানের মাত্রাই বেশী। এই দুই দলই আপন আপন মত ও ইচ্ছাকে অত্যন্ত একান্ত ক'রে দেখেন। বলা বাহুল্য এই কারণে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত যে সত্য সে সত্যটা এই দুই দলের চিরকাল অগোচরেই থেকে যায়।

এইজন্যেই আমরা বর্ত্তমানের কথ্য-ভাষার ও লেখ্য-ভাষার কোন্‌টার গুণ কি কি, কোনটার দ্বারা কতখানি ভাবপ্রকাশের সুবিধে হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, ক্রমপরিবর্ত্তন যে ভাষার একটা স্বভাব সেই কথাটিই শুধু নির্দ্দেশ কর্‌ছি। ফলতঃ রামমোহনের সময় হ'তে একাল পর্য্যন্ত বাংলা-ভাষার যে আশ্চর্য্যরকম পরিবর্ত্তন হয়েছে তা যিনি বাংলা-সাহিত্যের কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন তিনিই জানেন। অতীতকালে বাংলা-ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে যাঁরা কোন আপত্তি করেন না, তাঁরা যে ভবিষ্যতে এই পরিবর্ত্তনের কেন বিরোধী তা বুঝে ওঠা কঠিন। আর যে কোন কারণ থাকুক না কেন, আমাদের মনে হয় এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তাঁদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার, যে ভাষাটির সাথে তাঁদের এতদিনের পরিচয় সেটিকে ছেড়ে দিতে যেন তাঁরা কষ্ট ও অসচ্ছন্দতা বোধ করেন।

কিন্তু এখন যাঁরা কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার বিরোধী তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন, যাঁরা বলবেন যে ভাষার পরিবর্ত্তন যদি হয় তবে হোক্, কিন্তু কথ্য-ভাষাকে—বিশেষতঃ কোন প্রদেশ বা জেলাবিশেষের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি। এঁদের অনেকেই একটা বিশেষ আপত্তি নির্দ্দেশ করেন যে যদি কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে চালান যায় তবে ত

ঢাকার অধিবাসীও আপনার ভাষায় পুস্তক লিখ্‌তে বসে যাবেন। এই রকমে যদি প্রত্যেক জেলার লোক তার আপন আপন জেলার ভাষায় সাহিত্য রচনা কর্‌তে আরম্ভ করে তবে বাংলা-সাহিত্যের আদ্যশ্রাদ্ধ তো হবেই, বাংলাদেশ বলেও কিছু থাক্‌বে না। এই আপত্তিটা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সমীচিন বলেই মনে হয় কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করে চিন্তা করে দেখ্‌লে এ ভয় অত্যন্ত অমূলক বলেই সাব্যস্ত হবে।

কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা কর্‌লে যে ঢাকার অধিবাসী কিম্বা অন্য কোন জেলার অধিবাসী আপন আপন জেলার ভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু কর্‌বেন না, তার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, কলিকাতার ভাষায় ইতিমধ্যেই পুস্তক রচিত হয়েছে আর মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকার ভাষায় কোন বই বা রচনা প্রকাশিত হয় নি (রজনী সেনের কয়েকটী ব্যঙ্গ কবিতা ছাড়া)। সে ভাষায় কেউ কিছু রচনা কর্‌বার চেষ্টায় আছেন এমন কথাও শোনা যায় না। আসল কথা এই যে বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর মনের কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার দিকে একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এই বাংলাদেশের যে কোন জেলার লোকই হন না কেন শিক্ষিত হ'লেই তিনি নিজের জেলার আন্‌কোরা ভাষা পরিত্যাগ করেন। আর কিছু দিন কলিকাতায় থাক্‌লে তো কথাই নেই। তখন তিনি কলিকাতার ভাষাকেই আপনার ভাষা করে নেন। কলিকাতার ভাষার প্রতি শিক্ষিত মণ্ডলীর এই যে স্বাভাবিক টান তার কারণ যাই হক না, তা সত্য। এই কারণেই ঢাকা বা চট্টগ্রামের ভাষায় লেখা কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আর এই কারণেই নানান্ জেলার নানান্

ভাষায় পুস্তক রচিত হয়ে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হ'বে সে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক।

তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঢাকার ভাষাতে বই লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, এমন কি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ও সৃষ্টি করেন, তবে তাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পঠিত হবে সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও সে ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। ফরাসী কবি মিস্ত্রাল (Mistral) তাঁর প্রাদেশিক ভাষায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য মিস্ত্রালের সে কবিতা ফ্রান্সে সর্ব্বত্র পঠিত ও সমাদৃত কিন্তু তাই বলে সে ভাষা ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে নি। বার্ণস্ (Burns) স্কচ্ ইংলিশে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন কিন্তু সে ভাষা ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা হয়ে পড়ে নি। কারণ লেখকের যে রকম অমানুষী প্রতিভাই থাকুক না কেন, ভাষারও একটা প্রকৃতি-পরিচালিত স্বকীয় প্রাণ স্বকীয় গতি আছে। আর সাহিত্যের ভাষার যা পরিবর্ত্তন তা ভাষার সেই প্রকৃতি পরিচালিত গতির মধ্য দিয়েই ঘটে, তার বাইরে দিয়ে নয়।

সুতরাং যিনি যে ভাষাতেই সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা করুন না কেন তাঁর সে চেষ্টার সফলতা নির্ভর কর্‌বে এই জিনিসটির উপর যে সে ভাষা, আমরা ভাষার প্রকৃতি পরিচালিত যে গতি যে পথের কথা বলেছি সেই গতি সেই পথের অনুসরণ কর্‌ছে কি না? তা যদি না হয়, যদি সে ভাষা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে ভাষা সাহিত্যে কিছুতেই টি'কে থাক্‌তে পারবে না। বঙ্কিম যদি কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ কমলাকান্ত রামমোহনের ভাষায় লিখতেন তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হ'ক না কেন সে ভাষা পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ত কি না সে বিষয়ে

ঘোর সন্দেহ আছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয় সামগ্রী। কিন্তু মেঘনাদবধের ভাষা বঙ্গ-কাব্যকুঞ্জে আর কারও কণ্ঠে ফুট্‌লো না। তারও ঐ একই কারণ। সুতরাং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে কি না, তা নির্ভর কর্‌ছে কথ্য-ভাষা আর প্রকৃতির টানের যোগাযোগের উপর সে ভাষাটি প্রকৃতি-পরিচালিত গতির অনুকূল কি না তার উপর। কতদূর অনুকূল অথবা কতদূর প্রতিকূল সে বিচার আমরা এখানে কর্‌বো না। Fact হিসেবে ত দেখ্‌ছি বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের উপর তার প্রভাব অনেক খানি। এই নবাগত ভাষা বাংলা-সাহিত্যে যাতে পাকা হ'য়ে বস্‌তে পারে, ভবিষ্যৎ বাংলা-সাহিত্যেরই ভাষা হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সে জন্য দরকার সেই অমানুষী প্রতিভা অলৌকিক মনীষা, যা সৃষ্টির দ্বারা দেখিয়ে দেবে যে এই ভাষা ভুঁইফোড়ও নয়, বিদ্রোহীও নয়, বাংলা-সাহিত্যের প্রাণের সাথেই এর অব্যর্থ সংযোগ, এ ভাষা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের ভাষারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ভাষা হচ্ছে মন্ত্র। শব্দের মধ্যে ঋষি যেমন তাঁর তপস্যা-শক্তিকে চালিয়ে দিয়ে তাকে মন্ত্রে পরিণত করেন তেমনি লেখক তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ভাষা যেন সুপ্তবীণা। বীণার সপ্ত-তন্ত্রীতে সুর রয়েছে, তা যে কোন অঙ্গুলিস্পর্শে নিকণিত হয়ে উঠে। কিন্তু এই সপ্ততন্ত্রীর সপ্তসুরের পশ্চাতে একটী সমগ্র জগৎ বিদ্যমান—মানুষের যে রাগ দ্বেষ হাসি অশ্রু লজ্জা ঘৃণা ভয় মান্ এই সপ্তসুরের অন্তরালে লুকায়িত তা ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই বীণা সাধকের প্রতিভাময় অঙ্গুলির স্পর্শ। আমাদের কথ্য-ভাষা প্রতি-দিনের ভাষা। এর যে কি গুণ আছে না আছে তা আমরা ত কিছুই

জানি নে। এ ভাষাকে জ্বলন্ত কর্‌তে জীবন্ত কর্‌তে চাই প্রতিভার তপস্যা। প্রতিভাবান লেখক নবীন ভাষার শক্তি সৌন্দর্য্য ছন্দ তাল এক কথায় এর latent potentiality ফুটিয়ে তুল্‌বেন। এ ভাষায় প্রতিভাবান লেখক বা লেখকেরা এমন সাহিত্যের সৃষ্টি কর্‌বেন যার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত দেশের উপর ছড়িয়ে পড়্‌বে, তখন কি পাঠক কি লেখক সকলে সে ভাষার প্রতি দুর্ব্বার ভাবে আকৃষ্ট হতে থাক্‌বেন। তাই যখন হবে তখন নূতনের সৌন্দর্য্যে নূতনের তেজে নূতনের শক্তিতে পুরাতনের বিসর্জ্জনের আয়োজন চল্‌তে থাক্‌বে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য।

—:*:—

উপরোক্ত প্রবন্ধের মূল কথাটি আমি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি, এবং মুখের ভাষার যে কালক্রমে পরিবর্ত্তন হয়, আমার বিশ্বাস এ সত্য স্পষ্ট মুখে কেউ অস্বীকার করেন না। এ সত্ত্বেও যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তার কারণ মুখের ভাষার পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী লেখার ভাষাকেও যে পরিবর্ত্তিত করে' নেওয়া কর্ত্তব্য এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত তর্ক ওঠে।

প্রথমতঃ—গতি জিনিসটে দুমুখো। পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকেও হতে পারে, অবনতির দিকেও হতে পারে। পরিবর্ত্তন শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র, মানুষের চোখের সুমুখে হ্রাসবৃদ্ধির চেহারা এসে উপস্থিত হয়, এবং কাজেই লোকে না ভেবেচিন্তে হ্রস্বতাকে অবনতির ও দৈর্ঘ্যকে উন্নতির লক্ষণ বলে' মনে করে। যেহেতু তদ্ভব শব্দ প্রায়ই তৎসমের চাইতে আকারে ছোট সে কারণ, অনেকের বিশ্বাস বাংলা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এবং যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য ভাঙ্গাচোরা বাদ দিয়ে আস্ত জিনিসটেই সাহিত্যের কারবারে লাগানো সুবুদ্ধির কাজ। এ ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য আমাদের বল্‌তে হয়, যে হ্রাসবৃদ্ধি বল্‌তে আমরা বুঝি পরিমাণের তারতম্য, ও হচ্ছে গণিতবিদ্যার হিসেব আয়ুর্ব্বেদের নয়। নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, যে সব জীবের বিরাট কঙ্কাল আমরা যাদুঘরে দেখতে পাই তারা মানুষের চাইতে উন্নত-

স্তরের জীব ছিল। দেহের পরিমাণ থেকে, আত্মার পরিমাণ নির্ণয় করা দূরে থাক, দেহীর জীবণীশক্তিও যে নির্ণয় করা যায় না, এ জ্ঞান যদি সর্ব্বসাধারণ হত, তাহলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নবীনমত মানুষে দর্শন বলে গ্রাহ্য করত না। দেহাত্মবাদ আজও মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সুতরাং তার বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে লড়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মুখের ভাষার উপর আমাদের হাত নেই, সে ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন আমরা বন্ধ করতে পারি নে। লক্ষমুখে যে ভাষা গড়ে ওঠে—তার পরিণতি প্রকৃতি-পরিচালিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লেখার ভাষাকে এই পরিবর্ত্তনের হাত থেকে কতকটা বাঁচানো আমাদের করায়ত্ত। তা ছাড়া লেখার ভিতর ভাষাটাকে বেঁধে রাখবার প্রবৃত্তিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মুখের ভাষা বদলায় মানুষের অজ্ঞাতসারে এবং অজানা জিনিস নিয়ে মানুষে কারবার করতে সহজেই ভয় পায়। সুতরাং লেখায়, সাহিত্যের পূর্ব্বপরিচিত ভাষা ব্যবহার করা, লোকের বিশ্বাস লেখকের পক্ষে নিরাপদ ও সাহিত্যের পক্ষেও শ্রেয়ঃ। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার একটা যথার্থ প্রভেদও আছে, সে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মুখের ভাষা organic এবং লেখার ভাষা organised অর্থাৎ শেষোক্ত ভাষাকে নিজের মনোমত করে গড়ে পিটে নেবার স্বাধীনতা লেখকের অনেক পরিমাণে আছে। Organised জিনিসকে স্থায়ী করা সহজ কেননা ওরূপ বস্তু আপনা হতেই জড়ত্ব লাভ করে, আর সকলেই জানেন যে জড়বস্তু পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন নয়। সাহিত্যের ভাষার এই একভাবে টিকে থাকবার স্বভাবটা অনেকে তার প্রধান গুণ মনে করেন, কিন্তু আমার মতে ঐটেই তার প্রধান দোষ। ভাষা যাতে

সাহিত্যে জমে' না যায়, সে বিষয়ে আমাদের সদাসর্ব্বদা সচেতন ও সতর্ক থাক্‌তে হবে। লেখার ভাষার গতি স্বভাবতই মৃত্যুর দিকে। মুখের ভাষার সংস্রবেই তাকে জিইয়ে রাখা যায়। জীবন্ত ভাষাও লেখকদের হাতে পড়ে' যে কত শীগ্‌গির মৃত ভাষা হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ ভারতবর্ষের একাধিক কেতাবি প্রাকৃত। সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌লে লেখা জিনিসটেও Mechanical হয়ে পড়ে। এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই যা Mechanical তার বিরুদ্ধে লড়া দরকার। মানুষের দেহ মনের সকল কাজ যে কত সহজে Mechanical হয়ে পড়ে, এ জ্ঞান যাঁর আছে তিনি এই লড়ালড়িটে বৃথা কাজ বলে মনে কর্‌বেন না।

আমরা লেখায় সকলকে মুখের ভাষার অনুসরণ কর্‌তে বলি, অনুকরণ কর্‌তে নয়,—তার কারণ লেখার ভাষা মুখের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। মুখের ভাষা, যে লেখায় দ্বিজত্ব লাভ না করে, তা সাহিত্য নয়, এবং বলা বাহুল্য লেখা মাত্রেই সাহিত্য নয়। অধিকারীর হাতে ভাষা পুনর্জ্জন্ম লাভ করে আর অনধিকারীর হাতে মৃত্যু। সুতরাং যাতে আমাদের কলমের স্পর্শে ভাষা মারা না যায় সে বিষয়ে, আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এ বিপদ এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মুখের ভাষার কাছঘেঁসে থাকা।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ইঙ্গিতে বলেছেন যে নূতনের প্রতি টান বশতঃই আমরা নূতন মত প্রচার করেছি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, নূতনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আমি বাংলা-ভাষার গুণকীর্ত্তন কর্‌তে প্রবৃত্ত হই নি, বাংলা-ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই নূতন মত প্রচার কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। ভাষার রূপগুণ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা

নির্ণয় করা যায় না,—এর জন্যে রুচিও চাই। বাংলা-ভাষার সুর আমার কাণে মিষ্টি লাগে—এবং তার গতির ভিতর আমি অপূর্ব্ব প্রাণের পরিচয় পাই বলেই, দেশসুদ্ধ ভাষাপণ্ডিতে একজোট হয়েও আমার মন থেকে সে—মায়া কাটিয়ে দিতে পার্‌ছে না;—কেননা যা প্রত্যক্ষ তা কেউ অপ্রমাণ কর্‌তে পারে না। কিন্তু তাই বলে' আমরা পূর্ব্ব পক্ষের কথা উপেক্ষা কর্‌তে পারি নে; এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁদের যুক্তিতর্কও মেনে নিতে পারি নে।......কাজেই ওঠে তর্ক।

বাংলা-ভাষার যে সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা আছে, এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরা নিত্যই এ ভাষার নানারূপ ত্রুটি ও দৈন্যের বিষয়ে আমাদের সচেতন করিয়ে দেন। তর্কের খাতিরে আমাদের মাতৃভাষার হীনতার কথা মেনে নিলেও সে ভাষাকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে তিরস্কৃত করবার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাই নে। পৃথিবীর কোন ভাষাই সর্ব্বগুণে গুণান্বিত নয়, এবং তুলনায় সমালোচনা করতে গেলে, ভাষা মাত্রেরই কোন না কোন ত্রুটি ধরা পড়ে! ফরাসী-ভাষায় যে Paradise Lost রচিত হতে পারত না—এ বিষয়ে বোধ হয় ইউরোপে সকলে এক মত, কিন্তু তার জন্য ফরাসী সাহিত্য লাষ্ট ক্লাশে পড়ে যায় নি। অপর পক্ষে Musset-এর Comedies & Proverbs ও ইংরাজি ভাষাতে রচিত হতে পারত না। কিন্তু তার জন্য ইংরাজি সাহিত্যের ও মাথা নীচু হয়ে যায় নি। তা ছাড়া Divina Comedia কি ফরাসী কি ইংরাজি কোন ভাষাতেই রচিত হতে পার্‌ত না—কিন্তু তাই বলে ইতালীর সাহিত্য ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। এ সব কথা যদি সত্য হয় তাহলে সংস্কৃতের তুলনায় বাংলা-ভাষা দীনাহীনা, এ কথা বলার কোনই সার্থকতা নেই। আমি স্বীকার করি যে

স্বয়ং কালিদাসও বাংলা-ভাষায় মেঘদূত রচনা কর্‌তে পার্‌তেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বৈষ্ণব পদাবলীও ত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হতে পার্‌ত না। আমার এ কথা যে কতদূর সত্য তা চণ্ডীদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে দেখ্‌লে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন। পৃথিবীর অপর সকল বস্তুর মত ভাষাও দোষগুণে জড়িত। যে ভাষায় যা নেই তার উপর নয়, যা আছে তার উপরেই সাহিত্য গড়্‌তে হবে। লেখকের পক্ষে ভাষার ত্রুটী নয় তার শক্তিরই সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন। প্রতিভার অপেক্ষায় বসে' থাকার অর্থ সেই লেখকের জন্য প্রতীক্ষা করা যাঁর হাতে বাংলা-ভাষার সকল শক্তি ফুটে উঠবে। ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা হাত গুটিয়ে বসে' থাক্‌তে পারব না;—কেননা প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া না হওয়া অদৃষ্টের কথা। শুধু তাই নয়, প্রতিভার কর্ম্মক্ষেত্রের জমি আগে থাক্‌তেই তৈরি করে রাখ্‌তে হয়।

সম্পাদক।

পরমায়ু।

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাঁদের প্রাণের ঝর্না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্তির সাতনলী হার, নয় সে নিশাস বায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে' আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দ রসে পুরে;
অতীত হয়ে' তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়

তাঁদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে দিনের আলো,—
বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েচি, ডুব দিয়েচি, ঘট ভরেচি, নিয়েচি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একটি ঘটনা।

সকাল বেলা দোকানে বসিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধুতে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলাম। একটী ছোট ছেলে দরজার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল—একটী পয়সা বাবুজী।

ছেলেটীর বয়স ৭।৮ বৎসর। তার গৌর নধর দেহ ধূলিমলিন; কেশ দীর্ঘ ও ঘন, কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। ভগবান্ যাহাকে রাজপুত্র সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সমাজ কৌপীন পরাইয়া এই সুকুমার বয়সেই তাহার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি চাপাইয়া দিয়াছে।

একটা গান কর—পয়সা দেব, বলিয়া সুরেশ একটী পয়সা দেখাইল।

গান জানিনে ত বাবু—

নাচতে জানিস্?

না বাবু।

তবে ভাগ্ এখান থেকে।

ছেলেটী কিন্তু চলিয়া গেল না। বয়স অল্প হইলেও ইতিমধ্যেই সে বুঝিয়াছে যে এত অল্পে অভিমান করিলে তাহার চলিবে না। মিনতিপূর্ণ দুটী চক্ষু সুরেশের দিকে তুলিয়া সে আবার বলিল—একটা পয়সা দাও, ও বাবু।

আব্দার পেয়েছিস্—ভাগ্ বলিয়া ধমক দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সুরেশ চা খাইতে লাগিল।

যাহার বয়স আবদার করিবার—আব্‌দার করা তারও অপরাধ! কে তাহার আবদার শুনিবে! ভিক্ষা যে কেহ দিতে পারে—আবদার ত যে কেহ শুনিতে পারে না।

কেন জানিনা বালক কিন্তু সুরেশের মুখের দিকেই চাহিয়াছিল আর কেহ ত রূঢ় কথাটীও তাহাকে বলে নাই!

পিয়ালা হইতে সুরেশকে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে আবার বলিল—একটা—

পিয়ালার অবশিষ্ট গরম চা, সুরেশ বালকের গায় ঢালিয়া দিয়া বলিল—কেমন? ধরেছিস্ ত? নে এইবার—

তাহার সেই অদ্ভুত ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল—কি বাহাদুরীই হ'ল ওর গায়ে চাটুকু ঢেলে!

নরেন সেই সুরেই আরম্ভ করিল—আহা বেচারী, কোন ত জোর নেই, ওর—

ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—এও সেই আবদারের সুর। তবে আরো করুণ আরো মর্ম্মস্পর্শী। সে সুর অনেকের প্রাণে বাজিল—পথের পথিক পর্য্যন্ত চকিতে চাহিয়া দেখিল কিন্তু সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভিখারী বালককে দেখিয়া আর কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

প্রায় নির্ব্বিকার ভাবে পকেট হইতে একটী আনি বাহির করিয়া সুরেশ বালকের গায় ছুড়িয়া দিল। বলিল—চলে যা এখান থেকে চেঁচাস্ নে আর—ও গান আমরা শুনতে চাই নে।

ভয়ে ভয়ে বালক চুপ করিল—তাহার কান্না আর শোনা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল যে সে তখনো ফোঁপাইতেছে। এ ফোঁপানীও

ক্রমে থামিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শেষবার সুরেশ ও আমাদের দিকে চাহিয়া শেষে উঠিয়া গেল।

তাহার চোখের জল তখনো শুকায় নাই কিন্তু ভিক্ষা পাইয়া যে সে কৃতার্থ হইয়াছিল সেই চোখের কোণেই সে কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

ধরতাই বুলি।

—— ::*:: ——

এ কথাটা বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাক্‌লেও, কথাটায় যা বোঝায় তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে ; এবং মানুষে ধরতাই বুলির উপর যে বিশ্বাস খরচ করে, সেটা যদি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখ্‌ত তা হলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাক্‌ত না। সত্ত্ব, রজ, তম, সোঽহং প্রভৃতি বচনগুলি যে ছাত্র সমাজে, বৃদ্ধের দলে, মাসিক পত্রিকায় স্বদেশী বক্তৃতায় কতবার আওড়ান হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার ইংরেজী শিক্ষিতের দলে ত ধরতাই বুলি ছাড়া কথাই নেই। রাজভাষার এমনি মজা যে ওর বুক্‌নী শিখলেই সে ভাষায় ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যায়—শুধু তাই নয় বাঁধিগৎ এর বন্ধনে ভাবের গলায় যে দড়ী পড়ে তাও সম্পূর্ণভাবে ঢাকা যায়। এ সত্যের প্রমাণ খুঁজতে প্রয়াস পেতে হয় না, দৃষ্টান্তের ও অন্ত নেই। যে সব উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা বাংলা লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌লে উত্তর দেন "বাংলা আমি জানিনে" তাঁদের ভিতর শতকরা ৯৯ জন ভদ্রলোক সেই সঙ্গে মনে মনে বলেন "ইংরেজীটা জানি, তাই ধরেই আমার মনের কথাগুলো হুড় হুড় করে বেরুবে, মানুষে একসঙ্গে ক'টা ভাষা শিখতে পারে"। তাঁরা যখন বিদেশী ভাষায় কোন প্রবন্ধ লেখেন তখন মনে হয় "বেশ হল" কিন্তু যখন ঐ প্রবন্ধটা বাংলায় তর্জ্জমা করে পড়ি তখন মনে হয় সাহিত্যের অরন্ধন ভক্ষণ হচ্ছে। বাংলা দলের পক্ষেও ঐ কথাটা খাটে। মাসিকপত্রে সচরাচর যে সব প্রবন্ধ বেরোয় তাদের তর্জ্জমা

করলে মনে হয় "Census report-এর কথাগুলো খাঁটি, দেশে বাস্তবিকই অনেক সন্তান জন্মায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক আধজন বাঁচে"।

যাই হোক্ মোদ্দা কথাটা এই যে আমরা বুলি গুলো না বুঝে, না বাজিয়ে, মনের উপর তাদের কি রকম প্রভাব তা না জেনে, সে গুলো চালাতে চাই। সাধারণ লোকের হাতে বনমানুষের হাড় যেমন শুধু হাড়ই থেকে যায় তা দিয়ে কোন খেলা দেখান যায় না, তেমনি আমাদের হাতে ইংরেজী সংস্কৃত বুলি গুলো, শুধু বুলিই থেকে যায়—তা দিয়ে জীবনের কোন খেলাই খেলা যায় না। এই যেমন Evolution; যখন Politicsআলোচনা করি (অবশ্য অন্য দেশের) তখন বলি এই প্রজার পরোক্ষভাবে রাজ্য শাসন করবার প্রথাটা হঠাৎ আসে নি, এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে; যখন সমাজ সংস্করণের কথা ওঠে তখনও বলি "আচার কি আর ব্যাঙের ছাতা, যে রাতারাতি ভুঁইফুড়ে উঠেছে, এরও একটা ক্রমবিকাশ আছে" এই রকম বিবাহের, এমন কি ভগবানের ও নাকি Evolution আছে শোনা যায়।

আছে জানি, কিন্তু কি আছে নেড়ে চেড়ে দেখা যাক্। Evolution শব্দের মানে হচ্ছে কর্ম্মফল, যদিও ওর প্রতিশব্দ হচ্ছে অভিব্যক্তি। ধার্ম্মিকের কাছে "কর্ম্মফল" শব্দটা উচ্চারিত হলেই যেমন তাঁর বুদ্ধির আয়নার ঘাম মুছে যায়, তেমনি ইংরেজী পড়া লোকেদের কাছে এই কথাটার মন্ত্রশক্তিতে সকল তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়। ঐ একটি কথার জোরে সকল সমস্যার বাইরে চলে যাওয়া যায়। আমি আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি "ও কথাটার মানে কি বুঝিয়ে

দিতে পার ?” তিনি বল্লেন “ভাল করে বুঝতে গেলে অনেক কাঠ খড় চাই —তা তুমি যোগাতে পারবে না, তবে এই দুটো কথা শিখে রাখ survival of the Fittest আর Struggle for Existence”—তাহলেই ওর মোদ্দা কথা শেখা হবে।

“এ, ত কেবল নিয়মগুলো”

“ওই হল, আর কিছু বোঝবার দরকার নেই, বাস্তবিক পক্ষে Evolution বুঝতে আমরা তার নিয়মই বুঝি, কিন্তু আদৎ জিনিসটা সম্বন্ধে আমার খুব সাফ্ ধারণা নেই—বোধ হয় ক্রমবিকাশ বল্লে ভুল হবে না”

“না আমি প্রতিশব্দ চাই না, কথার মানে অভিধানেই দেওয়া আছে, কিসের ক্রম বিকাশ বুঝিয়ে দিতে পার ?”

“এই ধর মানুষ, বাঁদরের”

“এই রকম করে কতদূর পিছু হটতে পার ?”

“Cells পর্য্যন্ত”

“অর্থাৎ যতদূর অনুবীক্ষণে দেখা যায় ; তার বেশী না ?”

“এক পা'ও নয়”

“আর, কতদূর এগোতে পার ?”

“মানুষ পর্য্যন্ত ; তার বেশী এক পা'ও নয়, সব জ্ঞানই ত সীমাবদ্ধ তার উপর আবার বিজ্ঞান, তবে এই মাত্র কথা, অভিব্যক্তি-বাদে বিশ্বাস করতে গেলেই মেনে নিতে হবে যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পূর্ণ বিকাশের লোভে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে—অর্থাৎ উন্নতি করছে”

“ওটা তোমার নিজের কথা—বুক্ণীর বাইরের কথা। কোন একটা ভাব বুঝতে গেলে তার অভাবের স্বভাব বুঝতে হবে। যেমন ‘প্রকা-

শের ব্যাথা' বল্লেই 'অপ্রকাশের আনন্দ' ভাব মনে জাগে। কিন্তু বিজ্ঞানে 'নেতি'র দিক্ হচ্ছে উত্তরায়ণ, সে ধারে কোন কাজ হয় না। শুধু কাজ হয় না তাই নয় ও ধারটা যে আছে তাও তোমরা মানতে রাজী নও, এই বলে উড়িয়ে দিতে চাও যে Struggle হচ্ছে অবিকাশের বিপক্ষে। কিন্তু এ সত্য ভুলে যাও যে, পৃথিবীতে জীবনের বিকাশের বাধার নিয়মাবলীকেও ইভলিউসানের নিয়ম বলা যেতে পারে। আর Involution বলে যে একটা process আছে এও মানতে হবে। তোমরা বল মানি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মান না। আবার আর এক কথা, ওই অভিব্যক্তি আর অনভিব্যক্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে যার নাম হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশ্চলতা। চীন সভ্যতা ৪০০০ বছর আগেও যা ছিল এখনও তা আছে, এ ক্ষেত্রে তোমার ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী কি করে খাটাচ্ছ ?"

"কি জান, আমার মাথায় এ বিষয়ের এ দিক ও দিকের ভাবগুলি তেমন সাজান নেই"

"তা বেশ জানি, তবে আমার মাথাও ঐ বিষয়ে যে বেশী পরিষ্কার তা নয়—যাই হোক্ আমি এই অস্পষ্টতার কারণ দেখাতে পারি"

"দেখিয়ে কোন লাভ নেই, যদি অভিব্যক্তি-বাদের অস্পষ্ট কথা গুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারতে তা হলে কিছু positive জ্ঞান লাভ হত। negative-criticism করা যেমন সোজা, করাও তেমনি বৃথা"

"এও আর একটা বুলি।—আমি কারণ দেখাচ্ছি, আমার মাথা ও তোমার মাথায় যে পরগাছা জন্মেছে তার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে—ফুল-গাছের তোয়াজ মানে তার গায়ে কাগজের ফুল গেঁথে দেওয়া নয়—

তার মাথা মাঝে মাঝে ছেঁটে দেওয়া আর তার গোড়ার মাটি ঢিলে করে দেওয়া। মনের দেশেও ভাবের ফুল ফোটাবার ঐ একই পদ্ধতি।

"হয়েছে, কি বলবার আছে বল দেখি"

"আমার প্রথম আপত্তি—ইংরেজী কথার দাসত্ব জিনিসটেতে। এক একটি বচন যেন জালের কাঠি, জ্ঞানের বন্ধনের অপেক্ষাও এর বাঁধন শক্ত।

• দ্বিতীয় কথা এই:—Darwin-এর মত সম্বন্ধে কতক ভুল ধারণাই তাঁর মত বলে চলে যাচ্ছে। তাঁর প্রথম ও শেষ কথা এই যে, জীবদেহে আবহমানাবধি যে বদল ঘটেছে, তারই ইতিহাসের নাম ইভলিউসান। সেটা কখনও Moral thesis হতে পারে না যাতে করে আমরা তার রীতিকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মানব জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ইতিহাস দাঁড় করাতে পারি; অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করলে মনে অনেক দুরূহ প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাই বলে যে সে মতের উপর নির্ভর করে কোনও চেতন পদার্থের বিকাশের সাহায্য হতে পারে এটা বিশ্বাস করি না। তুমি কি মনে কর যে Darwinism সংক্রান্ত কোনই বই পড়িয়ে আমাদের মত নির্জ্জীব জাতিকে সজীব করতে পারা যায়?

"হাঁ এক হিসেবে পারা যায়, অনবরত "Struggle-এর কথা শুনতে শুনতে যদি মন নড়ে ওঠে"

"কতকটা সত্যি বটে, কিন্তু Darwinism বুঝতে শুধু Struggle for Existence-ই বুঝি কেন? ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরস্পরের সাহায্য করবার ইচ্ছা তার কত বড় পাতা অধিকার করে রয়েছে তা স্বয়ং Darwin কি Wallace স্বীকার করলেও আমরা স্বীকার করি

নে। এঁদের মধ্যে একজন এক যায়গায় বলছেন "Those commities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best" এই একটা লাইন দেখলেই মনে হয় যে Darwin হচ্ছেন বিজ্ঞান ধর্ম্মের যীশুখৃষ্ট, অর্থাৎ তার মতের তিনিই শেষ মতাবলম্বী। পূরো সত্যের ইতিহাস হচ্ছে মানুষের জীবন, আর খণ্ড সত্যের ইতিহাস Inquisition, Thirty Years' War আর বর্ত্তমান যুদ্ধ ; এ যুদ্ধ ইভলিউ-সানের ফল নয় ইভলিউসানবাদের ফল। ধরতাই বুলি খণ্ড সত্য, তাই তার গল্পের পাতা রক্ত দিয়ে লেখা ; Balance of Power কি Liberty-র গল্প কি জান না ?"

"আরও কিছু বলবার আছে না কি ?"

"আরও একটি আছে—সেটা বড় শ্রুতিকটু। বাঁধা বুলির প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের বোকামী। আমরা বড় বুদ্ধিমান বলে বড়াই করি—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আমরা চালাক হলেও বুদ্ধিমান নই। বুদ্ধিমত্তার রাজচিহ্ন হচ্ছে সূক্ষ্মভাব ধারণের সক্ষমতা। আমরা কিন্তু দা-কাটা Facts ছাড়া আর কিছু নিয়ে মনের কারবার করতে পারি নে।

"সে কি! আমাদের দেশে যে উপনিষদ লেখা হয়েছে, আমাদের জীবনই ত একটা abstraction."

"হাঁ লেখা হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়, কেবল তাই নয় উপনিষদ পড়ে কজন লোক খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে ?—একথা আমি খুব বড় গলা করে বলতে পারি যে যদিও আমরা বেদান্ত বেদান্ত করে মরি তবু আমরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত ; এমন কি কৃষ্ণজ্ঞান ও নই।

বৈষ্ণব গ্রন্থের এত আদর কিন্তু বৈদান্তিক গ্রন্থের আদর নেই কেন? এত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক হচ্ছে কিন্তু দার্শনিক কৈ? যখনই রবি বাবুর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি ঋষি কি না এই নিয়ে ওঠে তর্ক—তাঁর কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য যে কোথায় সে কথা কারুর মুখেই শুনি নে; তার কারন কি জান? রবীন্দ্র নাথকে কবি হিসেবে বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই তাঁকে আমরা মানুষ হিসেবে বিচার কর্‌তে বসি। উপর উপর দেখ্‌তে মনে হয় সমালোচকের স্থান গ্রন্থকারের অনেক নীচে, কিন্তু আসলে তা নয়।

"হাঁ একটা কথাই আছে Bad authors turn critics."

"ও বচনটাও ধর্‌তাই বুলি আর সেইজন্যেই খণ্ডসত্য; বাস্তবিক পক্ষে সমালোচকের কাজও মনের কাজ, এবং সে কাজেরও যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে। তাঁকে যুক্তির সূক্ষ্ম পথের উপর দিয়ে হাঁট্‌তে হয়, Ideas নিয়ে লোফালুফি করতে হয়।"

"আর সেইজন্যেই বোধ হয় সাহিত্যের আসরে সমালোচককে Clown কি বিদূষকের মতন দেখায়।"

"কিন্তু তুমি কি জাননা সার্কাসের Clownরাই হচ্ছে পাকা ওস্তাদ।"

"সব কথাত শুন্‌লুম এখন বলতে চাও কি?"

"এতক্ষণে তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তা হলে আমার বকাই বৃথা হয়েছে, একটু নিজে ভেবে দেখ—আমাদের মাষ্টার মশায় বলতেন 'ওহে একটু মনের গা ঘামিয়ো তা হলে কপালের ঘাম পায়ে

পড়বে না।' আমরা যাকে বোকামি বলি তা মনের আল্‌সেমি ছাড়া আর কিছু নয়।

"কিন্তু উপদেশটি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন অধার্ম্মিকের, আমাদের ধর্ম্মে, সর্ব্বদা মনকে শান্ত করতে বলে আর সেইজন্যে—

"শান্তিতে শুধু থাকিবারে চাই
একটি নিভৃত কোণে।"

"তোমার শান্তির মানে জানি। মনের কুঁড়েমীকে অন্য নাম ধরে ডেক না, তাহলে সে উত্তর দেবে না। কিম্বা বুলিগুলোকে অত যখের মতন মনের প্রহরী করে রেখোনা; যখের ধন কেউ নিতে পারে না বটে, কিন্তু সুদে বাড়ে না।"

"তোমার মতে ত ইভলিউসানও একটা বুলি। কিন্তু এটা কি জানোনা যে একালে ইভলিউসান বাদ দিয়ে আমরা চিন্তাই করতে পারি নে।"

"তাজানি, সেইজন্যেই ভবিষ্যতে আমাদের ইভলিউসানের বাইরেই চিন্তা করতে হবে, নচেৎ পৃথিবীর ছোটবড় অনেক সত্য, আমাদের মনের বাইরে থেকে যাবে।"

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

টী-পার্টি।

——ঃ*ঃ——

ব্যক্তিগণ ঃ—

অক্ষয়	...	হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ; Chicago-ফেরৎ।
ভূপেন্দ্র	...	সঙ্গতিপন্ন সাহিত্যিক।
সত্যব্রত	...	বিজ্ঞানে পণ্ডিত।
হিমাংশু	...	ব্যারিষ্টার।
পুণ্ডরীকাক্ষ	...	Antiquarian।
দেবকুমার	...	বেকার ও সবজান্তা।

স্থান ঃ—ভূপেন্দ্র বাবুর বাসভবন।

দে। (চা খেতে খেতে) আচ্ছা, আপনারা কি বলেন ? চাটা বেশ উপাদেয় হয়েচে না ?

পু। খাসা লাগ্‌চে, ডার্জিলিং চায়ের মতন flavour।

ভূ। তাই বটে। এখানে দোকানে যে সব চা বিক্রী হয় তার চাইতে ভাল মনে হ'ল বলে খাস্ ডার্জিলিং থেকে সেদিন দশ পাউণ্ড নিয়ে এলুম।

পু। সখও ত মন্দ নয় ! চা আন্‌বার জন্যেই অতদূর গেছলেন নাকি ?

ভূ। না, ততটা নেশা ধরে নি। বেড়াতেই গেছলুম ; আসবার সময় খানিকটে চা সঙ্গে আনা গেল।

হি। মজা দেখেচেন? এই চা-ই আবার ডার্জিলিঙে তৈরী করলে এখানকার মতন এত ভাল হয় না।

ভূ। বড্ড শীত কিনা।

স। এবার ওখানে খুব শীত পড়েছিল, না?

পু। কোন্ বারই বা কম পড়ে?

স। ওইটে আপনাদের ভুল বিশ্বাস। খবরের কাগজে যে Meteorological report দেয় সেটা কি সম্পূর্ণ বাজে?

দে। তা না হয় মানা গেল যে খুব শীত হয়েছিল, আপনার গায়ে ত আর লাগে নি?

হি। ও আর শীত কি? বিলেতে অমন সময় বরফ পড়ে।

অ। তেমন শীত আমাদের দেশে না হওয়াই ভাল।

হি। কিসে ভাল? এদেশটা যদি আর একটু ঠাণ্ডা হ'ত তাহলে বাঙালীরা এত কুঁড়ে হয়ে যেত না।

অ। মানে বুঝচেন না, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদিচ বেশী খাট্‌তে পারে, তাদের মধ্যে lungs-এর অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশী।

ভূ। তা আপনার মতন ডাক্তার থাক্‌লে অসুখের বড় ভয় থাকে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মস্ত গুণ হচ্চে, তার দ্বারা রোগের উপশম হোক্ না হোক্ রোগের বৃদ্ধি হয় না।

অ। কি জানেন, য়্যালোপ্যাথীতে সবই অন্ধকারে ঢিল মারা। দেখবেন, আর বিশ বৎসরের মধ্যে ওদের কেবল Surgery-টুকু থাকবে; আর ওষুধপত্র সব হোমিওপ্যাথিক হয়ে যাবে। এই এখনই দেখুন না, Injectionটা আমাদেরই "বিষে বিষক্ষয়" principle-এর

ওপর base করা। ওঁরা ওষুধ ফুঁড়ে দেন, আমরা গিলিয়ে দিই, এই যা তফাৎ।

দে। অনেকে আবার mixed treatmentও করেন। এই সেদিন আমার এক বন্ধুর গা-হাত-পা কামড়ে জ্বর এল; একটী ডাক্তার —নাম করব না— এক ফোঁটা Aconite ও একটী Aspirin-এর বড়ির ব্যবস্থা কর্‌লেন। জ্বর ছাড়্‌লে দিনকতক রোজ সকালে এক যোড়া করে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে খেতেও বলে গেলেন।

অ। তাঁর বোধ হয় কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। অথবা জান্‌তেন না যে একটী ফোঁটা Rhus Tox 30th. দিলেই হ্যাঙ্গাম মিটে যেত।

হি। আঃ, কি মিছে বাজে বক্‌চেন? চা খাবার সময় অসুখ ওষুধের গল্প করে মন খারাপ কর্‌বার দরকার কি? বিলেতে কোন পার্টিতে ও রকম গল্প করাটা বেয়াদবি বলেই গণ্য হয়।

দে। সেটা ঠিক্। বিলেত, অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই মুসলমানদের ভিতর ওসব বলবার যো নেই।

পুঁ। হ্যাঁ, মুসলমানেরা সবেতেই কায়দাদোরস্ত।

ভূ। তার মানে, ওদের জাতটা ত বেশী দিন পূর্ব্বে স্বাধীনতা হারায় নি; সুতরাং কায়দা কানুনও বোঝে, virilityও আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

স। সে আবার কতকটা আহারের গুণেও বটে। এই ধরুন না মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এই সব খাওয়ার রেওয়াজ আজকালকার হিঁদুর ছেলেদের মধ্যেও হয়েচে, আর তাতে করে তাদের শরীরও ভাল হচ্চে।

পু। ও বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওসব গরম জিনিস খাওয়া যদি ভাল হ'ত তাহলে কি আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ থাক্‌ত? কি বলেন, অক্ষয় বাবু?

ভূ। অক্ষয় বাবু 'হ্যাঁ'ই বলুন আর 'না'ই বলুন, যা চলে গেছে তার ত আর চারা নেই? আর ঐ শাস্ত্র দেখিয়ে দেখিয়েই ত আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল।

হি। You're quite right—ঠিক্ বলেচেন। ইংরেজরা অত বড় জাত কেন জানেন? ওরা কখ্‌খন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কথা কয় না।

স। কখ্‌খন না। ওরা গতানুগতিকের দাস হলে কি Science জিনিসটা তৈরী হ'ত? ওদেরই ঘরে ত বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর আজ এত বড় হয়েচে'।

পু। তা কিন্তু আপনি বল্‌তে পারেন না। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে aeroplane, machine-gun, asphyxiating gas, barbed wire entanglements, সবই এদেশে জানা ছিল। এখন আর পুষ্পক রথ, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, নাগপাশ, এ সব কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কৌটিল্য পড়্‌লে জানা যায় প্রাচীন ভারতে যে রকম গুপ্তচরের বন্দোবস্ত ছিল তা থেকে জর্ম্মাণরাও spy-system কিছু শিখ্‌তে পার্‌ত। এমন কি আর্য্যেরা wireless telegraphy জান্‌তেন এও প্রমাণ করা যায়।

ভূ। না; ততটা বোধ হয় সহজে প্রমাণ কর্‌তে পারেন না।

পু। সে আর শক্তটা কি? মুনি-ঋষিরা তপস্যাবলে বর পেতেন যে তাঁরা অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্‌লেই তাঁর "টনক্" নড়্‌বে, আর

তিনি এসে হাজির হবেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্চে যে telegraphy ছিল। এবং যখন পুরাকালের কোন wire খুঁজে পাওয়া যায় নি, তখন নিশ্চয়ই telegraphy টা wireless ছিল।

স। হ্যাঁ, এ যুক্তিটী আপনার অকাট্য! কিন্তু আমি যতগুলো telegraphyর ওপর বই পড়েচি তাতে একবারও এ কথা বলা নেই। অন্তত Hertz বা Marconiরও ত স্বীকার করা উচিত ছিল।

দে। বোধ হয় অতটা তাঁরা খবর রাখ্‌তেন না!

পু। তা ওরা জান্‌লেও কখন স্বীকার কর্‌তে চায় না। ওদের যে-কোন একটা ইতিহাসের বই খুলে দেখুন, লেখা আছে যে ইউরোপে যা কিছু ভাল ব্যবস্থা বর্ত্তমান,—সে কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি স্থপতি-বিদ্যায়, কি ভাস্কর্য্যে,—সবই গোড়ায় গ্রীস্‌ হ'তে আমদানী হয়েছিল। অথচ গ্রীস্‌ যে এখান থেকে, পারস্যদেশ থেকে, কত কি ধার করেচে তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি, বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরাও প্রমাণ কর্‌তে ব্যতিব্যস্ত যে ভারতবর্ষে যা কিছু আছে তা সবই বিদেশী,—মায় মানুষ-গুলো পর্য্যন্ত।

ভূ। এই হাল্‌-ফিল্‌ এক ধুয়ো উঠেচে যে পাটলীপুত্রে অশোকের যে শতস্তম্ভ দরবার-ঘর মাটীর নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েচে সেটা নাকি Darius-এর Hall of a Hundred Pillars-এর হুবহু অনুকরণ। অতএব, অশোক পার্সী ছিলেন!

স। কোন্‌ দিন হয়ত শুন্‌ব যে বুদ্ধদেব চীনেম্যান্‌ ছিলেন!

পু। কথাটা একেবারে আজগুবি ঠাওরাবেন না। যত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায় তার অধিকাংশেরই চোখ ছোট, কপাল উঁচু, নাক খাঁদা,—

আর গোঁফ নেই। যদিচ, বোধিসত্বগুলোর গোঁফ আছে। এই থেকে ধরা যায় যে বুদ্ধদেব Mongolian raceএ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দে। তার কারণ এও হতে পারে যে China, Japan, Burma Siam এতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার। সুতরাং যাঁরা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো বেশীভাগ গড়েন তাঁরা নিজেদের নাক-চোখকে আদর্শ ভেবে সিদ্ধার্থের প্রতি ভক্তি বশতঃ তাঁকে নিজেদের মতন করেই গড়েন।

ভূ। হ্যাঁ, Mongolian artএ ওদের নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি একটু বেশী প্রকট। Mongolian-দের আর একটা ব্যাপার দেখ্‌বেন, তাদের ঘরের প্রত্যেক জিনিসটীতে সৌন্দর্য্যবোধের ছাপ আছে।

পু। সৌন্দর্য্য বোধ আমাদেরই বা কম কিসে? ওরা art শিখ্‌লে কোত্থেকে? Mongolians-দের মধ্যে জাপানীরাই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? সেই জাপান ত গোড়ায় ছিল একটী বাংলা উপনিবেশ মাত্র।

দে। Okakuraও স্বীকার করেচেন যে জাপানীদের আর্ট ভারত-বর্ষ হ'তেই প্রাপ্ত।

ভূ। সে রকম ধরতে গেলে সব দেশই এদেশের কাছে ঋণী, এবং আমরাও অন্য দেশের কাছে ঋণী, আর আজকাল ঋণের ভার আমাদেরই বাড়্‌চে।

পু। আপনার কেবল ঐ এক কথা। আজই যেন আমাদের কিছু নেই,—ইউরোপের কাছে ধার করুচি। যখন ওরা বল্কল পরে বেড়াত আর বনের পশু স্বীকার করে খেত তখন এদেশের লোকেরা কত সভ্য ছিল, সে কথা যে একেবারেই ভুলে যাচ্চেন!

হি।. কি ছিল না ছিল তা জেনে কি হবে? বরং কি আছে সেই-টেরই ওপর নজর রাখা উচিত।

দে। ঠিক্ কথা। আমারও ত পূর্ব্বপুরুষদের জমিদারীর আয় যথেষ্ট ছিল। এখন কি তা আছে? তাঁদের বড়মানুষীর কথা এখন গল্প-কথার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েচে।

হি। আচ্ছা, আপনাদের গেল কি করে?

দে। সে আর বলে কি হবে? দুঃখ বাড়্‌বে বৈ ত আর কম্‌বে না। আমাদের তিনশ বছরের জমিদারী। দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় আমার প্রপিতামহ হরকিঙ্কর, কোম্পানীর দেওয়ানকে ঘুস দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর জমিদারীর সদর খাজনা দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর ক্রমাগত ভাগ হয়ে হয়ে এখন গেরস্ত দাঁড়িয়ে গিয়েচি। তাই ত বল্‌চি, পূর্ব্ব-গৌরবের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

স। বেশ, না হয় তাই বিচার করা যাক্ না, যে কি আছে।

ভূ। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব্বসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দুটী জিনিস বজায় আছে,—the art of cooking and the art of music। এই দুই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ হতে পারে নি।

দে। ও দুটী art এর কথা এক নিশ্বাসে বলা কিন্তু inartistic হল। সে দিন যেমন এক ভদ্রলোক লেক্‌চার দিলেন, poetry and Zoology'র ওপর!

ভূ। আমি ইচ্ছে করেই বলেচি;—আমার রাঁধবার সখ আছে, কেবল তাই জন্যেই নয়। কোন দেশের যখন অধঃপতন হয় তখন সব যেতে পারে কিন্তু খাওয়া থেকে যায়। যেমন কোন লোকের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেলেও বসতবাড়ীটী যেতে বিলম্ব হয়।

তবে হিন্দুদের সঙ্গীতটা কেন এখনও বজায় আছে তার ঠিক কারণ আমি খুঁজে পাই নি। বোধ হয়, মুসলমান রাজাদের পেয়ারে।

হি। তাই সম্ভব। দেশের রাজা ও দেশের বড় লোকেরা যদি পেয়ার না করেন ত কোন art-এরই উন্নতি হয় না।

ভূ। তাছাড়া মোগল সম্রাটেরা আবার art-এর দিকে বেশী নজর রাখ্‌তেন।

দে। সব art-এর নয়! Architecture-এই তাঁরা যা কিছু উন্নতি করেছিলেন। ও জিনিসটা পূর্ব্বে আনাদের দেশে তত জানা ছিল না। অর্থাৎ সাজাহান বাদসা যে রকম taste দেখিয়ে গেছেন তার পুর্ব্বে হিন্দুদের ত ওরকম ছিলই না, মুসলমানদের আমলেই কতকটা পুর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

পু। তাজ-টাজের কথা বল্‌চেন ত? সেও আজকাল সকলে স্বীকার করেন না। Havell সাহেব স্পষ্টই প্রমাণ করে দিয়েচেন সে তাজের architectureপুরোদস্তুর বৌদ্ধ।

হি। Cooking, music, architecture সবেরই উপর ত বক্তৃতা হল; কিন্তু বাঙ্গলার যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস, literature, সেইটীই বাদ পড়্‌ল কেন? রবিবাবুর গুটিকতক কবিতার অনুবাদ পড়ে যে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল এও ত বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভুপেন্দ্র বাবুর এবিষয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

ভূ। দেখুন, সাহিত্যের—সে গদ্যই হোক্ আর পদ্যই হোক্, দুটো দিক্; form এবং spirit। অনুবাদে form থাকে না; কিন্তু spirit অনেকটা থাকে। Wickland যখন Shakspere-এর জর্ম্মণ অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সেইটে পড়েই Goethe বলেছিলেন যে,

যার গদ্য-অনুবাদ এত সুন্দর তার মূল কাব্য নিশ্চয়ই অতি উঁচুদরের; কেননা অনুবাদে মূলের সে শব্দ বৈচিত্র্য নেই যা মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। রবিবাবুর অনুবাদ পড়ে সব দেশের লোকেরাই মুগ্ধ হয়েচে, এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে যে ওঁর কাব্যের Spirit সার্ব্বজনীন। সেই Spirit টাই আর্টিষ্টের নিজস্ব, এবং তার জন্যে আর্টিষ্ট পূর্ব্ব-সভ্যতার কাছে ঋণী নন্। তাই সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছিলুম।

হি। কিন্তু Goetheর সময়ে আর্টিষ্টরা যেরকম জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ না রেখে থাক্‌তে পার্‌তেন, Ibsen, Maeterlinck, Bernard Shawর সময়ে ততটা পারা সম্ভব নয়। তাঁরা Spirit of the age এর স্রোতে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হলেন।

ভূ। এবং সেই জন্যেই তাঁরা উচ্চসাহিত্য গড়্‌তে পারলেন না।

পু। গড়্‌লেই বা কি লাভ হত? ওসব করে কি জাত বড় হতে পারে? নাটক পড়ার চেয়ে পাঁচখানা অন্ধ্র dynastyর ওপর বই পড়লে কাজ হয়। আমাদের হয়েছে কি, Nova Zemblaয় কত ডিগ্রী ঠাণ্ডা তা জানি, William the Conqueror থেকে ইংলণ্ডে যতগুলি রাজা হয়ে গেছেন তাঁদের নাম মুখস্থ বল্‌তে পারি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের date কি তা নিয়ে যুক্তি বিচার করে দেখি না।

হি। তা বটে। আমাদের যা শিক্ষা হচ্চে তা যে একদেশদর্শী তার আর সন্দেহ নেই।

ভূ। মাফ্ কর্‌বেন, কিন্তু সেটার জন্যে আপনারাও অনেক পরিমাণে দায়ী। এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গেলেন, আর শিখ্‌লেন কি না ল'! দ্বারিক মিত্তির, রমেশ মিত্তির, স্যর্ রাসবিহারী, স্যর্ আশুতোষ, এঁরা এইখান থেকেই যা আইন শিখেচেন ও লোককে

শিখিয়েচেন তার চেয়ে কি আইনজ্ঞান আপনার বেশী হয়েচে? ল' পড়্‌তে বিলেত যাওয়া national economy নয়। আইনের ব্যবসাটীও national point of view থেকে অর্থকরী নয়। কেবল একজনের ট্যাঁক হাল্‌কা করে আর একজনের ট্যাঁক ভারি করা।

হি। কিন্তু এক হিসেবে আমরা দেশের উপকার কচ্চি। ধরুন, যদি আমরা ব্যারিষ্টার না হতুম ত যে টাকাগুলো আমরা পাচ্চি তা ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের পকেটে যেত।

স। তথাপি, যদি ব্যারিষ্টারী না পড়ে কিছু Science শিখতেন তাহলে দেশের আরও বেশী টাকা বাঁচাতে পারতেন। দেশে যত উকীল ব্যারিষ্টার হয় ততই লোকেরা মামলাবাজ হয়ে ওঠে।

হি। কিম্বা দেশের লোকেরা যত বেশী মামলাবাজ হয়ে ওঠে ততই উকীল ব্যারিষ্টারের দরকার হয়!

ভু। ও বিষয়ে এমন কিছু statistics নেই যা আশ্রয় করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানরত্ন উদ্ধার করবার জন্যে যে সমুদ্র-মন্থন প্রয়োজন একথা অস্বীকার করা যায় না। বিলেতে না গেলে কি আর জগদীশ অত বড় লোক হতে পার্‌তেন?—গাছের ভাষা মানুষের বোধগম্য হত?

দে। ওটী আমি মানি না। গাছের জীবন আছে এ আইডিয়াটার জন্যে সাগর পারে যেতে হয় নি।

হি। কেবল idea পেলে কি হবে? আইডিয়াকে কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হলে—বিশেষতঃ Scienceএ,—ঘরের কোণে বসে থাকলে চল্‌বে না।

অ। এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়ে আরো বেশী রকম খাটে।

পু। কেন, আয়ুর্ব্বেদ ত চতুর্ব্বেদের উপসংহার বলে স্বীকৃত হয়েচে। আজকাল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ হলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিও মেলে।

অ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কবিরাজেরা নিজেদের মনগড়া "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ" "আমরাক্ষসী" ইত্যাদি নামকরণে বিরত হচ্চেন, ততদন আয়ুর্ব্বেদকে Science ব'লেই মনে হবে না। কি বলেন, সত্যব্রত বাবু?

স। সে কথা সত্যি। তা ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান যেটাকে আজ সত্য বলে মেনে নিচ্চে, কাল যদি সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান সেটা মিথ্যা স্বীকার করতে বাধ্য। আয়ুর্ব্বেদে কতদিন আগেকার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েচে, সে ধারণাগুলো একবার revise করে দেখে, এমন লোকও এখানে নেই।

ভু। অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা পূর্ব্বমত সংশোধন করতে গিয়ে শুদ্ধটাকে অশুদ্ধ করে ফেলি। এই যা বলছিলুম, art of cooking আর art of music-এ জগতে আমাদের তুলনা নেই। রান্নার রীতি বা গানের পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন আধুনিক সভ্য দেশকে অনুকরণ করতুম তাহলে মোচার ঘণ্টও খেতে পেতুম না, আর ভৈরবীর মিষ্টি আলাপও শুনতে পেতুম না।

দে। অনুকরণ যে ঐ দুই বিষয়ে করি না, তাও বলতে পারেন না। এই যে এখানে বসে চা, কেক্ বিস্কুট খাচ্চি, এটা কি স্বদেশী ব্যাপার? আর সবচেয়ে ভাল যে স্বদেশী গান—ধন ধান্য পুষ্পে ভরা.........তার সুরটা ত শুনতে পাই সম্পূর্ণ বিদেশী।

হি। ওরকম আমাদের সবেতেই একটু আধটু সাহেবিয়ানা ঢুকেচে। এবং ঢোকাও ভাল। এই বাংলা গদ্য যা এত চমৎকার তা কবে থেকে হল ?—যবে ইংরেজরা আমাদের রাজা হলেন, আর বাংলা গদ্যলেখকেরা ইংরিজী সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করলেন।

ভূ। অবশ্য historically তাই বটে, কিন্তু এখন আর গদ্যে ইংরিজীর নকল করা উচিত নয়। বরং যদি নকল করতে হয় ত ফরাসী গদ্যকেই আদর্শ করা সমীচিন। ইংরিজী prose styleটে একটু ভারী। অধিকন্তু বাংলা ভাষা আর বাঙালী মেজাজের সঙ্গে ফরাসী ভাষা ও ফরাসী মেজাজের যেন বড্ড মিল।

দে। Lord Dyttonও বলেছিলেন,—The Bengalis are the French of Asia। বড় চারটীখানি কথা নয়!

স। কিন্তু ফরাসীদের যে রকম অগ্নিপরীক্ষা চলেচে, ওরা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না তারই বা ঠিকানা কি?

ভূ। তাহলে আধুনিক সভ্যতারও সহমরণ হবে। ইউরোপে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনকালে গ্রীস্, মধ্যযুগে ইতালী, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স।

স। আর জর্ম্মণি?

ভূ। জর্ম্মণি ত এখন আত্মবিস্মৃত। "জ্ঞানাঞ্জনে তার নয়ন আঁধার।" সমগ্র পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত,—তার গর্ব্ব খর্ব্ব করতে উদ্যত।

স। কিন্তু Science ওদের মতন কারও নেই।

ভূ। একজন ফরাসী থাকলে জবাব দিত যে ওদের Conscienceও অনন্যসাধারণ।

দে। এখন ওঠা যাক্। আমরা যে রকম omniscient ভাবে কথাবার্ত্তা কইচি তাতে ভুলে গেলে চল্‌বে না যে ঘুমোবার সময় হয়ে এল।

দোলপূর্ণিমা ১৩২৩।

শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব।

তপস্বিনী।

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশ গাছের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথাধরার বেদনার মত দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুর-ঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তারপরে বিদ্যারত্ন মশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকর্‌নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাৎ থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প! নামের সঙ্গে মাখন বাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড় শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বিএ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি

সৌখীন। জীবন-নিকুঞ্জের মধু সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড় আশা করিয়াছিল বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলে পণ্ডিত মশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাষ্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড় বড় দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষা-সাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব নামজাদা মাষ্টার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি-লাভের জন্য বড় বড় তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা—কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃসহ। সেকালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্ম্মারা; তারা বরদাকে বড় জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা

হইল এই যে, সে যশস্বী মাষ্টার মশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখন বাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর একদল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন ত তাঁরা পাইবেনই তারপরে বরদা যদি ফার্ষ্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট হল পর্য্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীয় বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশী করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মত ভয় করিত তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাক্‌লে আমার পড়া-শুনো হবে না।" মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাখন

তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোল-টুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বিএ পাস করা চাই।

এও ত বড় মুস্কিল! বিএ পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বিএ পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বিএ পাস বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, নড়িতে চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কি? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বিএ পাসে লাগিয়াছেন?

খুব একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বারবার তিন-বার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের দাগ দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়া-ছেন। তিনি বলেন, দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি? স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায়

আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বিএ পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো পরীক্ষা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুক্‌রা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দ স্বামী"

মাখন বাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুক্‌রা সাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শূন্য প্যাকবাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন

কোম্পানির সিগারেটবাক্সবাহিনী বিলাতী নটীদের মূর্ত্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্যে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের ত এই দশা ; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্য্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্না—কর্ত্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিসশাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে সে বেশী দিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন, তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা ত বুঝিনে, লিখে পড়ে দিতে পারি বরদা কখনই পাস করতে পারবে না। পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল

কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথম বার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাষ্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন, "ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও ত শেখে!" তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড় হইয়া পাস করে—এত বড়, যে স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, "ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই ওদিকে আছে।" লাট-সাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসা-হাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড় আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাটাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া-যাওটাকেও পূরা দাম দিল না। সবাই বলিল, "এই দেখ না, এল বলে'!" ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কখ্খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হায় করতে হয়!"

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন—তার কামনা সফল হইল।

এক মাস গেল বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘসঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে। এম্‌নি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন, ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ সুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে সুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড় ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, এমন কি, সে যে তামাকটা পর্য্যন্ত খাইত না এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই ত তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বরদার এত লেখাপড়া'র দরকারই বা কি ছিল? টাকার ত অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা সোনার টুক্‌রো

ছেলে।" তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে সুখে থাকে মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন-কিছু ফরমাস্ করে যেটা দুর্লভ—অনেকটা কষ্ট করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন,—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মত হইতে পারে।

(২)

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারদিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আলমারিটা—তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে, সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার "ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর।"

একদিন যখন বেলা দশটা ; অন্তঃপুরে যখন বাটি বারকোস ধামা চুপড়ি শিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকরনার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানলার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্ত্র মীড়টানা বীণার তারের মত চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগের আয়োজন কর।

এই সুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আবদারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখন বাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয় মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষতঃ জটাধারীরা যখন আহার আরামের অপরিহার্য্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত।

এই সাবধানতার কারণ ছিল এই—পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে! কেননা কি জানি :— বরদার যে-ফোটো-গ্রাফ খানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফ দাড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কি রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায় কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্য রকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সাংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়,—এর আগে রান্না-ঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়ত আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে, এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়া-ছিলেন, তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তাঁর সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তাঁর দেহ, গভীর তাঁর জ্ঞান, অতিকঠোর তাঁর ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার? সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই ত পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার

শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই ত আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড় অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, একবেলা যা খায় তার মধ্যে ফল মূলই বেশী। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া সুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—পণ্ডিত মশায় বলিলেন, এ'কেই বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল ; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্ব্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,—এমন কি স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং ত তার গায়ের তসরের রঙের মত সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহ মনের উপর কোন্ একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে তার ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতে-

ছিল জানালার কাছে বসিয়া, তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে; রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্‌খস্‌ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চীলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে ত কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্ম্মুখের বেদবেদান্ত উচ্চারণের অনেক পূর্ব্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে তারই ছোটবড় হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাঁস মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী ত কৃচ্ছ্র-সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রংকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিত মশায়কে ধরিয়া পড়িল আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন। পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার ত এ সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি ত পাকা আমলকীর মত আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিস্ময়

প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা সুখের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ির ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে। তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বল ত?

মাখন বলিলেন, সেটা না শিখিলেও ত বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যতদূরে গেছ সেই খানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পায়?

তা হউক্ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দ্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালীই মোটামুটি তাঁরই মত—অর্থাৎ খায়দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলা দেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোর বেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখী হইয়া দেখা দিলেন। পাখীর ল্যাজে তিনটি মাত্র পালক ছিল; একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটি যে সত্ত্ব রজ

তম, ঋক্ যজুঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কী লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরী হইতেছে; দুইজন এম্ এস্ সি ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাব্ জজ্ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগ্‌নেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত কারয়া দিয়া মনে আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যেগি অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য কমিটির গৃহীসভ্য হইতে হইল। গৃহীসভ্যের কর্ত্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহীসভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ, অনেক সময় থার্ম্মমিটরের পারার মত সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠা নামা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু এই ভুল-চুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পুরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড় কিছু বাকী রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতিমাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ীর ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করচ কি? মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন. "তাই ত, কি করি!" ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁক্‌বে?"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল, তার মর্ম্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(৩)

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, তা আমি কেমন করে' জান্‌ব ?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন, তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন করে জান্‌লেন ?"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্ম্মিণী করে নিয়েচেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা' কি জান্‌তে পারি ?"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এস।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দ্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখতে পাচ্চ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্চে কিন্তু সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি নে।"

"শাদা কিছু দেখ্‌চ কি?"

"শাদাই ত বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মত?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় ত দেখি নি তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লঙচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড!

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষমাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল সেই লঙচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া

লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না কিন্তু আর চল্‌চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে, কোন্ দিন আমার বিষয় ক্রোক্ করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ সমস্তই তাঁর স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্ম্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লঙ্‌চু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কি বাবা?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড় পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারচেন না?"

"একি? বরদা নাকি?"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড়-কাচা কল কম্পানির ভ্রমণ-কারী এজেণ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় করে' দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ্ পকেট হইতে বাহির করিল।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আষাঢ়, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মুখরক্ষা।

ভয়ঙ্কর গোলমাল! সন্ধ্যের পর থেকেই সদর দরজার উপর থেকে সানাইয়ের চীৎকার এবং এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে গুটীকয়েক ভট্‌চাজ্জি নস্যি নাকে টিপে শাস্ত্রের কচ্‌কচানি জুড়ে দিয়েছেন, এবং বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা কুট্‌নো কোটা এবং ছেলেদের দুটো খাইয়ে দেবার তালে হুলুস্থূল বাধিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমির মেরাপের নীচে একদল বরযাত্রী এসে জড় হয়েছেন যাঁদের তুমুল আনন্দের স্রোত থেকে থেকে অন্য সব শব্দকেই ভাসিয়ে কিম্বা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পাড়ার ভদ্রলোকদের মধ্যে আর বড় কেউ ব্রজেন বাবুর বাড়ীতে আসেন নি, কেবল এসেছেন মুখুজ্জে ও গাঙ্গুলি যাঁরা দুজনেই নিঃসন্তান এবং এই কাজের এবং পাড়ার সকল কাজেরই প্রধান উদ্যোগী। আর এসে জুটেছেন সেই ঘটকচূড়ামণি, যিনি এই সংঘটনের কর্ত্তা, এবং সেই পরামাণিক যে ব্রজেন্দ্র বাবুর বদান্যতার গুণে সব পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য ভট্‌চাজ্জিরা কেউই স্থানীয় নন, সুতরাং বিদায়ের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দায়ের আশঙ্কা তাঁদের ছিল না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই গ্রামস্থ, কিন্তু তাঁদের আসাযাওয়া নাকি সামাজিক হিসাবে ততটা ধর্ত্তব্য নয়, এবং তাঁরা "আসেন নি"

একথা বল্লে পুরুষদের সেটা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, তাই তাঁদের সংখ্যা সম্ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর গোলমাল ও সংঘর্ষ যদি উৎসবের মানদণ্ড হয় তাহলে এ বিবাহে উৎসবের মাত্রা কিছুই কম হয় নি।

দেখতে দেখতে গ্রামের কতকগুলো ইয়ার ছোক্‌রা এসে বরযাত্র-দের ছেঁকে বেঁকে ধরলে, এবং অবিলম্বেই ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা ও শান্তিভঙ্গের সূত্রপাত হলো; কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে।

একা ব্রজেন বাবু নিজের সাধ্যমত চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, কাউকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে, কাউকে ভদ্র-কথায় আপ্যায়িত করে, কারুর কাছে বা নির্ব্বাক হয়ে হাত জোড় করে।

বরপাত্র তখনো এসে উপস্থিত হন নি, তাঁর নিহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এখনি আসবেন এই রকম সকলের মুখেই দুই তিন ঘণ্টা ধরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এগারোটার লগ্ন ত প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তখন আকাশে মেঘ বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাসের দুই একটা দম্‌কা কখনো বা দুই একটা ঝাড়ের আলো নিবিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালগুলোকে তুলে নিয়ে ঘুরোতে ঘুরোতে বিয়ের আসরে এনে উপস্থিত কচ্ছে, আর একটা হাড়ীর মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে বকুনি খেয়ে ও সেইগুলোকে পরিষ্কার করে'।

ব্রজেন বাবুর মনটা যেন ক্রমশই কেমন একটু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছে। একে দেখবার লোকের অভাব, তাতে আকাশের বেগতিক, তাতে পাত্রের অনুপস্থিতি, এই তিন কারণে এবং সম্ভবতঃ আরো

অনেক কারণে, যা আমরা জানি না, তাঁর মনের ভিতরকার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্তও কে যেন গুলিয়ে দিচ্ছিল। তিনি বাইরে ছুটে গিয়ে একবার ঘড়ির দিকে ভ্রুকুটীর সঙ্গে চেয়ে বল্লেন "তাই ত"। তারপর গাঙ্গুলির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। গাঙ্গুলির কানে কানে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বলবার পর গাঙ্গুলি একটু বিরক্তির স্বরে বলে উঠ্‌লো, "অত অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কেন।"

গাঙ্গুলির কথা শুনে মুখুজ্জে একটা ডাবা হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং ব্রজেন বাবুকে সহসা গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বল্লেন "তুমি কিচ্ছু ভেবনা ব্রজেন, আমরা যখন রইছি তখন কারুর সাধ্যি নেই যে তোমার কোন রকম অসুবিধে করে— আজই কি, দুদিন পরেই কি।"

আসল কথা, মুখুজ্জে এবং গাঙ্গুলির যে উৎসাহ সে কেবল কর্ম্মের উৎসাহ, তার ফল সম্বন্ধে তাঁদের মত গীতার সঙ্গে যতটা মেলে ব্রজেনের সঙ্গে ততটা নয়।

ঘটক পীতাম্বর তখন তর্কবাগীশের সঙ্গে স্মৃতিতীর্থের রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিয়ে যে তর্ক হচ্ছিল—তাই হাঁ করে' গিলে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে খট্ করে বাজলো মুখুজ্জের শেষ কথা। পাছে এই শেষ মুহূর্ত্তেও সব কেঁচে যায় এই আশঙ্কায় তিনি তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে দিয়ে এবং কাছাটাকে ধূলোয় লুটোতে লুটোতে একেবারে ব্রজেন বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে ভাঙ্গা গলায় বল্লেন—"কেন, কিছু গোলযোগ হচ্ছে নাকি?"

ব্রজেন বাবু ধীর ভাবে "না" এই উত্তর দিয়ে নিকটস্থ সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত হলেন।

পুরোহিত রামধন ভট্টাচার্য্য তখন কুশাসনের উপর দুই হাত দিয়ে দুই জানুকে বেষ্টন করে অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাম্রকুণ্ডের উপরস্থ এমন কোন জিনিসের উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছিলেন যা ফুল চন্দন নয়।

ব্রজেন বাবুকে দেখেই তিনি দু' তিনটি তুড়ীর সাহায্যে নিজের আলস্য প্রকাশ কল্লেন এবং তাঁর দীর্ঘ চিক্কণ টিকিটীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জণীর মধ্যে পাকাতে পাকাতে বল্লেন "কদ্দূর ব্রজেন বাবু? এদিকে আমার ত সব প্রস্তুত"।

"দেখা যাক্" বলে ব্রজেন বাবু আকাশের দিকে চাইলেন। একটা বিদ্যুত বড় মাছের মত আকাশের গায়ে 'কড়াৎ' করে একটা ঘাই দিয়ে মেঘের রং আরো ঘুলিয়ে দিয়ে গেল।

গাঙ্গুলী, মুখুজ্জে ও ঘটক আস্তে আস্তে ব্রজেন বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং অধ্যাপকের দল সভাস্থ হলেন। স্মৃতিতীর্থ একটা কোন কথা-প্রসঙ্গ তোল্‌বার ইচ্ছায় বল্লেন—"এ মেঘে বৃষ্টি হবে না—যদিও আড়ম্বর নিতান্ত কম নয়"।

শিরোমণি তাতে সায় দিয়ে বল্লেন—"শরৎকালে সবই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—ব্রজেন বাবু চমকিত হয়ে শিরোমণির মুখের দিকে চাইলেন।

তর্কবাগীশ শিরোমণিকে তিরস্কারচ্ছলে বল্লেন—"ও কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক, সম্প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যাতে লগ্ন ভ্রষ্ট না হয়"।

পুরোহিত সশব্যস্তে উত্তর কল্লেন, "সে বিষয়ে আমি সতর্ক আছি ; এখনো রাত্রি দ্বাদশ দণ্ডের অধিক হয় নি—সুতরাং অনুমান আরো অৰ্দ্ধঘণ্টা সময় আছে"।

"তা হলে আর ত দেরী করা যায় না" বলে' ব্রজেন বাবু নবীন ও বাঞ্ছাকে ডেকে বল্লেন "ওরে! লণ্ঠন নিয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে দে,, তাঁরা আস্‌ছেন কি না"।

মুখুজ্জে গাঙ্গুলির দিকে চেয়ে বল্লেন "এ উত্তম প্রস্তাবই করেছেন—দেখা দরকার"।

গাঙ্গুলি একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে নবীনকে ডেকে বল্লেন—"আর তাঁদের দেখা পেলে বাঞ্ছাকে বলিস তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে, আর তুই দৌড়ে এসে আমাদের খবর দিবি"।

• স্মৃতিতীর্থ হেসে বল্লেন "এটা খুব প্রবীণ কথা, কারণ তাহলে সংবাদ পাবামাত্রই কার্য্যারম্ভ করা যাবে"। বেশ বোঝা যাচ্চে এই অনুষ্ঠানে যে কয়জনে যোগ দিয়েচেন, সখের যাত্রার দর্শকদের মত অভিনয় ব্যাপারে তাঁদের মন নির্লিপ্ত,—আর কিছু না হোক্ তাঁরা আশা করচেন যথেষ্ট সঙ্ বাহির হবে। এমন সময় বাইরের থেকে শব্দ উঠ্‌লো "ওহে ছোকরা, দেখ না আমাদের দক্ষিণ হস্তের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি না—ক্ষিদে মাত্ হয়ে যে চোঁয়া ধোঁ ছাড়্‌তে আরম্ভ কল্লে"।

ব্রজেন বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে গাঙ্গুলির দিকে চাইলেন। গাঙ্গুলি মুখুজ্জের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বল্লেন—"যাওনা হে, একটু থামিয়ে রাখ না—আমি যে এখান ছেড়ে যেতে পাচ্ছি নি"।

একজন রসুইকর ব্রাহ্মণ ছুটে এসে পীতাম্বর ঘটকের কানে কানে বল্লে "বাবু লুচি কি এখন ভাজা বন্ধ থাক্‌বে?"

গাঙ্গুলি ঘটককে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে বল্লেন—“কি ? হয়েছে কি ?”

ব্রজেন বাবু সব শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লেন “দু’চার খানা করে’ ভাজগে”—

গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি বল্লেন—“না,—এক খানাও না—সকলে এসে গেলে, একেবারে পাতে বসিয়ে দিয়ে গরম গরম লুচি পাতে দেবো”।

এদিকে বাড়ীর ভিতর থেকে কে একটা ছেলে উচ্চৈঃস্বরে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো “মা খাঁদী আমার কাপড়ে পান্তোয়ার রস দিলে।” সঙ্গে সঙ্গে তীব্র-মধুর কণ্ঠে আওয়াজ হলো—“লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে এলে হতো—যা, দূর হ’ ”—অমনি শোনা গেল একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাতের শব্দ, এবং দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং জামা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল এবং উঠোনের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে শুয়ে অনন্ত আকাশের বুকে সজোরে লাথি ছুড়্‌তে লাগ্‌লো।

ব্রজেন বাবু তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং গাঙ্গুলীর দিকে চেয়ে বল্লেন “দাদা একবার ভাঁড়ারে না গেলে ত হয় না,—সেখানে নাকি সব লুট হয়ে গেল”।

গাঙ্গুলি খুব মুরুব্বিয়ানা ভাবে বল্লেন “আচ্ছা সে আমি দেখ্‌ছি, তুমি কিছু ভেবো না—আর একলা আমি ক’দিকেই বা যাই”।

গাঙ্গুলি বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে একটা চাকরকে দেখ্‌তে পেয়ে তর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লেন “এই বেটা—কোথায় থাকিস্‌—এক কল্কে তামাক দে”—এই বলে রোয়াকের উপর বসে পড়্‌লেন।

তর্কবাগীশ ব্রজেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজছিলেন—তিনি আবার কথা পাড়লেন—"যাই বল শিরোমণি ব্রজেন বাবুর এ কাজ সকলে হয়ত সমর্থন না করতে পারেন, কিন্তু ওঁর সৎসাহসকে প্রসংসা না করবেন এমন কেউই নেই"।

ব্রজেন বাবু তর্কবাগীশের দিকে একটু প্রখরভাবে দৃষ্টিপাত কল্লেন। শিরোমণি বল্লেন "আর এ কাজ ত শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রে এরও ত একটা ব্যবস্থা আছে"।

পুরোহিত মহাশয় স্মৃতিতীর্থের কাছ থেকে একটু নস্যি নিয়েছিলেন—তার ফলে তিনি হাঁচতে হাঁচতে এবং গামছা দিয়ে নাক রগড়াতে রগড়াতে বল্লেন--"আঁছে না? নৈলে বিদ্যাসাগর মশায় ত একটা মুর্খ ছিলেন না"।

ক্রমে স্মৃতিতীর্থ ও এ তর্কে যোগদান কল্লেন এবং পরাশর বড় কি মনু বড়, যুগধর্ম্ম মেনে চলা উচিত কি না, এবং "নষ্টে মৃতে"—প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ ও বচনের প্রয়োগে সে স্থান একটা টোলের মতই প্রতীয়মান হতে লাগলো।

পীতাম্বর বাঁকা হাসিতে শাণ দিয়ে কেবল এইমাত্র বলে নিরস্ত হলেন "বিশেষতঃ এমন সুপাত্র পেলে সকল বয়সের বিধবাই দার-পরিগ্রহ করতে পারেন।"

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে ভর্ৎসনাপুর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—"শুনে যাও।"

ঘটক চুপ করতে গিয়েও তার মুখ দিয়ে কেবল এই কথাটী বেরিয়ে গেল—"একেবারে কার্ত্তিক—কোন দোষ নেই।"

ব্রজেন বাবু আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পাল্লেন না ; একজন সানাইওয়ালা এসে বল্লে—"বাবু আমাদের কিছু খাবার মিলবে না ?"

ব্রজেন বাবু "ওরে—ও—হাঁ—চল—আমিই দিচ্ছি" বলে ভাঁড়ারের দিকে ছুট্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত হেঁকে বল্লেন—"কিন্তু আর ত দেরী করা যায় না—লগ্ন ত এসে গিয়েছে বটেই, বোধ হয় আর কিছুক্ষণ পরেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

ব্রজেন বাবু ভাঁড়ার থেকে সেই কথা শুন্‌তে পেয়ে ছুটে বাইরে এসে বল্লেন—"ঘড়িতে এখন ত বারটা বাজে—তিন মিনিট আছে।"

স্মৃতিতীর্থ তাড়াতাড়ি পাঁজি টেনে নিয়ে মুখের ভঙ্গীতে নানাবিধ তর্ক ও গণনার চিহ্ন প্রকাশ করে বল্লেন "তাহলে আর ঠিক ১৭ মিনিট আছে, এদিকে তিন ওদিকে চোদ্দ।"

ব্রজেন বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওরে নব্‌নে, ওরে বাঞ্ছা"—তার পর মুখুজ্জেকে আস্‌তে দেখে বল্লেন "মুখুজ্জে পাত্র এসে গিয়েছে ত ?"

মুখুজ্জে কি বল্‌বেন বুঝতে না পেরে বল্লেন—"হাঁ, বোধ হয় এসে গিয়েছে—আমার যেন দূর থেকে সেই রকম মনে হলো।"

"আহা, দেখেই এস না" এই কথা ব্রজেন বাবু বল্‌তেই মুখুজ্জে বল্লেন "দেখে আর আসব কি—বাবাজীকে তুলেই নিয়ে আস্‌ছি"—তারপর তিনি বাইরের দিকে চলে গেলেন।

রামধন ব্রজেন বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"ব্রজেন বাবু—শুনছেন—মশায়—এই দিকে আস্থন—বসে যান—আপনার কাপড় ত ছাড়াই আছে—আর আপনিই ত সম্প্রদান করবেন ?"

ব্রজেন বাবু "এঁ্যা, আমি বস্‌ব?—তা—আচ্ছা—দাঁড়ান—একটু আস্‌ছি"— বলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুট্‌লেন।

"এখন আবার চল্লেন—শীগ্‌গীর আস্‌বেন কিন্তু" বলে' পুরোহিত ফুলটুল সাজিয়ে নিয়ে আচমন করে বস্‌লেন।

ব্রজেন বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে ডেকে বেড়াতে লাগ্‌লেন—"গিন্নী—কোথায় গো—গিন্নী"। কিন্তু গিন্নী তখন নিকটে ছিলেন না। ব্রজেন বাবু খুঁজতে গিয়ে বারবার অপরিচিত স্ত্রীলোকদের সুমুখে পড়ে গিয়ে নিজেকে লজ্জিত এবং বিপন্ন বোধ কর্‌তে লাগলেন।

আসল কথা, গিন্নী সেদিন তাঁর শোবার ঘরেই চুপ করে বসে-ছিলেন। আজ ক'দিন ধরে' চোখের জল পড়ে পড়ে তাঁর চোখদুটো শুক্‌নো কাগজের মত কড়কড়ে হয়ে গিয়েছে—কিন্তু তাহলেও তাঁর মুখখানা বড়ই ভার--হাসির লেশমাত্র নেই। তবু পাছে এক ফোঁটা জল কোন ভুলে, কোন সময় চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়ে তাই তিনি কোন আমোদ প্রমোদে, কোন আদর সম্ভাষণে যোগদান করেন নি—কেন না কর্ত্তার কড়া হুকুম ছিল—"আগে যা করেছ করেছ, আজকের দিনে চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করতে পারবে না।" পাড়ার দু'একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে তাঁকে প্রফুল্ল করে নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। পাড়ার কর্ত্রী বিশ্বেশ্বরী এসে এমন কি তাঁর হাতে ধরে বলেছিলেন "সুবদনীর আবার সীঁথেয় সিঁদুর, হাতে লোহা উঠ্‌বে—আর তুমি মা হয়ে তা দেখবে না"—

জয়ন্তী কিন্তু কেবল এই উত্তর দিয়েছিলেন "তোমরাও ত ওর

মার মত—তোমরা গেলেই হবে—যেদিন ওর সিঁদুর পুঁছে—নোঁয়া ভেঙ্গে—ওকে থান কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলুম আমার চোখে আজও ঠিক্ তেমনি একটা দিন।"

ব্রজেন বাবু গিন্নীকে খুঁজছিলেন মেয়ে কোথায় তাই জানবার জন্যে—কিন্তু তিনি হটাৎ নিজেই সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন! তখন তরুণীরা সকলে মিলে সুবদনীকে সাজাচ্ছিল—

তিনি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়তেই সকলে "ওমা কে ও!" বলে ঘোম্‌টা টেনে এক কোণে সরে দাঁড়াল তারপর চিন্তে পেরে ভাবলে তিনি এখনই চলে যাবেন। কিন্তু ব্রজেন বাবু নিশ্চল দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন যেন সে গ্রীক্-পুরাণের সেই একটা পরী যার দিকে চাইলেই লোকে পাথর হয়ে যেত।

তখন মেয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে, চুল বেঁধে তাকে রাঙ্গা শাড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—কেবল কপালে চন্দনের ফুল কিছু বাকি আছে।"

মেয়ে বাপের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নীচু কল্লে—আর তোলবার শক্তি রইলো না—ব্রজেন বাবু দেখতে পেলেন না—সে চোখে তখন বিদ্যুৎ কি বৃষ্টি—কুয়াসা কি ঝড়।

অন্যান্য রমণীরা পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রজেন বাবুর হটাৎ মনে পড়ে গেল কি জন্যে তিনি এসেছেন—কিন্তু কথা কোথায়! ভাষা কোথায়! তিনি কি সব ভুলে গিয়েছেন? তাঁর মাথায় কি আর মস্তিষ্ক এক বিন্দুও নেই? তাঁর বুকের ভিতর কি আর বায়ু চলাচল করছে না? না তাঁর জিভ্ শুকিয়ে তালুর সঙ্গে এঁটে গিয়েছে? কিন্তু কথা বল্‌ছিল তাঁর চোখ—সেই চোখ বারবার

মনকে জিজ্ঞাসা করছিল—"কেমন, এই ভাল, না সেই ভাল ? কোন্‌টা ভাল দেখাচ্ছে ? কোন্‌টা দেখে তুমি চিরদিন সুখী থাক্‌বে ?"

ব্রজেন বাবু তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন দেখে সুবদনী আস্তে আস্তে ডাকলে—"বাবা"।

ব্রজেন বাবুর মুখের ভিতর থেকে কি যেন একটা মস্ত পাথর সরে গেল – তিনি কাঁপানো গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মা, সব ঠিক্—এইবার, এখনো বল, ফিরব না এগোব—একটু পরে আর হাত থাক্‌বে না।"

মেয়ে সে সময় আর কি বল্‌বে—সে জানে তার মায়ের কি স্নেহ—বাপের কি মঙ্গলকামনা। সে জানে তাঁদের একজনের কি ইচ্ছা—আর একজনের কি সংকল্প। এর মধ্যে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্তাটুকু কোথায় ? তাকে ছিঁড়ে ভাগ করে দিতে পারলে সে হয়ত দুজনকেই সন্তুষ্ট করতে পারত, কিন্তু তা সে পার্‌লে কৈ ? তার নিজের মনকে যাচাই করে, বুদ্ধিকে স্থিরভাবে প্রশ্ন করে—তার স্বাভাবিক সংস্কারের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করিয়ে দেবার সময় পেলে কৈ ? সে কেবল দুই ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজে বিক্ষুব্ধ হয়ে চিন্তিত হয়ে, চূর্ণ হয়ে, মাটির মধ্যে মিশে গিয়েছে—স্বাধীনতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অবসর পায় নি। সে অনেক ভেবে শেষে এই কথাটী বল্লে "বাবা, ভেবনা—ভগবান সকলের মুখরক্ষা কর্‌বেন।"

ব্রজেন বাবু কি বুঝলেন জানি না—দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং একেবারে সম্প্রদাতার আসনের উপর বসে বল্লেন—"কৈ মুখুজ্জে কোথায় ? পাত্রকে এখনো নিয়ে এল না ?"

কিন্তু কোথায় মুখুজ্জে ? নবীন বাঙ্গারও কোন সংবাদ নেই।

এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নেবে এল—বরযাত্রিরা মেরাপের নীচে থেকে একেবারে হুড়্মুড়্ করে বেরিয়ে এবং অনেক জিনিস পত্র লণ্ডভণ্ড করে পূজার দালানে অর্থাৎ সম্প্রদানের স্থানে গিয়ে হাজির হল।

তাদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা বল্লে "কৈ, না—স্বরূপচন্দ্র ত এখনো এসে পৌঁছয় নি—সে নৌকায় চড়্বে দেখে আমরা চলে এলুম।"

"বল কি !" বলে ব্রজেন বাবু লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ব্যস্ত হয়োনা" বলে গাঙ্গুলি তাকে টেনে ধরে বসালেন।

"কিন্তু আর যে লগ্ন নেই" বলে ব্রজেন বাবু গাঙ্গুলির দিকে ঘৃণাপূর্ণ কাতর কটাক্ষে চাইলেন—সে কটাক্ষে সম্মানের চিহ্ন ত ছিলই না বরং বিদ্রোহের ভাব ছিল।

অল্পভাষী, দ্বিধাপূর্ণ ব্রজেন্দ্রের ভিতর যে এতটা শক্তি ও তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল—যাতে সে তাঁর সঙ্গেও কড়া ভাবে কথা বল্‌তে পারে—এটা গাঙ্গুলি আজ নূতন দেখলেন।

তিনি পুর্ব্বের মত একটা যা তা উত্তর দিতে আর সাহস কল্লেন না—"তাহলে যা ভাল হয় তাই কর" বলে দূরে সরে গেলেন।

ঠিক্ সেই সময় সেখানে উপস্থিত হল একটা বিকট বীভৎস মুর্ত্তি—অনেকটা প্রেতের মত; সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা—চক্ষু রক্তবর্ণ—লম্বা চুল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে।

ব্রজেন বাবু তার দিকে চেয়েই বল্লেন—"এ কে ? কে তুমি ?"

সে প্রথমটা চুপ করেই রইল—কোন উত্তর দিতে পাল্লে না—কিন্তু তার চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় পরামাণিকচন্দ্র এসে তার মাথায় টোপর পরিয়ে দিলে এবং ঘটকরাজও ছুটে এসে বল্লেন "তাই ত এমন অবস্থা"। তারপর অন্দরের দিকে মুখ করে উঁচু গলায় বল্লেন "হুলু দাও—শাঁখ বাজাও।"

অমনি হুলুধ্বনি ও শঙ্খ বেজে উঠল। কিন্তু ব্রজেন বাবু আস্তে আস্তে উঠে ঘটককে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এই কি আমাদের জামাই ?"

ঘটক দ্বিধাপুর্ণ ভাবে বল্লেন "তাই বলেই ত মনে হচ্ছে—তবে মুখে টুখে কাদা রয়েছে বলে—"

"কিন্তু আমার ত মনে বল্‌ছে না, এই আমার সুবদনীর বর" বলে' ব্রজেন বাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

"সে সন্দেহ আমারই যখন ভাল করে যায় নি, তখন আপনার ত হতেই পারে—তবে কাদাটাদাগুলো ধুয়ে ফেল্লেই বুঝতে পারবেন" এই বলে ঘটক চাকরদের ডেকে বল্লেন "ওরে জল নিয়ে আয়"—তারপর আগন্তুকের হাত ধরে তাকে বল্লেন "বাবাজি এইদিকে এস—কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি ? তা পথ যে পিছল—"

এইবার আগন্তুকের মুখে কথা ফুট্‌লো। সে সকলের মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "বর এয়েছে ? হাঁ মশায় বর এয়েছে ?"

ঘটক বল্লেন, "সে কি কথা বাবাজি, বর ত তুমিই !" সে জড়িতকণ্ঠে বল্লে, "সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। এখনো কি তবে ডুবে মরে নি ? ঝড়ে নৌকাটা গেল উল্টে, বরের গলার মালাটা গেল ভেসে, আর ঐ আবাগের বেটা বরটাই বাঁচল না কি ?"

ঘটক বরের এই প্রলাপ-উক্তি চাপা দিয়ে বলে উঠলেন—"তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক্, সময় বয়ে যায়।"

পীতাম্বরের মুখ কৌতুকহাস্যে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ব্রজেন এতক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চৌকির উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌লেন, "মরেছে, মরেছে, বর মরেছে—চুকে গেছে!"

ঘটক বল্লেন, "কি বল্‌ছেন ব্রজেন বাবু; আপনার হল কি?" ব্রজেন বল্লেন, "আমার মুখরক্ষা হল, আমার মেয়ের কথাই খাট্‌ল। এই যদি আমার সুবদনীর বর হয় তা হলে বর মরেছে।"

বাড়ীর ভিতর একটা কান্নার রোল উঠে পড়ল। মুখুজ্জে বেগতিক বুঝে কি একটা হাঁড়ি নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং স্মৃতিতীর্থ, তর্কবাগীশের কানে কানে বল্লেন—"ছানার পায়েস জিনিসটা শোনাই গিয়েছিল, দেখা আর হল না"।

পুরোহিত মহাশয় ব্রজেন বাবুর নিকটে এসে বল্লেন "তা হলে আজ আমি আসি—আপনি দুঃখিত হবেন না—সমস্তই দৈবাধীন কার্য্য—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—তবে আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক লোক—আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব—আমার আজ্‌কের পারিশ্রমিকটা—"

ওদিকে গাঙ্গুলি ও ঘটক দু'পাশ থেকে দু'জনে এসে ব্রজেন বাবুর পাশে দাঁড়ালেন।

গাঙ্গুলি তাঁর মুখখানাকে যথাসম্ভব লম্বা ও বিমর্ষ করে বল্লেন—"ভেবে অবিশ্যি কোন ফল নেই ব্রজেন—তবে ঈশ্বর যা করেন তা ভালর জন্যেই—আমার সন্ধানে খুব ভাল একটী পাত্র আছে এবং খুব সম্ভবতঃ সে রাজী হবে—আমি কালই গিয়ে—"

ব্রজেন বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, সে পরে হবে'।

"না—না—সে পরে কেন—আমি কালই গিয়ে প্রস্তাব তুল্‌ব—তুমি কোন দুঃখ করোনা—এ পাত্রের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ—তার কোন রকম নেশা কি বদ্‌খেয়াল নেই"।

"তা হলে এর ছিল" ? বলে ব্রজেন বাবু এমন একটা ছোট হাসি হাস্‌লেন যা শুন্‌তে খুব বিকট এবং দেখ্‌তে অনেকটা মেঘলা দিনের রোদের মত।

ঘটক তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—"না, না সে রকম কিছু নয়—তবে একটু আধটু—আচ্ছা তা গাঙ্গুলি যার কথা বল্লেন তাকেই না হয় কাল গিয়ে দেখে আসা যাবে—ভালর চেয়েও ত ভাল থেকে থাকে"।

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে চেয়ে আর একবার হেসে বল্লেন—"বটে ! তা হলে ঈশ্বর না করুন এ পাত্রের ও যদি কিছু হয় তা হলে এর চেয়েও একটা ভাল পাওয়া যাবে ?"

ব্রজেন বাবুর কথার ভাবে গাঙ্গুলি ঘটক সকলেই চুপ কর্‌লেন। বরযাত্রেরা এক এক করে সরে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌তে লাগল।

ওদিকে এক এক করে কে যেন সব আলো নিবিয়ে দিয়েছে—আর সানাইয়ের সুরও কোন্‌ সময় বন্ধ হয়ে গেছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত বাড়ী নীরব নিঝুম হয়ে পড়্‌লো।

ব্রজেন বাবু অনেক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে হটাৎ বলে উঠ্‌লেন—"ওরে কে আছিস্‌ সব আলো জ্বেলে দে—আর সানাই-ওয়ালাদের বল্‌ খুব কসে' বাজাতে"।

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"সে কি !—"

ব্রজেন বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বরযাত্র, পুরোহিত এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের দিকে চেয়ে বল্লেন "আপনারা কেউ যাবেন না—খেতে বসুন —আমি নিজে পরিবেশন কচ্ছি।"

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন,—"সে কি ব্রজেন বাবু, লগ্ন ত আজ গেছে।"

ব্রজেন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "গেছে, গেছে, চিরদিনের মত গেছে, আর ভাবনা নেই।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য

——:০:——

তত্ত্ববিদ্‌গণ সংস্কৃতকে দেবভাষা বলিয়া থাকেন। স্বর্গরাজ্যের নথিপত্র এই ভাষায় রাখা হইত কিনা বলিতে পারি না, তবে ভারতের ভূদেবেরা যে ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রায়টুকু বলিলাম, কেননা ইহার পূর্ণ দেবত্বের দাবিদারগণ বাদান্তরও পোষণ করিতে পারেন। স্রষ্টার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তিতে যাঁহারা সম্যক বিশ্বাসবান্, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাঁহাদের নিকট অতি দুর্ব্বোধ্য সুতরাং অকিঞ্চিৎকর, বিচার তর্ক সমাকুল রূপক অপেক্ষা আস্ত রূপেরই যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা যে এই ভাষার সৃষ্টিমূলে একটা অলৌকিকত্ব আরোপ না করিয়া ছাড়িবেন এরূপ আশা করাই অসঙ্গত।

(২)

না ছাড়ুন, কিন্তু বর্ত্তমানে দ্যুলোক ও ভূলোকের সম্বন্ধটা পূর্ব্বাপেক্ষা যেন বেশী তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। কলির দুর্দ্দান্ত বিজ্ঞানাসুর উভয় রাজ্যের সংযোজক বার্ত্তাবহের তার কাটিয়াছে, লৌহবর্ত্ম ভাঙ্গিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতুসকল ডিনেমাইটে উড়াইয়াছে।

ভাগীরথীর মত এই দেবভাষার ধারাটাও কি অমরা হইতেই নামিয়া আসিয়াছে? শাস্ত্রজ্ঞেরা বোধ হয় এরূপই একটা সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে আবার অন্য রকম ব্যাখ্যা ঝাড়িবেন। তিনি বলিবেন স্বর্গ হইতে তোমার দেবভাষার অবতরণটা আকাশ থেকে ঝুপ করিয়া তোমার ভাগীরথী পড়ার মতই সত্য! আমরা সংস্কৃতকে কেন দেবভাষা বলি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে কোমর বাঁধিয়া বসি নাই। এই দৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে যতটুকু বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। নিজ জন্মভূমির উপর সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই এই প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য। লাটিন, গ্রীক, মৈসরিক, চৈনিক প্রভৃতি সকল পুরা সাহিত্যেরই নিজ নিজ দেশের উপর বর্ত্তমানেও কিছু না কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সংস্কৃতের যতটা, বোধ হয় এই ধরাধামে ততটা কাহারই নাই।

(৩)

সম্পূর্ণ ভাষাটার কথা দূরে থাকুক, ইহার একটা বিন্দুর মধ্যে যে প্রতাপ নিহিত আছে, তাহার কাছে বুঝি প্রলয়ঙ্করী তড়িতশক্তিও হার মানে। বাস্তবিক বিসর্গের বিন্দুদুটীর মধ্যে যে সপ্তসিন্ধুর বল লুক্কায়িত! বিচার বল, তর্ক বল, জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, কত সময়ে সবই যে ঐ ক্ষুদ্র বিন্দুনিঃসৃত শক্তির প্রবাহে কোথায় একেবারে ভাসিয়া যায়। কত ঐরাবতি পাণ্ডিত্য, কত অভ্রভেদী মহত্ত্ব, কত পগম্বরের সদুক্তি, কত চার্ব্বাকের বদ্‌উক্তি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের চরণমূলে লুটাপুটি খাইয়াছে! ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলুন এমন যাদুশক্তি কি তিনি আর কোন ভাষায় দেখিয়াছেন? তাঁহার লাটিন, গ্রীক,

হিব্রুতে ঐ অনুস্বর বিসর্গের খোঁচার মত এমনটি কি কিছু আছে? যাহা এত ছোট, অনেক সময় দেখিতে গেলে অনুবীক্ষণ লাগাইতে হয়, অথচ যাহার তাড়নে হিমগিরি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, যাহাকে লিখিতে কিছুমাত্র আয়াস নাই—কলমের এক আঁচড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইয়া পড়ে অথচ যাহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হাজার হাজার পণ্ডিতের মাথা ঘুলাইয়া দিয়া আসিয়াছে—জানি না ইহার তুলনা কোথাও আছে কিনা!

(৪)

ভাল, এই প্রভাবটার কি কিছু মূল নাই? ইহা কি নিতান্ত অহেতুক, না কেবলমাত্র অতীতের প্রতি অন্ধভক্তি-জনিত? অতীত ত সকল জাতিরই আছে। এবং অতীতের প্রতি ভক্তির নিদর্শন অল্পাধিক সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তবে ভারতে ইহার এতটা আতিশয্য হইয়া পড়িল কেন? অনেকে বলিবেন, ভারতে চিরদিন ইহার আতিশয্য ছিল না। ভারতের যখন জীবন ছিল, তখন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইত। ধর্ম্ম তখন কর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিত না। কর্ম্মও ধর্ম্মকে একেবারে টপ্‌কাইয়া উচ্ছৃঙ্খল গতি ধরিত না। ধর্ম্ম, কর্ম্মের রাস টানিয়া থাকিত বটে, কিন্তু তাহাকে চলিতে ফিরিতে দিত—প্রয়োজন হইলে নূতন পথে নূতন ক্ষেত্রে তাহার গতিও ফিরাইত। কিন্তু নির্জ্জীব ভারতে যখন কর্ম্ম অসাড় হইয়া পড়িল, যখন তাহার চেষ্টাশক্তি মুমূর্ষুর অঙ্গস্পন্দনবৎ ক্রমে প্রায় বিলীন হইয়া আসিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিয়া খোঁয়াড়ে পূরিয়া ফেলিল। সেই সময়

হইতে কর্ম্ম কেবল চক্ষুদুটি মুদিয়া মাঝে মাঝে পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যের অল্প অল্প জাবর কাটে, আর কিছু বড় তাহাকে করিতে হয় না।

(৫)

কথাটার ভিতর যে কিছুমাত্র সত্য নাই, তাহা বলিতে পারি না কর্ম্মবৈমুখ্যই যে কতকাংশে বিধিব্যবস্থাগত ধর্ম্মের প্রাধান্য বাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা না মানিবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই অবশ্য বিধিব্যবস্থার বন্ধন। সেই কর্ম্ম যদি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—শুধু খাওয়া, পরা, শোয়া, বসার মধ্যেই জীবনটা কোন রকমে একটু নড়িতে চড়িতে থাকে, তবে বিধিব্যবস্থার বন্ধন এই একঘেয়ে কর্ম্মের চারিদিকে দিন দিন খাঁজে খাঁজে কাটিয়া বসিবেই ত! কিন্তু যদি ভাগীরথীকে হিমাচলের শীর্ষ হইতে টানিয়া আনিতে হয়, যদি মৈনাকের দণ্ডে মহাসমুদ্র মন্থন করিতে হয়, যদি সেতুবন্ধন ও খাণ্ডবদাহনে সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে হয়—স্থূল কথায় যখন জীবনটা প্রজ্জ্বলিত উল্কার মত বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, তখন কি আর বিধি ব্যবস্থা একই অক্ষরে, একই মাত্রায় চিরদিনেরতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? তখন যে তাহাকে নিত্য নূতন কর্ম্মচক্রের মাঝে বিবর্ত্তিত হইতে হয়—একই স্থানে শ্মশানের বৃষকাষ্ঠের মত খাড়া হইয়া থাকিবার তাহার অবসর কোথায়?

সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা যে এতটা প্রভাবের হেতু ইহা স্বীকার করিতে কোন দোষ দেখি না। তবে হেতু হইলেও ইহাই একমাত্র হেতু নয়। হেতু আরো আছে। আমাদের মনে হয়, এই

সম্পর্কে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের রীতিটা বিশেষ লক্ষ্যনীয়। সকল দেশেই যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কতকটা শাস্ত্রের আকার ধারণ করে। প্রাচীন আচার, ব্যবহার, প্রথাবিশেষ কোন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুমোদিত হউক আর না হউক, কালক্রমে শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই নিয়মে পুরাতন সাহিত্যও শাস্ত্রের সম্মান দাবী করে। কিন্তু এই দাবীটা ভারতে যতটা উপ্‌চাইয়া গিয়াছে, এমনটি কোনখানে হয় নাই। ভারতে যেন সংস্কৃত গ্রন্থমাত্রই শাস্ত্র অর্থাৎ ভারতবাসীর কর্ম্মনিয়ামক শাসনদণ্ড। বেদ বেদান্তের কথা মাথায় থাক, তাহা ত ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি, কিন্তু তাহা ছাড়া ছোট বড় যাহা কিছু সংস্কৃতের অন্তর্গত, কোনটাই বা ফেলা যায়। কাব্য, পুরাণ, নাটক, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ, উদ্ভট কোনটাই বা কম। বিচার বিতর্কে যেখান হইতে ইচ্ছা একটা শ্লোক আওড়াও—তা বিষ্ণু-পুরাণই হউক, আর গীতগোবিন্দই হউক, রঘুবংশই হউক আর পঞ্চ তন্ত্রই হউক, চানক্যই হউক আর চম্পূই হউক—সকল সময়ে এতটা উচ্চাঙ্গেরও প্রয়োজন নাই, যেন তেন প্রকারে দুটা বিসর্গওয়ালা অক্ষর থাকিলেই যথেষ্ট—আর তোমায় হারায় কে!

(৬)

সংস্কৃত-সাহিত্য শাস্ত্রবহুল তাহার উপর অধিকাংশই শ্লোক নিবদ্ধ কাজেই ইহার প্রভাবও তদনুযায়ী। ইহার যে দুই একটা অঙ্গ শাস্ত্র শ্রেণীর বহির্ভূত ছিল, কালক্রমে চারিদিক হইতে শাস্ত্রের বাতাস লাগিয়া তাহাও শাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এই শ্লোকনিবদ্ধতাও ইহার প্রভাব ব্যাপ্তির কম অনুকূল নহে। সাদাসিধে গদ্যের কথায় ততটা

জোর দাঁড়ায় না। কিন্তু সেই একই কথা যদি শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তবে তাহার শক্তি যেন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। গদ্য শুধু কথা মাত্র, পদ্যে কথা ত থাকেই, তাহার উপর কিছু না কিছু সুর ও লয় আসিয়া যোগ দেয়। তাই কাটাখোট্টা গদ্য অপেক্ষা সুরলয় সমন্বিত পদ্যের প্রভাব অধিকতর তীব্র। শুধু তীব্র কেন, অধিকতর স্থায়ীও বটে। সাদা কথা যেন স্মৃতির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে সুরলয় সংযুক্ত হইলে, তাহা সুরলয়ের সংঘাতে স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে। সম্ভবত সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লোকনিবদ্ধ শাস্ত্র বচনের বাহুল্যে ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে এতটা তীব্র ও স্থায়ী রূপে গাঁথিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৭)

কিন্তু এখনও মূল কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মূল বলিতেছি কেন না এই কারণ না থাকিলে কালে অন্য কারণগুলা নিশ্চিতই হীন-বল হইয়া পড়িত। দেবত্বের দাবী, অতীতের প্রতি ভক্তি, ও কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা, শাস্ত্ররীতির বাহুল্য ও সুস্বর-শ্লোক-নিবদ্ধতা—এই সকল সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাবকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সাহিত্যের ভিত্তি বিশাল প্রস্তরস্তম্ভের উপর না থাকিয়া যদি ধূলি রাশির উপর স্থাপিত হইত, তবে ঐ পাশের খুঁটিগুলা হাজার শক্ত হউক ইহাকে কখনই এতটা সমুন্নত রাখিতে সমর্থ হইত না। জানি, কালের করাল আঘাতে সেই প্রস্তর অনেক স্থানে ফাটিয়াছে, অনেক কাদা মাটি তাহাতে মিশিয়াছে এবং ফাটলে ফাটলে বহু আগাছা শিকড় চালাইয়া তাহাকে জখম করিয়াছে, তাহা হইলেও তাহার প্রস্তরত্ব

কখনই নষ্ট হইবার নহে। কঠোর সাধনা লব্ধ, মহা কল্যাণকর সত্য সমূহই এই পাষাণভিত্তি। এই সত্য সমূহ এই বিপুল সাহিত্যের নানা বিভাগে নানা আকারে অভিব্যক্ত, কোথাও দর্শনের যুক্তি ও তর্কে, কোথাও স্মৃতির বিধি ও নিষেধে, কোথাও কাব্যের অতুলনীয় আদর্শ বৈচিত্র্যে। কিন্তু এই বিশ্ব-জনীন্ সত্য যে কোথাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংস্পর্শে মলিনীকৃত হয় নাই, এ কথা অতি বড় ভূতভক্তও বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন কি না সন্দেহ।

(৮)

যিনি পারেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিতণ্ডা করিবার এখন প্রয়োজন নাই। এই সংস্কৃতের প্রভাবকে এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছে এখন আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব। সংস্কৃতের প্রভাব কি সংস্কৃতই চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, না অন্য কাহারও ইহাতে হাত আছে? সংস্কৃত যখন জীবন্ত ভাষা ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে যখন এই ভাষার সাহায্যেই ভাবের আদান প্রদান চলিত, তখনকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ইহার তখনকার মূর্ত্তিও অবশ্যই বর্ত্তমান মূর্ত্তি হইতে অনেকাংশে ভিন্নতর ছিল। ব্যাকরণের নিয়ম নিগড়ে তখন ইহা এতটা আবদ্ধ হয় নাই এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেই ইহা পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে এক নিয়মানুগত্য যত প্রবল হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রও যত বাড়িতে লাগিল, নানা মিশ্রণে বর্দ্ধিত জনসাধারণের পক্ষে ইহাকে সম্যকরূপে অবলম্বন করিয়া থাকাও তত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

(৯)

কাজেই ইহার উপর নিয়মভঙ্গের মুদ্গরাঘাত পড়িতে লাগিল। প্রকৃতি প্রত্যয় কৃদন্ত তদ্ধিত সেই আঘাতে ভোঁতা বোঁচা ও চেপ্টা হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নানা নূতন আকার ধরিয়া বসিল। জনসাধারণ নিজের সুযোগ ও সুবিধার হাপরে ক্রমে একটা নূতন ভাষা গড়িয়া তুলিল। পণ্ডিতেরা এই নূতন ভাষার দাবী ক্রমে মানিয়া লইলেন। প্রাকৃত জনের সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম রাখিলেন প্রাকৃত। সংস্কৃত সাহিত্য কেবল পণ্ডিতমহলেই আবদ্ধ ছিল, ক্রমে এই প্রাকৃতের ভিতর দিয়া জনসাধারণের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। সমাজে যাঁহারা জ্ঞান-বিদ্যায় মানমর্য্যাদায় বড়, তাঁহারাই সংস্কৃতের চলন রাখিলেন, আপামর জনসাধারণ প্রাকৃতকেই আশ্রয় করিল। রাজার দরবারে, পণ্ডিতের কারবারে সংস্কৃতের আদর রহিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের হাটে মাঠে ঘাটে প্রাকৃতই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। যে উচ্চমত ও আদর্শ এত-দিন সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ক্রমে অন্ততঃ কতকাংশে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল; তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে খোদ সংস্কৃত ছাড়া প্রাকৃতের কার্য্য বড় কম গণ্য নয়।

(১০)

কিন্তু প্রাকৃতের এই প্রাদুর্ভাবও চিরকাল রহিল না। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিসর দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। ক্রমে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। এত বিস্তৃত ভূভাগে, এত বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত রাখা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালক্রমে প্রাকৃতকে

শাণে চড়িতে হইল। আবার সে শাণও এক প্রকারের নহে, নানা দেশের উপযোগী নানা আকারের। প্রাকৃত এই নানা দেশের নানা আকারের শাণে চড়িয়া ক্রমে মাজিয়া ঘসিয়া নানা রূপে দেখা দিল। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাটী, গুজরাটী, উড়িয়া কত রূপই না তাহাকে ধরিতে হইল। আমরা বাঙ্গালা সাহিতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, প্রাকৃত এই বাঙ্গালা রূপে দেখা দিয়া এখানে কি কার্য্য করিয়াছে, ইহাই এখন দেখিব।

(১১)

বাঙ্গালা দেশ প্রাকৃতকে নিজের শাণে চড়াইয়া অন্য দেশের অপেক্ষা কম ঘসা-মাজা করে নাই। সম্ভবতঃ বেশীই করিয়া থাকিবে। কারণ বাঙ্গালা দেশের প্রাণ বুঝি অন্যদেশের অপেক্ষা অধিকতর কোমল হইয়া পড়িয়াছিল। কঠোর শব্দটুকু বাহির করিবার জন্য যে শক্তিটুকুর প্রয়োজন তাহার প্রকাশে এই দেশটা বুঝি একেবারে অশক্ত না হউক, নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তৎসহ বৈষ্ণব সাহিত্য সোণায় সোহাগা হইয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তনের অবিরত মর্দ্দনে বাঙ্গালা দেশের ভাষাটা একেবারে যেন কাঠিন্য-মাত্র বর্জ্জিত কোমল মালপোয়া হইয়া গেল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে বঙ্গ-সাহিত্য এই কোমলতার কিয়দংশ পরিহার করিয়া নানা দিকের ওজস্বী শব্দসংযোগে কিছু কাঠিন্য লাভে সমর্থ হইয়াছে।

(১২)

প্রাকৃত্যের অপত্যবৃন্দ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেই প্রাকৃতের কাজে তাহারা বাহাল হইল। প্রাকৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

প্রাচীন নাটকাদির অঙ্ক মধ্যে চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিলেন। প্রাকৃত একা এত কাজ সামলাইতে পারিতে ছিল না, এক্ষণে তাহার দুহিতারা সেই কাজ সকলে মিলিয়া বণ্টন করিয়া লওয়া তাহা অবশ্য ভালরূপেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালা বাঙ্গালা-দেশের কাজের ভার লইয়া কি করিল? অবশ্য এলোমেলো গৃহস্থালি গুছাইতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল। তারপর সম্ভবতঃ কিছু কিছু সামাজিক ও সরকারি কাজে হাত দিতে তাহার সামর্থ্য জন্মিল। এই-রূপে কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বাড়িয়া চলিল। কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে কর্ম্মপটুত্ব ও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে যখন ইহা বৈষ্ণব যুগে আসিয়া সমুপস্থিত, তখন দেখি ইহার একাঙ্গে প্রায় পূর্ণ বিকাশের অবস্থা। তখন দেখি ইহা অন্যান্য ছোট বড় কাজে সম্পূর্ণ যোগ্য ত বটেই, তাহা ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ। ক্রমে এই বিশেষ যুগে ইহা এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে তাহার দ্বারা বৈষ্ণব কবিগণ যে অতুলনীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এই উন্মেষ ও পরিপুষ্টি কিছু একপেশে রকমের। সম্ভবতঃ মাতামহী সংস্কৃতের দেখা-দেখি বাঙ্গালা ভাষাও পদ্যের বেশী পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাই বৈষ্ণবের গীতিকবিতাতে পদ্যের বিকসিত মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। গদ্য অবশ্য তখনও ছিল—বেচা-কেনা হিসাব-নিকাশ ও গৃহস্থালি কখন চরণে চরণে মিলাইয়া চলিতে পারে না—কিন্তু তাহা সাহিত্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। সে যোগ্যতা লাভের জন্য গদ্যকে আরো কত শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এক বিভিন্ন প্রকৃতির বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে না আসিলে আরো কত দিন

অপেক্ষা করিতে হইত তাহা কে জানে। থাক, সে কথা এখনকার নয়।

(১৩)

এক্ষণে এই বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে ও কতটা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে কতকটা বিস্তৃত করিয়াছিল, ইহা মানিতে হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাকৃতের দুহিতাদিগের কার্য্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু প্রাকৃত—অবশ্য বৌদ্ধ প্রাকৃতের কথা স্বতন্ত্র—একটা বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি বড় করে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য এই প্রাকৃতকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতের দুহিতাদিগের বেলা সে নিয়ম খাটে নাই। নিশ্চয়ই দূরসম্পর্কবশতঃ উভয় পক্ষের সাদৃশ্যগত যোগও ততটা থাকিতে পারে না। জননীর সহিত দুহিতার যতটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, মাতামহীর সহিত দৌহিত্রীর ততটা সাদৃশ্য না থাকিবারই কথা। যাহাই হউক, ইহা দেহিত্রীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। মহাসম্পদশালী সংস্কৃত সাহিত্যের সাহচর্য্য অবশ্যই গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু সতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব কম গৌরব-জনক নহে। অন্যের কথা ছাড়িয়া বাঙ্গালার কথাই বলি। যদি প্রাকৃতের মত আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সহিত জড়িত থাকিত, তবে ইহার এতটা উন্মেষ ও উন্নতি কি কোন কালে ঘটিয়া উঠিত? ইহার স্বাতন্ত্র্যই ইহাকে এমন শক্তি দিয়াছে, যাহাতে এই সাহিত্য এক দিন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বাজায় রাখিতে সমর্থ। কেন? কারণ প্রাকৃত সংস্কৃতের অঙ্গমাত্র,

বাঙ্গালা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষা। বাঙ্গালার অনুবাদ-সাহিত্যের সাহায্যে সংস্কৃতের প্রভাব যতটা বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইতে পারে প্রাকৃতের দ্বারা ততটা হইতে পারে না। পুচ্ছগ্রাহিতা ও স্বাতন্ত্র্যের এই প্রভেদ। আধুনিক অনুবাদ-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি—তাহা ত আগম নিগম দর্শন পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গই সাধারণের মধ্যে প্রচারে উন্মুখ—প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যও এই হিসাবে বড় কম কাজ করে নাই। আগম, নিগম, দর্শন সাধারণের নিকট প্রচারিত হইলেও সাধারণ তাহা ধরিতে ছুঁইতে পারে না, পুরাণের মনোমহিণী আখ্যানমালাই তাহাদের সমধিক চিত্তাকর্ষক। তাই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কাশীরাম ও কৃত্তিবাস যাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্যে অতুলনীয়। বেদ বেদান্ত পণ্ডিতদিগের জন্য, পুরাণসমূহ বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় লোকশিক্ষার প্রধানতম সাধন। এই রামায়ণ ও মহাভারতকে যাঁহারা জনসাধারণের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য।

(১৪)

পুরাতন অনুবাদ-সাহিত্য আরো অনেক থাকিতে পারে কিন্তু তাহার অধিকাংশই শুধু প্রত্নতত্ত্বের কুক্ষিগত হইয়াই এখন বর্ত্তমান। সে সকলের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে নিস্প্রয়োজন, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসই এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার জিনিস। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পুরাণাখ্যান অনুবাদ-সাহিত্য বলিয়া আখ্যাত বটে কিন্তু তাহা যথার্থ অনুবাদ নহে। কালীসিংহের ও বর্দ্ধমান রাজবাটির মহাভারত যে হিসাবে অনুবাদ, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস সেরূপ কিছু নহে। আক্ষরিক সাদৃশ্য

দূরে থাকুক, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধেই মূলের সহিত ইহাঁদের পার্থক্য আছে। ইহাঁরা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত খুলিয়া আভিধানিক আলঙ্কারিক বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নির্ণয়পূর্ব্বক একটী খসড়া করিতে বসেন নাই। তাঁহারা হাতের কাছে অতি সহজে যে উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে নিজেদের এই অপূর্ব্ব কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(১৫)

এখন যেমন অসংখ্য গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকশিক্ষার কাজ করিতেছে, পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। তবে লোকশিক্ষা চলিত কি প্রকারে? এখন আক্ষরিক জ্ঞানও বিদ্যালয়সমূহের সহায়তায় চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছে কিন্তু পূর্ব্বে এই জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিরক্ষরের শিক্ষা হইত কি উপায়ে? ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর লোকশিক্ষক ছিলেন এখনও আছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অবশ্যই তাঁহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় ইহাঁদের নাম কথক। এই কথকেরাই অন্ততঃ কতকাংশে তখন মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিতেন। তাঁহারা বেদ বা উপনিষদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। ততটা পাণ্ডিত্যেরও তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা বুধমণ্ডলীর জন্যও দেখা দেন নাই। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার কিয়দংশ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই ছিল ইহাঁদের প্রধানতম কার্য্য। সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত দার্শনিক আলোচনার দরকার হয় নাই। সাধারণের সম্মুখে দর্শন চিরকালই অদর্শন। এস্থলে লোকবিমোহন

উপাখ্যানমালা অবলম্বন করাই শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। কথকশ্রেণীর মধ্যে এই নিদর্শনের অভাব লক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা দর্শন ছাড়িয়া পুরাণকেই বেশী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

(১৬)

এই পুরাণে অবশ্যই অনেক আজগুবি গল্প আছে, অনেক অসম্ভব অনুষ্ঠান আছে, অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ আছে। কথকেরা সেই অপ্রাকৃত ও অসম্ভবকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। বরং মূলে যাহা সম্ভবপর ছিল, তাহাকে অসম্ভবই করিয়াছেন, যাহা অসম্ভব ছিল তাহা আরো বহু পরিমাণে অদ্ভুত করিতে ছাড়েন নাই। এবং যাহাকে কোন রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করা যাইত, তাহার উপর গাঢ় রংয়ের পোঁচ লাগাইয়া প্রকৃতির নখাগ্রের সামান্য দাগটুকু পর্য্যন্ত শেষ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস ও বাল্মীকির কাছে পঞ্চভূত নিশ্চয়ই এতটা লাঞ্ছিত হয় নাই।

পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি ছাড়া এই কথকদিগের নিকট আখ্যানান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতিও অনেক লাঞ্ছিত হইয়াছে। শুধু প্রকৃতি কেন সেই ব্যক্তিবর্গের আকৃতিও যে কিছু বিড়ম্বনা সহিয়াছে একথাও বলা চলে। তাঁহারা যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেখানেই কাহারও পুচ্ছ, কাহারও কর্ণ, কাহারও নাসিকা টানিয়া যতদূর পারেন লম্বা করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা আকৃতিসম্বন্ধে তাঁহারা বাড়ানর দিকেই গিয়াছেন, কমানর দিকে একেবারেই যান নাই। কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধে ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। মূলে যিনি যতটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অনুবাদে তাহাদের মধ্যে অনেককেই কিছু খাটো হইতে

হইয়াছে। বীরের বীরত্ব, মহতের মহত্ত্ব এমন কি ধীরের ধীরত্বও মূলের অনুসারে যথাযথ অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু ইহাঁদের নিকট সেরূপ আশা করাই অন্যায়। ব্যাস ও বাল্মীকির দ্বারা ইহাঁরা ঠিক অনুপ্রাণিত নহেন। ব্যাস ও বাল্মীকির প্রতিভাই বা ইহাঁরা কোথায় পাইবেন?

(১৭)

আমরা কথকদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসে তাহা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। কারণ ইহাঁরা কথককবি। পূর্ব্বগামী কথকদিগের অনুসরণেই ইহাঁদের কাব্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে অসম্ভব, অপ্রাকৃত, আজগুবি বহুল পরিমাণেই দেখা যাইবে ঘটনাপুঞ্জের সামঞ্জস্যের অভাবও অনেক লক্ষিত হইবে, অনেক স্থলে খুব মহৎকেও অপেক্ষাকৃত হীন দেখাইবে। কিন্তু সমগ্র কাব্য জনসাধারণের শিক্ষাকল্পে যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনায় এইসকল দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। প্রাচীনকালের বিশিষ্ট উচ্চ বংশের বৃত্তান্ত কতক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণের ইতিহাস বড় কিছু নাই। পৌরাণিক যুগে এই জনসাধারণের শিক্ষা কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পাদিত হইত, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কথকতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষার একটা যে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এটা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ এই কথকতার উপর প্রতিষ্ঠিত কাশীরামী-মহাভারত ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণের কার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অনুবাদ-সাহিত্য সাধারণের উপর মূল সাহিত্যের প্রভাব কতদূর

জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুধু সংস্কৃতের গণ্ডী কতটুকু—সংস্কৃত শিক্ষা ত মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ। অবশিষ্টের উপায় কি? মূল অপেক্ষা অনুবাদ-সাহিত্যই ইহাদের সাক্ষাৎ শিক্ষক, গুরু ও উপদেষ্টা। এই সাহিত্যই মহান্ চরিত্রের চিত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া মানুষের মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে স্বার্থ ও পরার্থ, সংযম ও স্বেচ্ছাচার, ভোগ ও ত্যাগের তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগের চিত্তে উচ্চ বৃত্তি-নিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। সংসার, সমাজ ও সাম্রাজ্যগত কর্ত্তব্যসমূহের আদর্শালোক এই অনুবাদ-সাহিত্যের উপগ্রহ হইতেই জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। মূল গ্রহের সহিত ইহাদের পরিচয় খুবই কম। ব্যাস ও বাল্মীকির কাব্য সাধারণের নিকট কতকটা যেন বিষ্ণুপদ বা গোমুখীধারা, এতটা উচ্চে তাহারা উঠিতে অক্ষম—তাহারা কাশীরাম বা কৃত্তিবাসী অনুবাদ-সাহিত্যের ভাগী-রথীতে অবগাহন করিয়াই কৃতার্থ।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

পয়লা নম্বর।

আমি তামাকটা পর্য্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্য্যন্ত শুকিয়ে মরে গেচে। সে আমার বই পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই :—

যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ.

যাদের বেড়াবার সখ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়-শ্বশুর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্ব্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহঙ্কার এই যে সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্য্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্চে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে" আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আল্‌মারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েচি। তখন

আমার চক্ষুর জিভে জল এসেচে। এই বল্লেই যথেষ্ট হবে ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব রকম বেশী পড়েচি যে, পাস্ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল্-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায়, বিদ্যার তোলা জলে, আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বিএ, এম্এ, এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক্ আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মত, আঠারো উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা, বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহুকষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল রাস্কিনে এসে কাৎ হয়ে পড়েচে। মাষ্টার মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরয় না।

কিন্তু আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মত করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্চি সেদেশে সাহিত্যটা ত স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চল্ছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেচি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী জর্ম্মাণ ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে সুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে একস্‌প্রেস্ গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেচে, আমি তারই টিকিট কিনেচি। তাই আমি হাক্সলি ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই

নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাইনে, এমন কি, ইবসেন মেটারলিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখচি বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু'চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারদিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এত কাঁচা অন্যদিকে এত পুরণো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্চে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারো সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্রচিহ্নিত একখানা নূতন প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায় তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সদ্য কলেজের নোট নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো

তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেচি সাহিত্য চর্চ্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল বড় বড় কুলাল চক্র ঘুরচে, যাতে মানব সভ্যতা কতক বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠচে, কতক বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়চে তার কাছে ঘর-করনার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে?

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েচি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়ামাত্র—তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বল্লে আমার স্ত্রীর ভ্রূ-চাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তাল-কানা, এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থসামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্চে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মত এই আমার সখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার

করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্চে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়াম-প্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম তাহলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্‌ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈত দলটি জমে নি—তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেচেন। যদিচ তিনি পরতেন মিল্‌-এর সাড়ি, এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে-আলাপ শুনতেন—সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল—তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দল বৃদ্ধির পর হ'তে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কি তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোট ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হয়েছিল তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি

অনিলার হাত ধরে বল্লেন, "মা, আমি ত যাচ্চি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কি ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বল্লেন, এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারো উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কি করে হল তা ত বল্‌তে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তাহলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম ও বুঝি সাহস করচে না। শেষে একদিন কথায়

কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কি করচ ?" অনিলা বল্লে, "মাষ্টার রেখেচি, ইস্কুলেও যাচ্চে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করিনি সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেচি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়ত মনে করেচে সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেচে। রাগ করে মনে মনে বল্লুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড় বড় জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গসঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করচি তখন মনে করেছিলুম অনিলার জীবন-যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই যে-সৃষ্টিকর্ত্তা আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্ম্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটভাই,

একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠচে। সেই চল্‌তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকরনার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন চল্‌তে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে? অন্তত আমি ত কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগ পর্ব্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব্ব। আজ বেশ বুঝতে পারচি পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কি রকম চল্‌চে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তারপরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেচে, দুটি একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে

থাকে, বাকি সময়টা এত বড় বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন—মনে কর তাঁর নাম রাজা সিতাংশু মৌলি—এবং ধরে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তম পুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড় একটা আবির্ভাব আমি হয়ত জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্চে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্ম্মটি খুব মজবুৎ ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়মানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশী, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত দু পা এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেচে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্চে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম সিতাংশু মৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ মুণ্ড বিশ হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মত আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পথ-চল্‌তি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনাসম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্চেন, পাশে তাঁর কোচমান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেচেন। আমি কোনোমতে সেই সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্ববর্ত্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি। পদাতিকের দুটিমাত্র পা, সে হচ্চে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথী সবাইকেই যথা সময়ে ভুলে যেতুম। কারণ এই পরমাশ্চর্য্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোল-

মাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশী জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্ব্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোর বেলায় সেই আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বর সংযম কিম্বা মিত-ভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্চে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়ত ঘুমের ব্যাঘাত হত না কিন্তু তার প্রতিবেশির কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্চে পরিমাণ-সুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দন-শোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেচে। তাকে যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি; আমি বসে বসে জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম এমন

সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশির একটা স্মারক-লিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ির চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী করে আছেন; আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। এ'কে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত করতে পারিনে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌চে। খবর পেলুম প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম কেবল যে আমার শাসি ভাঙচে, আমার শান্তি ভাঙচে তা নয়, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠ্‌চে, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দ্দার কানাই লালের মনটাও দেখচি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌চে। বুঝলুম এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল ওর

মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বল্‌তুম সাজ সজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙীন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বল্লে, "মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি এ পাস করেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বিএ পাস করা, এ জন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারলুম না।

পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি,—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালবাসে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম আমার দ্বৈত দলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা নম্বরে চেলো বেজে উঠ্‌লেই যারা গাণিতিক ন্যায় শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেল্‌চে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বল্‌লে, পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই ত ভাল হয়।

বড় খুসি হলুম। আমার দলের লোকদের বল্লুম, "দেখেচ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না কিন্তু যে সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বল্লে "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোর মাহাত্ম্য, পতি দেবতা পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বল্লুম, "না হে, এই দেখ না আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁক জমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেচি কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু'তিনবার বাড়ী বদলের কথা বল্লে। আমার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মত অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেল বেলায় দেখা গেল কানাই-লাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেল্‌চে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল যতী আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিশে একজন বক্স হার্ম্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে' খুব প্রতিপত্তি লাভ করেচে। এদের আমি পাঁচ ছ' বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষতঃ আমি জানতুম অরুণের প্রধান সখের বিষয় হচ্চে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি করে বুঝব?

সত্য কথা বলি আমি এই পয়লা নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড় বড় সমস্যার

সামাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেচি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি ত লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরত—কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা আমি যদি এই রকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম! পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝিনে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেচি সিতাংশু এস্‌রাজ বাজাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্য্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মত ওকে ভালবাসে—সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েচে। জিনিস-পত্র বাড়ি ঘর জন্তু মানুষ সকলের পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্ব্বচনীয়, আমি এ'কে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনিই এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেই খানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস খেলতে কন্সার্ট বাজাতে লাগল তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে মনের মত অন্য বাসা বরানগর কাশিপুরের

কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বল্‌তে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্না ঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বল্লুম, "পশুর্হ নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বল্লেন "আর দিন পনেরো সবুর কর।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

অনিলা বল্লেন "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আ'ছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভাল লাগচে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছু দিন বাড়ি বদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরবে সুতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে ত?" সে কোন জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে আছে।

আমি বল্লুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভাল লাগে, সেটা ভুলো না।" এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বল্লুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "সে কি কথা? আজ আমাদের সভা হবে না কি?"

আমি বল্লুম, "হবে বৈ কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাটনি পর্য্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বল্লে, "অদ্বৈত বাবু, আমি বলি আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জান্‌তে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেচে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায়চাদর বেঁধে মরেচে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুন্‌লে?"

সে বল্লে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে!—বিবরণটা এই:—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু এবারে গিয়ে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করেচে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম একরাত্রে তার জীবনটা উলট পালট হয়ে গেচে।

আমি অভিযোগ করে বল্লুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন ?"

সে তার বড় বড় দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বল্‌ত, "তোমাকে বলে লাভ কি ?" তাহলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাক্‌ত না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে কি করে যে ব্যবহার করতে হয় আমি কি তার কিছুই জানি ?

আমি বল্লুম, "অনিল, এ সব রাখ, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বল্লে, "কেন হবে না, খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেচি সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বল্লুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বল্লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড় বড় বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝবার মত শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল্‌ ম্যাগ্নেটীজ্‌ম্‌ বলে একটা জিনিস আছে ত।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈত দলের দুই চার জন কম পড়ে গেল। কানাইত এলই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশু-মৌলি চলে যাচ্চে তাই এরা সেখানে বিদায় ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন কি, আমার মত বেহিসাবী লোকেও এ কথা না মনে করে থাক্‌তে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েচে।

সে দিন খাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না ?" সে বল্লে, "বাসন গুলো তুল্‌তে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চষমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি আমার চষমা চাপা দেওয়া একটুক্‌রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে—"আমি চল্লুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্য্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোচ্ছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমে ছিল তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিস পত্রের ফর্দ্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব

হিসাব। এই সঙ্গে গয়লা বাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোঁকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এই টুকু বুঝতে পারলুম অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখ্‌লুম—আমার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ নিলুম কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘট্‌লে সে সম্বন্ধে কি রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় কোনদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা হা করতে লাগ্‌ল। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানচে। রাজাবাবু ভোর রাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠ্‌ল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টলষ্টয়, টুর্গেনীভ প্রভৃতি বড় বড় গল্প-লিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েচি তখন বড় আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তার তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণ করে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘট্‌তে পারে তা কোনো দিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমি প্রবীন তত্ত্বজ্ঞানীর মত সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হাল্‌কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যে দিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই দিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা কত আয়োজন কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কতদিন কত রাত্রি কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্‌বুদ

ফেটে গিয়েচে। গেছে যাক্‌গে—কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েচে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখি নি?

কিন্তু দেখলুম হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখেচি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মত সমস্ত জিনিস পত্র ঘাঁটতে লাগ্‌লুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুল্‌তেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা নম্বর থেকে এসেচে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড় বেদনা সেই খানেই ভয়ঙ্কর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেচে। সে চিঠিখানা এই:—

“আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেল তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বল্‌তেই হবে।

আমি তোমাকে দেখেচি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্চি কিন্তু দেখবার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে

প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দ্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েচ—আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম—যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েচি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবেনা জানি —কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভাল হবে। আমি কে সে-কথা লেখবার দরকার নেই কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাক্‌বে না।"

এমন পঁচিশ খানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোন নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠ্‌ত;—কিম্বা তাহলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হত।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেচে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দ্দা কত মোটা পর্দ্দা না জানি। পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্য ন্যায়কে

তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেচি। সুতরাং যাকে আমি কোন দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি-বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব?

শেষ চিঠি খানা এই :—

"বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা। এই খানে বড় কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে স্বর্গমর্ত্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয় তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্য্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্য্যন্ত মেয়াদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোন দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—এক মনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক্।"

বোঝা যাচ্চে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেচে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভাল লাগে না। অনিলকে একবার কোন মতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেচি কিন্তু তার সঙ্গে ত অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু "বল্লে আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েচি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল করা সোনার কার্ড কেস্ খুলে তার ভিতর থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চল্লুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। কর্‌লেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ। এবং যে নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকখানা আমার কাছে, এই টুক্‌রোটি তারি বাকি অর্দ্ধেক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৌতুকময়ী ।

সে এক তরুণী বালা দিবস নিশায়
বাহি লয়ে চলে' যায় তরণী আমার,
সে যে মোরে দিবানিশি কাঁদায় হাসায়,
তাহার এ পারাবারে নাহি পারাপার ;—
সে মোরে বাহিয়া নেয় দিগন্তের পানে ।
যবে মেঘলুপ্তাকাশে বিদারে অশনি
আমি শুধু ভয়ে মরি, সে যে হাসি গানে
আমারে কৌতুক হানে কৌতুক-চাহনি ।
সান্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্না তল ভরি অশ্রুজলে
কাঙাল নয়ন তার চায় মোর পানে ;
ব্যথায় গুঞ্জন ওঠে হৃদয় কমলে,
বৃথা সদা খুঁজি তারে জীবনের গানে,—
সে এক রহস্যময়ী সে এক তরুণী
সদা বাহি লয়ে চলে আমার তরণী ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রাবণ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২৭

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাণের কথা।

(ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে কথিত)

এ রকম সভার সভাপতির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রবন্ধ পাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য। ইংরাজীতে যাকে বলে mutual admiration, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি, অথচ একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক্ বন্ধুস্তুতি সাহিত্য-সমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু, আমি বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে কারণ আবার একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে, অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে, আমি প্রবন্ধ-লেখকের আর কিছুর না হোক্, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্ব্বোধ্য

অর্থাৎ জীবন, ঘটক মহাশয় তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটক মহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে উপনিষদের সময় থেকে সুরু করে অদ্যাবধি নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক, জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ কর্‌তে পারেন নি, যার উপর আর টীকা টীপ্পনি চলে না।

আমার মনে হয় দর্শন বিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে, হয় অনন্ত জীবন নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্ব্বাণ। এর কোন অবস্থাতেই জীবনের আর কোনই সমস্যা থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি, তাহলে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না—অপর পক্ষে যদি নির্ব্বাণ লাভ করি ত জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সমগ্র মানবজাতি, না-মরাতক্ এ সমস্যার শেষ মীমাংসা কর্‌তে পারবে না। আর যদি কোনদিন পারে তাহলে সেই দিনই মানবজাতির মৃত্যু হবে কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিম্বা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয় হওয়া অর্থাৎ মৃত হওয়া, কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয় বিশেষণও নয়—ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই

বলে এ রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা, যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা হয় একটা অর্থ স্থির করে না নিলে, মানুষে জীবন-যাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎ-সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

(২)

সতীশ বাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একই রকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শন বিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি, কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের

নিত্য কারবার কর্‌তে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজ জ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানিনে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দু রকম ভাবে বলা যায়। এক জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু—আর এক জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-তত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এ দুয়ের কোন মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না, অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য করো না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এরকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না—তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে, একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির দর্শন।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং কেউ প্রমাণ কর্‌তে চান যে প্রাণ দেহের বিকার আর কেউ বা প্রমাণ কর্‌তে চান যে প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারও মতে প্রাণ মুলতঃ আধিভৌতিক কারও মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়—কালের গুণে কখনো এ মত কখনো ও মত প্রবল হয়ে ওঠে। সে মতের গুণে নয়—যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস যে একটি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মুলে একই মত। কেননা উভয়

মতেই এমন একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের কল্পনা করা হয় যার আসলে কোনও স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় ও মধ্য পন্থাও আছে, সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্ত্বা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম Vitalism এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস অ-প্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না, যে প্রাণ কখনো অ-প্রাণে পরিণত হবে না। তারপর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূর্ত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয়—তাহলে প্রাণকেই জগতের মূল পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বল্‌তে পারি, জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড়প্রাণের সুপ্ত অবস্থা আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে প্রাণও আছে মনও আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় আরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্ম্মাণ দার্শনিক হেকেল এবং জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এ সব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না—তার কারণ—

সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহ মনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে, মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শন বিজ্ঞানের মন-গড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

(৩)

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না শুধু তাই নয় Vitalism কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। Vital force নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোট বড় নিয়মের অধীন তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন এ কথা বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন মূলতঃ তা যে, অভিন্ন এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহুচেষ্টা হয়েছে কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয়নি। প্রাণ জড়জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি বাঙ্গলা তা করেছে, অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু,

হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সর্ব্বাগ্র-গণ্য-বিজ্ঞানাচার্য্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি, যে জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার ধারণা তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয় তার লক্ষণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্। মানুষমাত্রেই জানে যে যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমন কি ছোট ছেলেরাও জানে যে গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ যে গুণে সমধর্ম্মী—সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, assimilation এবং reproduction—এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সধর্ম্মী। অর্থাৎ—এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের Least—Common Multiple এ কালের স্কুলের বাংলায় যাকে বলে "লসাগু"।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ দুই ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্ম্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্চে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে, ও বস্তু আমাদের মতই সাড়া দেয় অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এক কথায় আচার্য্য বসু উদ্ভিদ জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা উদর ও মিথুনত্বের সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত দিলেন। বসু মহাশয়, প্রাণের "লসাগু"তে সন্তুষ্ট না থেকে তার "গসাগু" অর্থাৎ Greatest Common Measureএর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে,

তখন সম্ভবতঃ কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না,—কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই তখন হৃদয় মস্তিষ্কাদি থাক্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোশ নেই তার অন্তরে মনোময় কোশের দর্শনলাভ তাঁরাই করতে পারেন, যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

(৪)

আমি বৈজ্ঞানিকও নই দার্শনিকও নেই, সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকার চর্চ্চা করলুম তার ভিতর চাই কি কিছু সার নাও থাক্‌তে পারে কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার আমাদেরও মীমাংসা করতে হবে আর কিছুর জন্য না হোক শুধু প্রাণধারণ করবার জন্য আমাদের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্চে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্চে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদ জ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা যে গুণে প্রাণী-জগতে মানুষ অসামান্য—সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্ম্মী সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারিনে, কোন্ কোন্ ধর্ম্মে আমরা ও দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবন-যাত্রার প্রধান সহায়, এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনরূপ অনুমান প্রমাণের দরকার নেই প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখ্‌তে পাই যে, উদ্ভিদ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এক কথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে স্থিতি।

তারপর দেখ্‌তে পাই পশুরা সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে গতি।

তারপর আসে মানুষ। যে হেতু আমরা পশু—সে কারণ আমাদের গতি ত আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে মতি।—

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধরাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে গণ্ডীবদ্ধ অর্থাৎ উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধজীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত—কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে—আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না, যে মানুষের পক্ষে প্রাণী-জগতে পশ্চাৎপদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত্ত অবস্থারই এমন সব বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে যা, তার অপর মূর্ত্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ্ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপর পক্ষে তার সুবিধা

এই যে তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়—সে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে যেতে পারে, এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই সামিল—কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক্ শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়, সে স্থান ত্যাগ করতেও পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। এ কালের ভাষায় যাকে "বেষ্টনী" বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতি গতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে তাকে জীবনধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয় মন খাটাতে হয় না, উদ্ভিদকে শরীর মন দু'য়ের কোনটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক্ মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর মন দু'য়ের কোনটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব—আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা উদ্ভিদকে আদর্শ করে তুলব—এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠিত করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। "স্বধর্ম্মে নিধনো-

শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ” এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে বাইরে যে গতি-শক্তি আছে তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতি গতির শুভ পরিণয়ের বলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি।—আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে’ তোলা ছাড়া আয়ুঃবৃদ্ধির অপর কোনও অর্থ নেই।

২৪শে জুন ১৯১৭।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কথা ও সুর।

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমি এক সময়ে এই মত প্রকাশ করি যে, কথার রস ও সঙ্গীতের রস এক বস্তু নয়, ; এবং অধিকাংশ লোকে সঙ্গীতরসের রসিক না হলেও, তাঁরা যে গান শুন্‌তে ভাল-বাসেন তার কারণ,—তাঁরা সুরসংযুক্ত কথার রসে মুগ্ধ হন। কথার রস অবশ্য প্রধানতঃ তার অর্থের উপর নির্ভর করে, অতএব কথার রস উপভোগ করার অর্থ, তার মর্ম্ম অনুভব করা। ঐ রসের সন্ধান একমাত্র অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়; অপরপক্ষে আমার মতে সঙ্গীতের ব্যাকরণ আছে, কিন্তু অভিধান নেই।

এর উত্তরে আমার কোনও সুগায়ক বন্ধু এই প্রশ্ন করেন যে, "তবে কি আপনি বল্‌তে চান যে, সুর ও কথার ভিতর কোনও স্বাভাবিক যোগাযোগ নেই? আর বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মানুষে নিরবধি যে গান গেয়ে আস্‌ছে – তা কি সঙ্গীত নয়?"

এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জো নেই, সুতরাং এর উত্তর দেওয়াটা কর্ত্তব্য; এবং এ প্রবন্ধে আমি সেই কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

কথা ও সুরের যোগাযোগটা এতই প্রত্যক্ষ যে, গান যে সঙ্গীতের একটা অঙ্গ, একথা অস্বীকার করা চলে না। অপরপক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, যন্ত্রসঙ্গীতে কথার বালাই নেই, অথচ যন্ত্রসঙ্গীতও

সঙ্গীত—শুধু তাই নয়, অনেক গানও যন্ত্রসঙ্গীতের সামিল। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী গানের কথার অর্থ আমরা বুঝি নে। সুতরাং মোটামুটি হিসেবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যে-বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী গান শুনে যথার্থ আনন্দ পান, তিনি তার সুরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন; আর যিনি বাঙ্গলা ছাড়া অপর কোনও গান শুনলে কাতর হয়ে পড়েন, তিনি বাংলা গানের কথার রস উপভোগ করেন। অর্থাৎ এর একজন হচ্ছেন সঙ্গীতরসের রসিক, আর একজন কাব্যরসের রসিক। এ উভয়ে অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। এঁরা এক দেশের অর্থাৎ ভাবরাজ্যের অধিবাসী হলেও, এক জাত নন। রবীন্দ্রনাথের রূপকের ভাষায় বল্‌তে গেলে, সুরপ্রাণ লোকের ঠিকানা হচ্ছে ১লা নম্বর, এবং কথাপ্রাণ লোকের ২রা নম্বর; এবং এ উভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের একের ভাষা অপরে বুঝতে পারে না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন সিতাংশু মৌলীও নই, অদ্বৈতচরণও নই—কিন্তু এ দুয়ের মধ্যস্থ জীব;—অর্থাৎ আমরা যখন উভয়ের আসরেই সমান আড্ডা জমাই, তখন আমাদের পক্ষে সুর ও কথার মিলনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার অন্ততঃ চেষ্টা করাটাও দরকার।

(২)

প্রথমত, কথার দলের মত শোনা যাক্‌। অদ্বৈতচরণ বলেছেন:—
"ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল, তখনই গানের উৎপত্তি—

তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত।” অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রকাশের আদিম চেষ্টার ফল কণ্ঠসঙ্গীত। শুনতে পাই এ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। গান থেকে যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এ বৈজ্ঞানিক মত গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিন্তু অনেক বাধা আছে। গানের সৃষ্টি বোবায় করেছে, এ কথা বলাও যা,—আর নাচের সৃষ্টি খোঁড়ায় করেছে, এ কথা বলাও তাই। এরকম কথা বিজ্ঞানে বললেও, সজ্ঞানে বলা যায় না। আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার ফলে বোবার কণ্ঠ হতে যে ধ্বনি নির্গত হয়, একালে আমরা তাকে সঙ্গীত বলি নে, সুতরাং সেকালের সেই জাতীয় ধ্বনিকে সঙ্গীত বলবার কোনই কারণ নেই। ব্যথায়, আহ্লাদে, আমরাও চীৎকার করি, কিন্তু সে চীৎকার-ধ্বনি সঙ্গীতের নয়, ভাষার অন্তর্ভূত—কেননা উক্ত উপায়ে আমরা কেবল সজোরে আমাদের মর্ম্মান্তিক ভাবই প্রকাশ করি। শুধু তাই নয়,—বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রস চীৎকারের সাহায্যে যেমন পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায়—কোনও কথার সাহায্যে তার সিকির সিকিও করা যায় না। চীৎকার সঙ্গীত নয়,—ও একরকম কথা; যেমন অনেক স্থলে কথাও একরকম চীৎকারবিশেষ। এর প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের মাসিক সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমালোচনাসাহিত্যে চীৎকার ব্যতীত আর বড় কিছু নেই। গান যে ভাষার আদিম রূপ নয়, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, যদি তা হত, তাহলে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করবামাত্র গান বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে সঙ্গীত, ভাষার পাশাপাশি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি লাভ

করছে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সুর ও কথার ভিতর সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নয়।

(৩)

আমার বিশ্বাস, কথা ও সুর সহোদর—নাবালক অবস্থায় এ দুটী একান্নবর্ত্তী ছিল, সাবালক হয়ে উভয়ে পৃথক হয়ে গেছে। শব্দমাত্রই ধ্বনি, সুতরাং কথামাত্রেরই ঝোঁকও আছে, টানও আছে; অর্থাৎ প্রতি কথার অন্তরেই তাল ও সুরের উপাদান অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। সেই উপাদান কথা থেকে পৃথক করে নিয়ে, টানের বিস্তার ও সঞ্চার করে, এবং ঝোঁককে প্রস্ফুটিত ও গুম্ফিত করে মানুষে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। কথার ভিতর সুর, কিম্বা সুরের ভিতর কথা প্রক্ষিপ্ত করে, সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় নি।

(৪)

কণ্ঠসঙ্গীতই অবশ্য সঙ্গীতের আদিমরূপ। কেননা কণ্ঠ হচ্ছে মানুষের হাতেগড়া নয়, পড়ে-পাওয়া যন্ত্র। এবং সুর ও কথা দুই যখন ঐ এক যন্ত্রেই তৈরি হয়—তখন দুয়ের আদিম মিশ্রণটা নিতান্তই স্বাভাবিক, কেননা অনিবার্য্য। এ মিশ্রণ কিন্তু রাসায়নিক নয়—যান্ত্রিক। জীবজগতে এক শ্রেণীর জীব আছে, যারা একাধারে উদ্ভিদ ও জন্তু; গানও হচ্ছে আর্টের জগতে সেই শ্রেণীর পদার্থ—ও বস্তু একাধারে কাব্য ও সঙ্গীত। কিন্তু গানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতেও সুর ক্রমে ক্রমে কথার

বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আমাদের হিন্দুসঙ্গীতের ইতিহাসে সঙ্গীতের মুক্তির সোপানগুলি দিব্যি পর পর সাজানো আছে।

প্রথমেই আসে ধ্রুপদ। ধ্রুপদে কথা ও সুরের ভিতর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এ ক্ষেত্রে সুর ছাড়া কথাও নেই, কথা ছাড়া সুরও নেই।

তারপর আসে খেয়াল। খেয়ালে সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক নামমাত্র। এমন কি, এ ক্ষেত্রে কথা শুধু নামকো ওয়াস্তে—সুরই হচ্ছে সার। খেয়ালে সুর কথাকে পিছনে ফেলে নিজের খেয়ালে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এবং শ্রান্ত হলে কথার ঘরে বিশ্রাম করতে আসে মাত্র।

তারপর আসে আলাপ। আলাপে সুর কথার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না। সেইজন্যে আলাপের সুর কণ্ঠনিঃসৃত হলেও, যন্ত্র-সঙ্গীতের কোঠায় এসে পড়ে; এবং সেইজন্যে তা পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। বলা বাহুল্য, সঙ্গীত যন্ত্রস্থ হয়েই যথার্থ মোক্ষলাভ করে।

অপরপক্ষে ভাষা যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—তখন সে সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাব্য যত মহান হয়, ততই তা রাগরাগিণীনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। কাব্য যতদিন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারে, ততদিনই তা সুরের কোলে চড়ে বেড়ায়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সুর যে-পরিমাণে কথা থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে, এবং কথা যে পরিমাণে সুর থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা ভাষা হয়ে ওঠে। মুখে অর্থাৎ মুলে যা ছিল এক, কালক্রমে তা আর্টের অর্থাৎ মানুষের

আত্মপ্রকাশের রাজ্যে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বরের এক-দিকে চরম বিকাশ হচ্ছে অর্থমুক্ত আনন্দঘন যন্ত্রসঙ্গীত,—আর একদিকে চরম বিকাশ হচ্ছে সুরমুক্ত চিদ্‌ঘন কাব্যসাহিত্য।

কিন্তু চরম বিকাশ হলেও, এ উভয়েরি কৃত্রিম হয়ে পড়বার একটা বিশেষ সম্ভাবনা আছে। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সকল পদার্থই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কি সঙ্গীত, কি সাহিত্য, যখন শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে ওঠে—তখন তার অন্তরে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য আমাদের আবার মূলে ফিরে যাওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ সুর ও কথার পুনর্মিলন ঘটানো আবশ্যক। এই জন্যেই যুগে যুগে নতুন গান সৃষ্টি করা দরকার, নচেৎ কি সঙ্গীত, কি কাব্য, কোনটিকেই জিইয়ে রাখা যায় না। এক কথায় সঙ্গীতের স্থিতির জন্য সুর ও কথার যোগ, এবং তার উন্নতির জন্য ও-দুয়ের বিয়োগ আমাদের করতেই হবে। এ জগতের অনেক ক্ষেত্রেই পালায় পালায় এই রকম যোগ বিয়োগ ঘটে থাকে। প্রকৃতি যে গিঁট একবার খোলেন, কখন কখন তা আবার পাকা করে বাঁধেন। উদাহরণ—evolution of sex.

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙ্গলা-ভাষার কুলের খবর।

শুন্‌তে পাই এ দেশে এমন সব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক আজও আছেন, যাঁদের বিশ্বাস যে বাংলা-ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ।

এ বিশ্বাস যে অমূলক, বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা হওয়া দূরে থাক, দৌহিত্রীও নয়—কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের বংশধর—এ সত্যের যাঁরা প্রমাণ দেখতে চান, তাঁদের আমি গত আষাঢ় মাসের "প্রতিভা" পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের "বাঙ্গলা-ভাষা" নামক প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। চন্দ মহাশয়ের লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, যার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই, এমন কথা বলা তাঁর অভ্যাস নেই। এবং তিনি প্রাচীন দলিলপত্র হতে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। চন্দ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের হয়ে যে সকল গুণের দাবী করেছেন, যথা—"পরিশ্রম, রীতিমত বিচার, সহন, ধৈর্য্য" ইত্যাদি, তাঁর প্রবন্ধে সে-সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের সত্য নিজের অন্তরে আবিষ্কার কর্‌বার সহজ উপায়টি কোনও কোনও বাঙ্গালী ঐতিহাসিক আজও ত্যাগ করেন নি, সুতরাং তাঁদের আবিষ্কার তাঁদের মনঃপূত হলেও সকলের মনঃপূত হয় না। যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেলে মনঃক্ষুন্ন হন না,—তাঁরা বাংলা-ভাষার

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়লাভে আনন্দিত হবেন; কেননা সংস্কৃতের অধীনতার চাপে বর্ত্তমানে বাংলা আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে—অথচ বাংলা-ভাষাকে শাসন করবার কোনও অধিকার সংস্কৃতের যে নেই—চন্দ মহাশয় এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন।

(২)

একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুকাল থেকে ভারতবর্ষের প্রাকৃতের চর্চ্চা করে আসছেন। এবং এঁদের অগাধ পরিশ্রমের ফলে এই সত্য আবিষ্কৃত হয় যে, মাগধী প্রাকৃত ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে কালক্রমে উড়িয়া, বাংলা ও আসামীরূপ ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেছে। কিন্তু বাংলা-ভাষা কোন যুগে তার বিশিষ্ট রূপ লাভ করে—তার প্রমাণ আমরা আজও পাই নি। এ ক্ষেত্রে দলিলপত্রের একান্ত অভাব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে নেপাল থেকে কতকগুলি বৌদ্ধ দোঁহা ও পদাবলী সংগ্রহ করে এনেছেন, যা নাকি তাঁর মতে হাজার বৎসরের আগেকার বাংলায় লেখা। অধ্যাপক বেণ্ডল এ ভাষাকে অজ্ঞাতকুলশীল ভাষা বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আমার কানেও এ ভাষার সুর কখনো বাংলা বলে ঠেকে নি। বহু শব্দের শেষে অযথা আকার সংযুক্ত থাকায়, এই সকল দোঁহা ও চর্য্যাপদের অধিকাংশ পদের চেহারা একটু খোট্টাই হয়ে উঠেছে। চন্দ মহাশয় বলেছেন যে—"এ ভাষা ত বাঙ্গলা নয়ই; ইহা হাজার বছর পূর্ব্বের বাঙ্গলার ভাষা অর্থাৎ প্রাচ্য অপভ্রংশ কিনা, তাহাও বলা কঠিন"। এ বিষয়ে কোনও কথা জোর করে বলবার অধিকার

আমার নেই। তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যে বাংলা, শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করতে পারেন নি ;— বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত। দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন। আমার বিশ্বাস এই নামই ঠিক। এ ভাষা বাংলা-ভাষার উদয়ের ভাষা নয়— সম্ভবতঃ কোনও প্রাকৃতের অস্তের ভাষা। অপরপক্ষে এমনও হতে পারে যে, বাংলা ও হিন্দির সন্ধিতে এ ভাষার জন্ম। এ ভাষা যদি বাঙ্গলার প্রাচীন ভাষা হয়, তাহলেও এতে এতটা হিন্দির ভেজাল আছে যে, একে একটা দো-আঁসলা ভাষা বলাই নিরাপদ।

(৩)

"বাংলাভাষা" কথাটার ভিতর দ্ব্যর্থ আছে, কেননা এখন বাঙ্গলা-দেশে একটি নয়, দুটি ভাষার চলন আছে। এর একটি লেখার, আর একটি কথার ভাষা। আকারে প্রকারে এ দুয়ের ভিতর যে প্রভেদ আছে, সে কতকটা ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদের অনুরূপ। সাধু-ভাষার পাণ্ডাদের মতে, সরস্বতীর মন্দিরে খাঁটি বাংলার প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং বাংলাভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে—এই সাধুভাষার কুলের খবরও নেওয়া দরকার। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার (Senart) ভারতবর্ষে জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করবার চেষ্টায় বিফল হয়ে, শেষটা হতাশ ভাবে এই কথা বলেন যে, "হিন্দুস্থানের আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে, যার গুণে এদেশে কোনও জিনিষই গোটা থাকে না—সবই টুকরো হয়ে পড়ে"।—এক কথায় এ দেশ হচ্ছে ভগ্নাংশের দেশ। চন্দ মহাশয় কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। যিনি

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি যে বাংলাভাষার জাতিভেদের কারণ নির্ণয় না করে ক্ষান্ত হবেন, এ হতেই পারে না। বিশেষতঃ এ প্রভেদের মূল যখন একালের ভিতরেই পাওয়া যায়। চন্দ মহাশয়ের মতে সেকালে এ দেশে একটিমাত্র ভাষা ছিল—যে ভাষাকে আমরা শূদ্র বলি ;—এই শূদ্র ভাষার অন্তর থেকেই ব্রাহ্মণ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং সাধুভাষা হচ্ছে বর্ণব্রাহ্মণ ভাষা। লেখার ভাষার এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার মূলে আছে রাজপ্রসাদ। নবাবী আমলে গৌড়ের রাজ-দরবারে বাংলাভাষার উপনয়ন হয়, পরে ইংরাজি আমলে কলকাতার কেল্লায় তা পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। চন্দ মহাশয় তাই বলেন যে, এই "সাধুভাষাকে King's Bengalee বা রাজার বাংলা বলা যাইতে পারে।" এই প্রবন্ধেই চন্দ মহাশয় সাধুভাষাকে কোথায়ও "রাজভাষা" কোথায়ও বা "রাজার দুলালী" ভাষা বলেছেন। এর পরে আলালী ভাষার পক্ষে কোনও কথা বললে, সে কথা অবশ্য বিদ্রোহ বলেই গণ্য হবে। চন্দ মহাশয় তাই সাধুভাষার বিপক্ষ দলকে "বিদ্রোহী দল" বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর মতে এ "বিদ্রোহের প্রকৃত নায়ক স্যর রবীন্দ্রনাথ।" কেননা তিনি "গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বাংলা গদ্যে দেশী শব্দের ব্যবহারবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সাহস দেখাইয়াছেন"। কথা সত্য।

(৪)

চন্দ মহাশয়ের নির্ণীত সাধুভাষার নিদান যে ঠিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে হিসেবে ইংরাজি সাহিত্যের ইংরাজি

King's English সে হিসেবে সাধুভাষা King's Bengalee নয়;—কেননা এ ভাষা বাদশার আমলেও Court language ছিল না--ইংরাজের আমলেও তা হয় নি। খাঁটি বাংলার মত সাধু বাংলাও চিরদিন রাজদরবার থেকে তিরষ্কৃত হয়ে রয়েছে। সাধুভাষা রাজার ফরমায়েসে তৈরি হলেও রাজভাষা নয়,—সংক্ষেপে সাধুভাষা কেতাবি হলেও খেতাবি নয়। চন্দ মহাশয় স্বীকার করেন যে, এ ভাষা একটা "কৃত্রিম" ভাষা। তাঁর নিজের কথা এই;—

"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের...........পণ্ডিত মহাশয়েরা, পণ্ডিত্ জনে পড়াইতে পারেন, এমন ভাষা গড়িয়া তুলিলেন। তদ্ভব ও দেশী শব্দ ভাষা হইতে তাড়িত হইল।.................এই বাংলা গদ্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে পড়িয়া, এমন কৃত্রিম বস্তুর যতটা সজীব, সরস ও সহজ হওয়া সম্ভব, ততটা তেমন হইয়াছিল।"

এই কথাই ত আমি চিরদিন বলে আস্‌ছি, সুতরাং আমার সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের গরমিলটা যে কোথায়, তা একটু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক। চন্দ মহাশয় বলেছেন ঃ—

"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লেখ্যভাষার সংস্কারসম্বন্ধে বিদ্রোহীদলের অনুযায়ী দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব দুইটি এই......

(১) অনেক কথা যা পুর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার লেখায় ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

(২) মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের ও বিভক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়।"

এ প্রস্তাব দুটি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় বলেন......................

"প্রথম প্রস্তাবটি খুবই ভাল। এখন বাহিরে পড়িয়া আছে, এমন বাঙ্গলা কথা লেখ্য ভাষার ভিতরে টানিয়া আনিয়াই আমাদের থামিয়া যাওয়া ঠিক নয়। লেখ্যভাষার ভিতরে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি বাদ দিলে চলিতে পারে, সেইগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত"।—উদাহরণস্বরূপ তাঁর মতে "বহির্ভূত" শব্দটিকে বঙ্গ-সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করা দরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে চন্দ মহাশয় আমাকেও ছাড়িয়ে যান। আমি, কি তদ্ভব কি তৎসম, কোন শব্দকেই বয়কট করবার পক্ষপাতী নই। আমার মত এই যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দকে সাধুভাষীরা নির্ব্বিচারে বঙ্গ সাহিত্যে অবরুদ্ধ করেছেন, এখন তাদের কোন কোনটিকে মুক্তি দিতে হবে—কিন্তু সে বিচার করে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব তিনি অবশ্য গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন ধর্ম্মকর্ম্মের বদলে ধম্মকম্ম সাহিত্যে চল্‌বে না। অবশ্য চলবে না, এবং আমরা তা চালাতেও চাই নে,—কেননা আমরা মুখেও বলি ধর্ম্মকর্ম্ম। যদি কোনও প্রদেশের মৌখিক ভাষায় ও-দুটি শব্দ রেফভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে প্রদেশের মৌখিক ভাষাও সাহিত্যে চলবে না। কিন্তু চন্দ মহাশয়ের আসল আপত্তি ক্রিয়াপদের প্রচলিত বিভক্তিতে। তিনি বলেন, "আসছি" হচ্ছে ক্রিয়ার synthetic আকার, আর "আসিতেছি' তার analytic আকার; এবং যেহেতু বাংলাভাষা analytic ভাষা, সেই কারণ "আসিতেছি" আকারই গ্রাহ্য। এ যুক্তি যদি সঙ্গত হয়, তাহলে "আস্‌তে আছি" লেখাই কর্ত্তব্য—কেননা "আসিতেছির" অপেক্ষা "আস্‌তে আছি" analytic

হিসেবে আর এক ধাপ উপরে। প্রদেশভেদে আজও বাঙ্গালীর মুখে "আস্‌তে আছি" "আসিতেছি" এবং "আস্‌ছি", এই তিন রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং কথায়বার্ত্তায় এর শেষোক্ত রূপটিই যে আমাদের কানে ভাল লাগে ও ভদ্র শোনায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা যদি কানের পরামর্শ শুনি, তাহলে লেখায় "আসিতেছি"র পরিবর্ত্তে "আসছি" লিখতে কুণ্ঠিত হব না। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ইংরাজ-কবি মিলটনের যে মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তার একটি কথা আমি নতশিরে মেনে নিতে রাজি আছি। মিলটন বলেছেন, সাহিত্যের অন্তর থেকে বর্ব্বরতা দূর করবার জন্য "Detective police of ears"-এর প্রয়োজন। অলঙ্কারের সকল সমস্যা কেবলমাত্র নিরুক্ত ব্যাকরণের সাহায্যে মীমাংসা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষ করে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনও analytic ভাষা ষোল-আনা analytic নয়, কিন্তু অনেকাংশে বিভক্তিগত, অর্থাৎ synthetic.

(৫)

বাংলা পদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় যা বলেছেন তা সত্য হলেও, উক্ত সাহিত্যের ভাষার প্রতি "সাধু" বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না,—ও গুণ হচ্ছে কলকাতার কেল্লাজাত গদ্যের একচেটে। কৃত্তিবাসী রামায়ণাদি গৌড়ের মুসলমান বাদশাদের আদেশে রচিত হলেও কোনও দরবারি ভাষায় রচিত হয় নি; খাঁটি বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এরূপ হবার কারণ চন্দ মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেন :—

"ইংরেজ আমল আরম্ভ হইলে ইংরেজ রাজপুরুষগণকে বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য গদ্যপুস্তকের দরকার হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পুরাণ গদ্যপুস্তক তখন ছিল না, যাহা সাহেবদিগকে পড়ান যাইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য তৈয়ারি করার ভার পড়িল। কৃত্তিবাস, গুণরাজখান, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের গীত সাধারণ অশিক্ষিত লোকের জন্য রচিত হইয়াছিল।"

চন্দ মহাশয়ের উপরোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।—এ স্থলে অশিক্ষিত শব্দ সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের প্রতিই ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং গৌড়ের পাঠান বাদশাদেরও নির্ভয়ে অশিক্ষিতের দলে ফেলা যেতে পারে। তাঁরা আরবি ফার্সিতে সুপণ্ডিত হলেও, নিশ্চয়ই সংস্কৃত জান্‌তেন না; নচেৎ সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁরা অতটা লালায়িত হতেন না। ফোর্ট উইলিয়ামের সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের একটি বিশেষ তফাৎ এই ছিল যে, সাহেবেরা বাংলা জানতেন না, বাদশারা জানতেন। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ রাজপুরুষদের বাংলা শেখাবার জন্য নয়, কাব্যকথা শোনাবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন,—কাজেই সে সব গ্রন্থ খাঁটি বাংলাতেই রচিত হয়েছে।—

চন্দ মহাশয় নবাবী আমলের পদ্যকে যে সাধু আখ্যা দেন, তার একমাত্র কারণ যে, বর্ত্তমান সাধু গদ্যের সঙ্গে সে পদ্যের এক জায়গায় মিল আছে। ক্রিয়ার অন্তে "ইয়া" এবং সর্ব্বনামের অন্তরে "হা" একালের গদ্যে আছে, এবং সেকালের পদ্যেও ছিল। বলা বাহুল্য ভাষা সম্বন্ধে সাধু শব্দের অর্থ হচ্ছে কেতাবি। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একালে ক্রিয়ার যে রূপ কেতাবি হয়ে উঠেছে, সেকালে সে

রূপ যে মৌখিক ছিল না, তার প্রমাণ কি ? সেকালে তাঁরা যদি মুখে "করিয়া" না বল্‌তেন, তাহলে লেখায় ও রূপ কোথা থেকে আমদানি করলেন ? একালে আমরা এ রূপের সন্ধান বইয়ের ভিতর পাই, কিন্তু বাংলার আদি কবিরা ত আর বাংলা বই পড়ে বাংলা বই লেখেন নি। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সেকালের উচ্চারণের অনুরূপই বাংলা লিখে গিয়েছেন। বিশেষ্য ও বিশেষণের বেলায় তদ্ভবের পরিবর্ত্তে তৎসম শব্দ ব্যবহার করায় কোন বাধা ছিল না—কেননা সংস্কৃত অভিধানের মধ্যেই সে শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; কিন্তু ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সাধুবিভক্তির সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিতর পাওয়া যায় না।—সুতরাং আমরা যখন "করে" লিখি, তখন বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করি। চন্দ মহাশয় সাধুভাষার পক্ষে ওকালতি কর্‌তে বসেন নি—তিনি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন ; সুতরাং তিনি ভাষাসম্বন্ধে কোনও সত্যের সাক্ষাৎ পেলে, অকপটচিত্তে তা সকলের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই ঃ—

"যদাদি সর্ব্বনামের যাহাকে যাহাতে ইত্যাদি রূপ; ইয়া, ইতেছি ইত্যাদি ক্রিয়ার বিভক্তি, অবশ্যই কথ্যভাষা ঝাড়িয়া পুছিয়াই সংগ্রহ করা হইয়াছিল।"—উক্ত বাক্যটি থেকে "ঝাড়িয়া পুছিয়া" পদ দুটি বাদ দিলে, আমার কথার সঙ্গে তাঁর কথার তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। চন্দ মহাশয় আরও বলেন যে "এই সকল বিভক্তি যে কোন্ প্রদেশের কথ্যভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বলা সহজ নহে" ;—আমার বিশ্বাস তা বলা মোটেই কঠিন নয়। গঙ্গা যেমন বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করামাত্র দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে, একদিকে পদ্মা আর একদিকে

ভাগীরথীর আকারে বয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাও তেমনি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। মাহাত্ম্য যেমন পদ্মার জলে নেই, ভাগীরথীর জলে আছে,—তেমনি ভাগীরথীর উভয়কুলের বাংলা ভাষায় যে মাহাত্ম্য আছে, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সে মাহাত্ম্য নেই। এই ভাগীরথী-ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা। আমরা যে ইংরাজি আমলের কেতাবি ভাষার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি, তার কারণ—আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতার কেল্লার গড়খাইয়ের বদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তরে আবার ভাগীরথীর প্রবাহ এনে ফেলা। এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, সে জল ঘোলা—তার উত্তরে আমরা বলব তা হোক, ওতে স্রোত আছে।—কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই ভাগীরথীভাষাই হচ্ছে আমাদের যথার্থ জীবন, এর স্নানপানেই আমরা কৃতার্থ হব। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে লর্ড মরলির একটী মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলি বলেছেন যে, বর্ত্তমান ইংরাজি সাহিত্যে :—

"Domestic slang, scientific slang, pseudo-aesthetic affectations, hideous importations from American newspapers" প্রভৃতি প্রবেশ করে, সে সাহিত্যের শুদ্ধতা ও আভিজাত্য নষ্ট করছে। বাঙ্গলার সাধু গদ্যের বিরুদ্ধে আমাদেরও ঐ একই অভিযোগ। বিদ্যে-দেখানো পণ্ডিতি slang, সৌন্দর্য্যের ওজুহাতে pseudo-aesthetic অর্থাৎ pseudo-classical affectations, ইংরেজি-ভাঙ্গা বীভৎস সঙ্কীর্ণবর্ণ নবশব্দ প্রভৃতির আমদানিতে বাঙ্গলার সাধুগদ্য কিম্ভূতকিমাকার ও জবড়জঙ্গ হয়ে উঠেছে।—চন্দ মহাশয়ের বিশ্বাস যে, আমরা সাহিত্যের ভাষা থেকে এ সব পাপ দূর করে, তার পরিবর্ত্তে domestic slang-এর আমদানি করতে চাই। তিনি

ভুলে গিয়েছেন যে, আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোনও শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে পারি নে। Slang, ভাষা নয়; হয় তা অপভাষা, নয় উপভাষা। ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি-ভাবে ব্যবহার করতে চাই।—ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, তা চন্দ মহাশয়ধৃত বাগ্‌ভটালঙ্কারের একটি বচনে বেশ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।—

"অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম"

অর্থাৎ "সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ।"—

চন্দ মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা একটী অপভ্রংশ; সুতরাং কথিত ভাষা যে শুদ্ধ বাংলা—এ কথা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং এই ভাষাই যে সাহিত্যে প্রযুজ্য, সে সম্বন্ধে তিনি ভরত মুনির বিধিও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। সে বিধি এই:—

বিন্ধ্যসাগর-মধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
ন-কার বহুলা তেষু ভাষা তজ্জ্ঞঃ প্রয়োজয়েৎ॥—

আমরা এই শাস্ত্রবিধি পালন করবার চেষ্টা করে থাকি। আমাদের এ প্রচেষ্টা যে শুধু শাস্ত্রসঙ্গত তাই নয়—যুক্তিসঙ্গতও বটে। চন্দ মহাশয় এই বলে তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন:—

"খাঁটি বাঙ্গলা শিক্ষা করা আবশ্যক"।—আমরা বলি শুধু শিক্ষা নয়, এ বিষয়ে দীক্ষা নেওয়াও আবশ্যক।—চন্দ মহাশয় সাহিত্যের

ভাষা সম্বন্ধে লর্ড মরলির মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলির চাইতে ঢের বড় লেখক—নব্য ইতালির সর্ব্বপ্রধান কবি ও গদ্যলেখক Carducci-র মত আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। Bologna বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করে Carducci তাঁর শেষ বয়সে এই কটি কথা বলেন।:—

"It has been my wish always to inspire myself and lift you up to the attainment of this ideal—to shed the old garments of an outworn state of society, and to prefer being to seeming, duty to pleasure; to aim high in art, I say; at simplicity rather than artifice; at grace rather than mannerism; at vigour rather than display; at truth and justice rather than glory."—

আমাদের সরস্বতীর মন্দিরের সিংহদ্বারের উপরে এই কটি কথা যে সোণার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস চন্দ মহাশয় আমার সঙ্গে একমত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অহল্যা।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥

উক্ত বিধির অর্থ ও অভিপ্রায় নিয়ে বহু শিক্ষিত লোক যে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ইংরাজি শিক্ষার গুণ কিম্বা দোষই এই যে, তা মানুষকে মানুষের সকল কথা, সকল কাজের মানে বুঝতে ও কারণ খুঁজতে শেখায়; এবং বলা বাহুল্য যে উক্ত বিধির মর্ম্ম ও ধর্ম্ম এতটা প্রত্যক্ষ নয় যে, বিনা অনুসন্ধানে বিনা গবেষণায় তা হস্তগত করা যায়।

কিন্তু অনেক মাথা বকিয়েও, স্মৃতিশক্তির উক্তরূপ চর্চ্চার সার্থকতা,—এক কথায় এ বিধির বৈধতা—কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি। এর প্রথম কারণ, বুদ্ধির ছুরিতে চিরে দেখলে দেখা যায় যে, অনেক বিধিরই অন্তরে কোনও সার নেই। এর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই বিধিটি এতই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া যে এর কাছ থেকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ঘা খেয়ে এবং বিচারবুদ্ধি হার মেনে চলে আসে। সাদার গালে কালি দিয়ে তাকে কালো করা যত সহজ, কালোর গালে চুন দিয়ে তাকে সাদা করা তত সহজ নয়। সে চূর্ণ যে ছুঁলে মুছে যায়, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

এ বিধির অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একদম বাজে খাটুনি ;—কেননা আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনও পৈতৃক আধ্যাত্মিক গুপ্ত ধন পোঁতা নেই। যে দেশে সীতা সাবিত্রী চিরস্মরণীয়া, সেই দেশেই যে আবার তারা মন্দোদরী নিত্যস্মরণীয়া—এ কথা এতই অদ্ভুত যে, উক্ত শ্লোকটি উদ্ভট না হয়ে যায় না। ও হচ্ছে আসলে একটা রসিকতা—এবং বেজায় রসিকতা।

রসিকতাকে যে লোকে হয় অসার কথা নয় সার কথা বলে ভুল করে, তার পরিচয় ত একালেও সকালে বিকেলে পাওয়া যায়। সেকালের তাঁরা একালের আমাদের চাইতে যখন ঢের বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তখন সেকালের রসিকতা যে কালগুণে শাস্ত্রবিধি হয়ে উঠবে, তাতে আর আটক কি ?

(২)

এককালের রসিকতা যে আর এককালে বিধি হিসেবে গণ্য হতে পারে, একথা অনেকে মানলেও,—একথা সকলে মানবেন না যে, এককালের বিধি আর এক কালে রসিকতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। যার কোনও কারণ নেই, মীমাংসক মতে সেই বিধিই যে একমাত্র পাকা বিধি, এ কথা কে না জানে ?—স্মৃতরাং উক্ত নিয়মানুসারে এ বচনকে পাকা বিধি বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হলেও, এর একটা কথায় মনের মধ্যে একটু খট্‌কা রয়ে যায়।

কথাটা হচ্ছে এই যে, অহল্যাকে দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীর দলে কেন ফেলা হল ? এঁরা হচ্ছেন সব রাজার মেয়ে, রাজার রাণী,

সব এক জাত, এক দল। অপরপক্ষে অহল্যা ছিলেন একে ব্রাহ্মণ-কন্যা, তাতে ঋষিপত্নী; অপর চারটির সঙ্গে তিনি ত এক কেলাসে বসতেই পারেন না।

কথায় বলে, "রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়।"

সুতরাং ইহজীবনে উক্ত রাজার নন্দিনীরা যে যা করেছিলেন, সে সবই যে শোভা পেয়েছিল,—তার সাক্ষী ব্যাস ও বাল্মীকি। এই রাজার ঝিরা আখেরে রাজার প্যারী হয়েই ভবলীলা সম্বরণ করে' স্বর্গে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদী অবশ্য স্বর্গের সকল সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন নি, তার কারণ তিনি হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে সমান করে দেখেন নি। সশরীরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়েছিল শুধু বেচারি ব্রাহ্মণকন্যাকে; আর সে প্রায়শ্চিত্ত কি ভয়ানক কাণ্ড—দেহ হয়ে গেল পাষাণ, আর তার ভিতর আত্মা রইল কবরস্থ। নিজের ভিতর নিজের গোর হওয়াটা কখনই আরামের হতে পারে না,—হোক না সে সমাধি-মন্দির মার্বেল পাথরে গড়া। অথচ কি অপরাধে তাঁকে এই কঠিন শাস্তি ভোগ কর্‌তে হয়েছিল?—অহল্যার অপরাধ এই যে, তিনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকে স্বামী বলে ভুল করেছিলেন। স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করায় যে পুণ্য হয়, এ কথা ত এদেশের স্ত্রীলোকেও জানে; অথচ এ কথা এ দেশের পুরুষেও মানে যে, অধিকাংশ স্ত্রীর পক্ষে অধিকাংশ স্বামীকে দেবতা বলে ভুল করবার কোনও কারণ নেই,—অতএব সে ভুল করাও অসম্ভব। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, যে ভুল করা অসম্ভব সেই ভুল করায় হয় মহাপুণ্য,—আর যে ভুল না করা অসম্ভব, সেই ভুল করায় হয় মহাপাপ। দর্শনে বলে এ জগৎটা একটা ভ্রান্তি মাত্র।

জীবনের গোড়ার অঙ্কই যখন ভুল, তখন তার ভুলের অঙ্ক যত বাড়ানো যাবে জীবনটা যে তত বড় হয়ে উঠবে—এ ত ধরা কথা। এই কারণেই সামাজিক পিনাল কোডের ধারাগুলি মুখস্থ করেই লোকে জীবনে পাশ হয়,—বুঝলে পরে নির্ঘাত ফেল।

(৩)

অতএব ধরে নেওয়া যাক্ যে, অহল্যা তার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই ভোগ করেছিল।

তারপর এই প্রশ্ন ওঠে যে, একবার যে পাষাণী হয়েছিল, তাকে আবার মানবী করারূপ দ্বিতীয়বার শাস্তি দেবার কি সঙ্গত কারণ ছিল। মানুষকে যখন মরতেই হবে, তখন একবার এবং একেবারে মরাই ভাল। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা বেঁচে উঠে আবার যে-কি-সেই হয়েছিলেন,—অমরত্ব লাভ করেন নি। রামায়ণে শুধু এক ব্যক্তি অমর হন ; এবং তাঁর নাম বিভীষণ—এরূপ হবার কারণ এই যে, পৃথিবীতে অমরত্ব একটা বিভীষিকা মাত্র। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অহল্যা বেচারিকে দোকর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে, রামচন্দ্র তাঁর বিশেষ কোন উপকার করেন নি ; মাঝ থেকে দেশের একটি মহা ক্ষতি করে গিয়েছেন। পাষাণী অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণের সঞ্জীবনী-স্পর্শ না পেলে, এদেশে এমন একটি Statue থেকে যেত, যার রূপের তুলনা মর্ত্ত্যে ত দূরে থাক অমরাপুরীতেও নেই। তাহলে গ্রীসের দেবীমূর্ত্তির উপর ভারতবর্ষের মানবীমূর্ত্তি টেক্কা দিতে পারত। শুধু তাই নয়—আর্ট realistic কি idealistic—এ পণ্ডিতী তর্কটাও

উঠত না। কেননা আমরা ঐ নমুনা চোখের সুমুখে রেখে সেই আর্টের চর্চ্চা করতুম—যা একাধারে ও দুইই। যা পরম সুন্দর তা যে ভগবানের সৃষ্টি,—এই পরম সত্যের সাক্ষাৎ আমরা চর্ম্ম-চক্ষেই লাভ করতে পারতুম।

৩০শে বৈশাখ।

বীরবল।

দুখানি চিঠি।

(চিঠি লেখাটা একালের এবং বিশেষ করে ইউরোপের সামাজিক রীতি। এর কারণও স্পষ্ট ;—পোষ্ট আফিসের সৃষ্টির পূর্ব্বে একখানি চিঠি পাঠাতে যে অর্থ-ব্যয় হত, তাতে একালে ইহজীবনের মত ডাকটিকিট কেনা যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য খুঁজেপেতে আমি দুখানি মাত্র "লেখ্যর" সন্ধান পেয়েছি। একখানি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে, আর একখানি দামোদর গুপ্তের এমন একখানি স্বনামধন্য কাব্যে, যার নাম উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বারান্তরে এই চিঠি দুখানি মায় বঙ্গানুবাদ পাঠক সমাজের নিকট পেশ করব। এই নমুনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেকালে চিঠি লেখা ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপেই সারা হত,—সম্ভবতঃ এই কারণে যে, সে যুগে কাগজেরও বিশেষ অনটন ছিল।

এই পোষ্ট আপিসের যুগেই চিঠি লেখাটা যে সর্ব্বসাধারণের কস্ত হয়েছে, শুধু তাই নয়—কারও কারও হাতে তা একটা বিশেষ আর্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপের অনেক বড় লেখকের চিঠি সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজ কবি Byron, জর্ম্মাণ কবি Heine, এবং ফরাসি নভেলিষ্ট Flaubert-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আসন এঁদের কারও চাইতে নীচে নয়। এই বিশ্বাসের বলেই আমি তাঁর বহুকাল-পূর্ব্বে লেখা দুখানি চিঠি প্রকাশ করছি। বলা বাহুল্য এ ধরণের চিঠি ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা হলেও তা সাধারণের সম্পত্তি। এ চিঠি দুখানির একটু বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের "ছবি ও গান" ও "মেঘদূত" কি অবস্থায় ও কি মনোভাব থেকে লিখিত, এই চিঠি দুটিতে পাঠক তার পরিচয় পাবেন।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।)

(১) শান্তিনিকেতন
বোলপুর।
প্রমথ ২১ মে, ১৮৯০।

আমি কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকালবেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস-পাইপ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয়—কতকটা সেইরকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে, এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়; কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয়, তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না, কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিস। কেবল কথোপকথন নয়,—খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এইরকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ করে' অল্প মূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে, এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জন সুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে—কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায়, কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করে না। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার কোন আবশ্যক ছিল না—কিন্তু উপমাটা নাকি এল, সেই জন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল—অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও!"

তোমার সম্বন্ধে যা বলবার, অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরে না ;—সংক্ষেপে, তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল—হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম ; তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকা-বকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে, চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না,—সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে ; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়—অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয়, সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আস্‌তে পার, তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘটতে পারবে। এখানে বই বহুবিধ আছে ; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। ·এখেনে গদি-দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বসবার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোনরকম ব্যাঘাত ঘটবে না। তুমি চুয়োডাঙ্গার যেরকম বর্ণনা করেছ, তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভূগোলের" অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধু ধু করচে—মাঝে মাঝে এক একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন—মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে—মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘন বনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে

আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে এক একটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ— মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে, কালো হয়ে, কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মত বেরিয়ে রয়েছে। উত্তর দিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে—সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুকরো ও কাঁকরে আবৃত—তাতে ছোট ছোট বুনো জাম, বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরল ভাবে শোভা পাচ্চে—তারি মধ্যে মধ্যে ঝরনা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়—শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের-অন্তরাল-হতে-দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে, নিভৃত মহিমায় বিরাজ করচে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাল লাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে

পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধহয় এ রকম অবস্থা হয়—

"উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে—তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep-delved 'heart'.

আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যা-

ত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelley-র Skylark, আর একটা হচ্চে Wordsworthএর Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার, এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে,—অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে)—পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে, এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না, এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ—"আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে

অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত—যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আসচে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্। আজকাল একটু আধটু লিখতে আরম্ভ করেছি—কাছে থাক্‌লে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

২৪ মে, ১৮৯০।

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজ্‌বুৎ ভারিগোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম—ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল—এখন শরীরমন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়—বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ডভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে

হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধূলো,—শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে, অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে—তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে—সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে—কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি—সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুর্‌পাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান—ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্যরীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারে না, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এ রকম অশিষ্টাচরণ সত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বারগৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে—কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে—অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না—এই

জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপ-গ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপন করে বিচিত্র নদী, পর্ব্বত, বন, গ্রাম, নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়—সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে—সেইখানে চরম বিশ্রাম—সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাক্‌লে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই—রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতা-সুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে, রীতিমত Oriental রাজ-মাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক্" হয় না—একটা দক্ষিণে ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হত—কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি—মনটা উদাস হয়ে আছে,—আমাদের একবার মেঘের মত মহা স্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্‌ত! আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্চে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না—তবুও আমি বন্ধ হয়ে আছি, ছুটি পাচ্চি নে! আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়—আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই—সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য

আজকের এই মহা দুর্য্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে—আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায়, মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আস্‌তুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল, এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;—চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নব বর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে, এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জের ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে—দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে—সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে—রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে, সুচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল, তাহলে এ সব দেশ না দেখে কি যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল, তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত—যক্ষ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর হয়, তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিক্‌সম্প্রদায় থাক্‌ত, তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত—তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্‌, ড্রামাটিক্‌, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্‌, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি

ক্রিটিক্‌দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি, যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্, আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে—ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বল্‌চি, dramatic হয় নি,—কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে—যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল, সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশ দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস কর্‌ত, তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল—এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্ত্তী ষ্টেষনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল—এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয় নি—কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন, তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বল্‌তে পারি আমি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়—এমন কি প্রণয়িণী কাছে থাক্‌লেও হয়—কবি নিজেই লিখেছেন—

“মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িণীজনে, কিং পুনর্দূর সংস্থে!”

অর্থাৎ মেঘলা দিনে প্রণয়িণী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়—দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে—কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে

হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্য্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে, অন্ধকার হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারি নে। পোষ্ট অফিস এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই—তাই জন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে, আর্দ্রতন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকেন না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে, মুড়ে, টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, তার পরে নিশ্চিন্ত মনেস্নানাহার করেন। এমন কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিশের বন্দোবস্ত হয় নি, তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল—তাই

"প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না!"—

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে করোনা আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে, চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্ অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্ অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে, যখন মেঘদূত বা কোন প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি—তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহশয়ানে বিলীন হয়ে থাকে, এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি—তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্, বিদেশেই থাক্, এবং ভালবাসা যেমনই থাক্—

সকলেই বেশ comfortably কাল যাপন করচে, এটা কিরকম গল্পোপযোগী শোনায়!—বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে—বাতাস বচ্চে, এবং সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসুচে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি—দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি—চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না—কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে, এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হচ্চে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধূ ধূ করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম দশা; সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য লক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তারি স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,—প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন—তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দ—সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়—বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না।—তাই আশঙ্কা হচ্চে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়।

চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্চে ঐ—বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধ্যের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়—উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জ্বেলে একলা বসে যে চিঠিটা লেখা হয়, সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর, তাহলে কিরকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—চুরি ক'রে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয়, এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানের" কথা আছে—বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে-সকল কবিতা লিখচি, তা' "ছবি ও গান" থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা ত পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁকবে না—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্ম-বিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্ট কাল বেঁচে থাকি, তাহলে এমন

একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে, এবং তাদের ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে—অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল—কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই—এতটি জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর, সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়—এর কথা আর শেষ হয় না—অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

* * * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন ও পুরাতন।

—:*:—

আজ যেটাকে আমরা পুরাতন বল্‌ছি এমন একদিন গিয়েছে যখন সেটা নতুনের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তরুণের বুকে বুকে পুলক সঞ্চার করে' গিয়েছিল—আর আজ যেটাকে আমরা নতুন বল্‌ছি এমন একদিন আস্‌বে যখন সেটাকে আপনা-আপনি পুরাতনের জীর্ণকন্থার অন্তরালে ধীরে ধীরে লুকিয়ে যেতে হবে। তাই আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি পুরাতন খালি পুরাতনই নয়—নতুনও খালি নতুনই নয়। পুরাতনের সার্থকতা নূতনেই আর নূতনের জন্ম পুরাতনেই। এই সত্য দেখ্‌তে পাচ্ছি বলেই, আজ আমরা নতুনকে আলিঙ্গন কর্‌তে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত নই। যে ক্রমাগত যুগ যুগ ধরে' আমাদের দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে আমাদেরও তার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে নইলে আমাদের সত্যিকার মিলন কিছুতেই হবে না। তাই আমরা আজ নতুনেরই হাত ধরে', বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে যে বিদ্যুৎ ছুটছে, হৃদয়ের তলে তলে যে রক্তধারা বইছে তারি তালে তালে চল্‌ব। এ নতুন যে আমাদের সেই পুরাতনেরই দান। এ দান অগ্রাহ্য করে' পুরাতনের অপমান কর্‌তে আমরা পার্‌ব না।

এই নতুনকে যারা অগ্রাহ্য কর্‌বে, তারা নিজেকেই অগ্রাহ্য কর্‌বে —আর যারা নিজেকে অগ্রাহ্য কর্‌বে তারা অপরের দ্বারা গ্রাহ্য হবে না, নিশ্চয়। তাদের দিকে তাকিয়ে সবার আগে হাস্‌বে সেই

পুরাতন যাকে তারা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল। পুরাতনকে সনাতন করে' যারা জীবন কাটাতে চাইবে তাদের জীবন কাট্‌বে বটে কিন্তু তাদের মহত্ত্ব কোন দিনই ফুটবে না। আর তাদের ঘরে লক্ষ্মীই হ'ন সরস্বতীই হ'ন কোন দিনই আস্‌বেন না। কারণ দেবদেবীদের সবারই চিরযৌবন। তাঁরা আসেন সেইখানে যেখানে তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ দিয়ে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। আর তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ নতুনের মধ্যেই আছে। পুরাতনের মধ্যে যা আছে সেটা প্রাণের আনন্দ নয় সেটা হচ্ছে প্রাণের আরাম। আর আরাম জিনিসটা আনন্দের ঠিক উল্টো দিক।

পুরাতনই যে সনাতন নয়—বরং সনাতন, পুরাতন ও নূতন এ দুটোকে নিয়ে—এ যারা বুঝ্‌বে জগতে জয় হবে তাদের। আর যারা পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে "অচলায়তন" গড়ে' তুল্‌বে তারা মানুষের অমর্য্যাদা কর্‌বে, এ-সৃষ্টির অমর্য্যাদা কর্‌বে—তাদের ভাগ্যে যা মিল্‌বে সেটা ইহলোকেরও ভুক্তি নয়, পরকালেরও মুক্তি নয়। কারণ ভুক্তি'ও মুক্তি এ দুটোই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে।

আজ যে আমরা পিছনে পড়ে আছি তা আমরা, নতুনের সঙ্গে পা ফেলে' ফেলে' চল্‌তে পারি নি বলে, নতুনের ডাক শুনি নি বলে'। পুরতনেরই গায়ে সিঁদুর চন্দন ঘসে' ঘসে' তাকে আমরা উজ্জ্বল করে' রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি—সে পুরাতনের ভিতর থেকে যে কখন প্রাণ বেরিয়ে গিয়ে সেটা ধীরে ধীরে "মাম্মিতে" পরিণত হয়েছে তা আমাদের চোখেই পড়ে নি। পুরাতনকে সনাতন করে' আমরা মনুষ্যত্বকে আয়ত্ত্ব কর্‌বার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পুরাতনের অত্যাচারে, পচা সিঁদুর আর চন্দনের গন্ধে "মানুষ" যে কখন আমাদের ভিতর

থেকে বেরিয়ে পড়ে' কোথায় চম্পট দিয়েছে তা আমাদের লক্ষ্যেই আসে নি। আমরা মনে করেছি—বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে, সমাতন-ত্বের বাতিটা আমরাই ঠিক জ্বালিয়ে বসে' আছি।

এই নূতনের বার্ত্তা যেখানে যেখানে মান পায় নি সেখানে সেখানেই মানুষের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অপমান। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বড় বড় উদাহরণ আছে। আমরাও যদি এই নতুনের বার্ত্তা না শুনি, এই নতুনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে' চল্‌তে না শিখি তবে এমন একদিন আস্‌বে যখন আমরা জাতিকে—জাতি এ ধরাধাম থেকে চলে যাব—আর সেটা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে' নয়—সজ্ঞান-দুঃখ ভোগ করে' করে'।

যারা নতুনের মধ্যে কোন সত্যেরই সন্ধান পেয়ে ওঠে না তারা যে এ জগতটাকে অসত্য বলেই ঘোষণা কর্‌বে তা'তে আর বিচিত্র কি? কারণ তাদের কাছে সত্য আর কোথাও নেই, শুধু এক শূন্যে ছাড়া। যেহেতু শূন্যেরই কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর যারা শূন্যেই তাদের সব সত্য প্রতিষ্ঠা করে' বসে' আছে তাদের যে এ জগতে লাভের ঘরে চারিদিক থেকে খালি শূন্যই জমা হবে সেটা নিতান্তই ন্যায় বিচার। তাদের কথায়, আচারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মর্ম্মে শুধু সেই শূন্যই রকমফের হ'য়ে ফিরবে। এই শূন্যকে পুঁজি করে' কোন জাত কোন দিন বড় হ'তে পারে নি। আর গণিতশাস্ত্রের এ কথাটা ত সবারই জানা আছে যে যত কোটীই হোক্ না কেন তাকে শূন্য দিয়ে গুণ কর্‌লে তার যা গুণফল হয় সেটা শুধু শূন্য।

নূতনের মধ্যে আমরা কোন সত্যকে দেখি নে বলে' আমরা শৈশবকে হাস্‌তে দিই নে কৈশোরকে খেল্‌তে দিই নে, যৌবনকে

চঞ্চল হ'তে দিই নে। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্যেই যে চঞ্চলা বসে' আছেন জগতের ইতিহাসে এটা এ পর্য্যন্ত কোথাও অপ্রমাণিত হয় নি। শিশুর মুখের হাসি শুখিয়ে উঠ্‌লে, কৈশরের বুকের নৃত্য থামিয়ে দিলে, যৌবনটা অচঞ্চল হ'তে বাধ্য। কিন্তু সে অচঞ্চলতা বিরাটও নয় স্বরাটও নয়। সে অচঞ্চলতা হচ্ছে আনন্দহীনের, প্রাণহীনের—সুতরাং অক্ষমতার। আমরা যে শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা পুরাতনের খোলস্ পরিয়ে দিই, সেটা শিশু যৌবনে পৌঁছিলে তার গায়ে এমনি করে এঁটে বসে, যে তা'তে মরণ-পথের যাত্রীর যতই সুবিধে হোক্ না কেন জীবন-পথের যাত্রীর পক্ষে সেটা মস্ত অবিচার। যৌবনে যে আনন্দহাসি প্রাণে প্রাণে খেল্‌ছে তা খসিয়ে নিয়ে মানুষকে বার্দ্ধক্যের আরাম-প্রয়াসী করে' তুল্‌লে এ জগতের কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা ত তাকে পীড়া দেবেই—এবং বিশ্বব্যাপী এই বিরাট লীলা তার চোখে অসত্যই হ'য়ে উঠ্‌বে, আর নির্ব্বাণ মুক্তি-টাই যে আকাঙ্খ্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা আমরা চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু সবার চেয়ে আশার কথা হচ্ছে এই যে, জগতের ইতিহাসে নতুনের পরাজয় কোন খানে হয় নি—আর সেই নতুনের ডাক আজ বাংলা দেশে এসেছে। এই নতুনের ডাকে বাংলাকে সাড়া দিতেই হবে—কারণ নতুনের যে শক্তি তার মধ্যে গতি আছে আর জীবন্ত মানুষ গতিই চায়। আর গতিশীল মানুষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। যদি বা কোন ক্ষতি হয় তবে সেটাকে গতির বেগে একদিন—না—একদিন ভেসে যেতেই হবে—কিছুতেই চিরকাল টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই আমরা গতির এত পক্ষপাতী। গতির

খাতায় মানুষের লাভ-লোকসানের জমা-খরচে কখনও ফাজিল দাঁড়ায় না।

তবুও পিছনে পড়ে' থাক্‌বার জন্যেই যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা থাক্। তাদের টেনে চল্‌তে গেলে রাস্তার ভারই বাড়বে, গতির বেগ বাড়্‌বে না কিছুতেই। বিশেষতঃ এই যে পিছনের টান—এই যে পুরাতনের শক্তি তা আপনার অজ্ঞাতসারে নতুনকে অগ্রসর করে' দেওয়ার এত সাহায্য করে' যে আর কিছুতেই তেমন করে না। গান কর্‌তে কর্‌তে যেমন গলা খোলে, বিপরীত শক্তিকে পরাভূত কর্‌তে কর্‌তে তেমনি শক্তি খোলে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পুরাতন যেরকম বাধা বলেই মনে হোক্ না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে নতুনকে সাহায্য করেই চলেছে। সুতরাং পুরাতনের যে শক্তি তা থাকা শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, তা অত্যন্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

প্রথমে এই নতুনকে অল্পকয়েকজনই আলিঙ্গন কর্‌বে। কারণ প্রথম প্রথম নতুনের যে শক্তি তাতে ভার চাই নে—তাতে চাই ধার। নতুন বোঝা নয়। সে ভার দিয়ে পুরাতনকে চেপে রাখ্‌তে চায় না। সে চায় ধার দিয়ে পুরাতনের বন্ধন কেটে দিতে। এক এক করে' যখন পুরাতনের সমস্ত বন্ধন কাটা পড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব্ব-অর্জ্জিত সংস্কার থেকে সে মুক্ত হবে তখনই—আর সত্যও দেখ্‌তে পাবে সে তখনই। আর যে দিন সত্য দেখ্‌তে পাবে সে দিন পুরাতন হাসি মুখে এসে নতুনের পাশে দাঁড়াবে ও গৌরব করে' বলবে—নতুন, সে ত আমিই গড়ে তুলেছি—সে ত আমারই দান।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাদ্র, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৩৪

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সঙ্গীতের মুক্তি।

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সঙ্গীত-সঙ্ঘ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফরমাস এই যে, দিশি বিলাতি কোনটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটি মাত্র যোগ্যতা আমার আছে। তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।

তা বলিয়া জানি না বলিতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সঙ্গীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কি রকম সেটা একটু খোলসা করিয়া বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক, ব্যবসায়ীর জানা, আর এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।

এই নাড়ি নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্ব্বদাই একটা ভয় থাকে, ঐ নাড়িনক্ষত্র পদার্থটা না জানি কি! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি নক্ষত্রের দোহাই দিয়া অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়া রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্ত্তমান যুগের প্রধান সর্দ্দার হচ্চে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে "অধিকাংশ।" অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলিবার অধিকার আছে। এমন কি, তার অধিকারই বেশী। যে বলে আমি জানি সেই কেবল কথা কহিয়া যাইবে, আর যে জানে আমি জানি না সেই চুপ করিয়া যাইবে এখনকার কালের এমন ধর্ম্ম নহে। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলিব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলায় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের অনেক মত কেননা তাদের রাস্তাই নাই। তাই বহু সেয়ানার এক প্রতিনিধি চলে কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যত-গুলিই মানুষ ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব নিকাশের সময় হয়ত দেখিবেন আমার মতের মিল একব্যক্তির সঙ্গেই আছে, এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশী। কেননা, পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই, সে দিক দিয়া যে চলে সে-ই বেশী দেখে বেশী ঠেকে। আমি পথ জানিনা বলিয়াই হোক্ কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক্ এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেই জন্যই হয়ত মনোরম হইতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে-মানুষ রচনা করে

আর যে-মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত বাধাও হইতে পারে আবার সুয়েজ ক্যানালের মত সুযোগও হইতে পারে। তবু যাই হোক্, উপসর্গ বাড়িলে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্ত মত সমাবেশ, সংসারে এইই ত যথেষ্ট দুর্লভ—তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড় কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেক খানি জায়গা জুড়িয়াছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশী খাতির করিতে হয় তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সঙ্গীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ বড় কি রাধা বড় এ তর্ক শুনিয়াছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড় কি না এই তর্কটা বাড়িল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে-ই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে পড়িয়া, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা ত মাটির মানুষ, কিন্তু আমলা! তার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো! নিজের "রাজ-কর্ম্মচারী" নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরো-

ক্রেসি উচুদরের জিনিস হইতে পারে না। আমাদের সঙ্গীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটিল।

এইখানে য়ুরোপের সঙ্গীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-পলিটিক্সের তফাৎ। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশী বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্ত্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গান-সম্বন্ধে যে-কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখ্‌রা করিয়া লইয়াছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্ত্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে-মানুষ গান বাঁধিবে আর যে-মানুষ গান গাহিবে দু'জনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে ত রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে-গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয় তাহা যে তখন-তখনি জীবন উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে এটা অনুভব করিলে

শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্ত্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হইয়া থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে। এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিলিত গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত লড়াইয়ের নয়। তখন এমন সকল শ্রোতাও নিশ্চয় ছিল যাঁরা সঙ্গীত ভাট-পাড়ার বিধান যাচাইয়া গানের বিচার করিতেন না। কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।

আমাদের কালোয়াতি গানের এই যে রাগরাগিণী ইহার রসটা কি? রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রং। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ

কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরেজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ দুইই বোঝায়। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রং, সেই রংটা রাঙা। ওটা রক্তের রং, হৃদয়ের নিজের আভা।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। ভোর-বেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু-একটা আছে, যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্ব্বচনীয়। যাহা নির্ব্বচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দ্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। এই বেশীটুকুই তার সঙ্গীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিলরে দুলিল
মানস সরসে রসপুলকে;
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে;

গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হইল—ভাষার একেবারে উলট পালট হইয়া গেল। যার রূপ নাই সে রূপ ধরিল, যার রূপ আছে সে অরূপ হইল। এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিতেছে কোথায় ? সৃষ্টি যেখানে অনির্ব্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়াইয়া যাইতেছে।

আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্ব্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড় বড় আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। যখন কল হয় নাই তখন কলিকাতায় গঙ্গার জল যেমন করিয়া জালায় ধরা হইত। যজ্ঞকর্ত্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেষণ করিতে পারেন কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হইতে সেটা বহিয়া আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোর বেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা ; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি ; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা ; মুলতান যেন

রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস ; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাসতা নাই তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নর নারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, তাহা সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা, দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইসারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী বলিয়া চলে সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলিতে থাকে, অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল করিয়া যে-মূর্ত্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে।

আমাদের বেদমন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্ম্মর-ধ্বনির মত, মহাসমুদ্রের কল-গর্জ্জনের মত। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে এই কথাগুলি এক-দিন দুই দিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখ দুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।

মহাকাব্যের বড় কথাটা যেখানে স্বতই বড়, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোট করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু যেখানে আবার সঙ্গীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলি বলিতে থাকে আমি কেহই না, আমি কিছুই না; আমার মহিমা সুরে। এই জন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুসি-তাই। এই যে পূরবীর গান—

"লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া
ক্যয়সে ধঁরু মেরে শিরো পয় গাগরিয়া।"

এর মানে, শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার "বিড়ে"টা চুরি করিয়াছে। এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড় সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধিবামাত্র মন বলে, এই যে কলসী এই যে বিড়ে, এ ত সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি, যার দাম বলিবার মত ভাষা জগতে নাই, যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিস নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই

আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া, যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারি যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগরাগিণী যদিবা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়। আমাদের হাল ফেশানের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা লইয়া আমাদের সঙ্গীতের গভীরতা। এই সব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়,—উত্তেজনা বল, উল্লাস বল, পরিহাস বল, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বল, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে নির্ব্বিকার ভাবে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহারা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিম্বা অসুবিধা আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলি অমৃত পান করিতেছেন কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যেরা উৎপাত না করিলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠিত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে পারেন কিন্তু সেখানে ফুল গাছের একটা চান্‌কাও তাঁরা বদল করিয়া সাজাইতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্ত্ত্যলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি,

বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চিরসম্পূর্ণ। এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্ত্যলোকের দুঃখ সুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তার স্বরগুলিকে কাটা-কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানা প্রকার হৃদয় ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তা হইলে হৃদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এটা কেমনতর? যেমন দেখা গেছে, খুড়তত, জাঠতত, মাসতত, পিসতুত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতির বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হইয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার হইতে বাহির হইয়া জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজভাবে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছে। আগে সে পরিবারের ঠেলা গাড়িতে পূর্ব্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধি-বরাদ্দমত হাওয়া খাইত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নাই। বাঁধন-ছাড়া সুরগুলো যে-গানকে গড়িয়া তোলে তার খেয়াল নাই সে কোন্ শ্রেণীর, সে এই জানে যে "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।"

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে নিজের আশা

আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়া আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করিতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত। তা হইলে, যা-কিছু আছে তাহাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। শাসন-তন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক্ তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির

অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকিল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কার্ত্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে।

"আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন-জাগরুক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখিতেছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

হয়ত সেও চলিতে সুরু করিয়াছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাইবে না। একদিক হইতে দেখিলে মনে হয় যেন

গানের আদর দেশ হইতে চলিয়া গেছে। ছেলেবেলায় কলিকাতায় গাহিয়ে বাজিয়ের ভিড় দেখিয়াছি; এখন একটি খুঁজিয়া মেলা ভার, ওস্তাদ যদি বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরো কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্য্যন্ত সবল অবস্থায় টিঁকিতে পারে এমন ধৈর্য্য ও বীর্য্য একালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড় বড় মজ্‌বুৎ জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে। এমন কি হাল্‌কা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙিবার বেলায় বড় জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষে। অন্ততঃ তার ধারা আর সচল নাই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন করিয়া তৈরি হইত এখনো তেমনি করিয়া হয়। কেননা প্রাচীন স্থাপত্য যে সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে-জীবনযাত্রা কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন করে তার কোনো বদল হয় নাই।

আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাট-সভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য-সঙ্গীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিঁকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নহে। তার উপরেও আর একটা বৃহৎ লোকস্তর জমিয়া উঠিতেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটিল। চিরাগত প্রথার খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলায় না। তাহা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ

দিয়া চলিতেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রহিল না, বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যে দিকে জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সেদিকের মত হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হইবে।

এই যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে ইহার কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই একদিকে গান-বাজনার পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনি আদরও দেখিতেছি। আজকাল ঘরে ঘরে হার্ম্মোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট। ইহাতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দিবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভাসিয়া ওঠে। সেই গাদ কাটিতে কাটিতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্ম্মল হইয়া আসে। আজ টগ্‌বগ্ শব্দে সঙ্গীতের সেই গাদ ফুটিতেছে ; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার দরকার নাই। সু-খবরটা এই যে চিনির জ্বাল চড়ানো হইয়াছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দ্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের কাটৃতি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।

পূর্ব্বে ছিল দস্তুরের মই দিয়া সমতল করা চষা জমি। এখন তাহা ফুঁড়িয়া নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। ওস্তাদের ইচ্ছা ইহা-

দের উপর দিয়া দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান্ খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সহিতে পারে না। শাসনকেই সে বড় বলিয়া জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড় বেগ। তাকে ইণ্টারন্ করিয়া যদি সলিটরি সেল্-এর দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করিতেই চায় দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড় যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হল্‌দে হইয়া যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।

এইবার এই বর্ত্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দুই একটা কথায় বলিয়া লই। কেননা গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছি তা ঐ অঞ্চল হইতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে-মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ এখনকার কালে সে-দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড় নাই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু

বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীত রচনাতেও সুরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। কিন্তু পরমাণু দিয়া গাছের বিচার হয় না, কেন না তারা বিশ্বের সামগ্রী, এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তারাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনিতে শুনিতে যখন অভ্যাস হইয়া আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বরসংস্থানটা রূঢ়ী নয় ইহা যৌগিক। তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়।

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রী ইঁট সাজাইয়া ইমারৎ তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়া যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিম্বা মহল দেওয়া যাইত তবে ইমারৎ গড়ায় তার নিজের বাহাদুরী তেমন বেশী থাকিত না। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মত হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তি-গত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মত হইলে তাদের দিয়া জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমা-

দের দেশের গানের ঠাট এক-একটা বড় বড় ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুক্‌রাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্‌ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেক-খানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি লক্ষ্য থাকে তবে এই বাঁধন আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর-একদিকে বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোস করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য-লাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটিয়াছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটাইয়া লইতে হইবে, সেও কাজে লাগিবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যে-ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন, যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য্য দান করিতেছে। যে-দেশে পাহাড়-গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে সেখানে পার্ব্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি

আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক্ না কেন, রাগ-রাগিণী সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে', রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে কিন্তু তবুও তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই টুক্রা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা

আমাদের মন হইতে যায় না। এমন কি, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটিয়া ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব লইয়া ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মত কিম্বা কন্সর্টের তারস্বর গৎগুলার মত নীরস খাপছাড়া হইবে না, তাহা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে। তাহা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখিবে অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করিবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে-হার্ম্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, "না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।" কিন্তু হার্ম্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয়, যে, যে-দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্র-চিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্ম্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে।

তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্ম্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্দ্ধা হইবে। আমা-

দের দেশে ঐ বড় সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থাকিয়া চারিদিকে খুব করিয়া ডালপালা মেলিয়াছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করিলে তাকে মারা হইবে। শীতদেশের মত অত্যন্ত ঘন ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখিতে হইবে তারা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।

বসিয়া যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারি হইলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করিতে হইলে বোঝা হাল্কা করা চাই। লোকসান না করিয়া হাল্কা করিবার ভালো উপায় বোঝাটাকে ভাগ করিয়া দেওয়া। আমাদের গানের বিপুল তান-কর্ত্তব ঐ হার্ম্মনি বিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা পায় অথচ তার গতি-পথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বহিয়া রাজাকে যদি চলিতে হয় তবে তাহাতে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানাস্থানে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বই কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ঐদিকে চালান করিয়া দিতে পারি। যাইহোক্ আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এইদিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক্ কাল হোক্ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।

সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল ; আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখ, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্ত্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝে হইতে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড় করিতে হইয়াছে কেননা মাঝারির হাতে কর্ত্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশী ছাড়া পাইয়াছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকাইয়া না চলে তবে ত সে নাস্তানাবুদ্ করিতে পারে। কর্ত্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশী কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হইয়া কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুল-চেরা হিসাব দাখিল করিতে হয়। সেখানে কণ্ট্রোলার আপিস কেবলি খিটখিটি করে এবং কাজ চালাইবার আপিস বেজার হইয়া ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো

মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরেতালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তাহা হার্ম্মনি বিভাগে গানের অন্তরঙ্গ রূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক্ আমার গানের কথাটি এই :—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।

দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কি মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুসী ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন্ এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাত মাত্রার পর "নিল কায়া" এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না—যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত, যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর।" এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক

রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব ?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবশুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নাই। যেমনঃ—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৩+৪+৩=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও!" আমি ত বলি এটা বেআইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই ঃ—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কি গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চল খানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহ সাগরের কূলে।

এটা যে কি তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন

তালের সৃষ্টি করা যাক্ তবে আর একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
 সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
 সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
 আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
 মহা পারাবার পারায়ে
ফিরিল না আর তরীতে
 আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
 কি ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

এও নয় মাত্রা কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক্ :—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পুরিল পুলকে
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন ভিৎে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক্।

দুয়ার মম পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।

শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ পাখী!
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

এও ত আরেক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উল্টাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে ন'য়ের ছন্দকে লইয়া নয় ছয় করা যাইতে পারে। চৌতাল ত বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই ত বারো মাত্রা:—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুমুরুমু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল ছায়ে
নূপুর রুমুরুমু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাৎ চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

এই ত গেল সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব। আবার বাহিরে একদল বলবান লোক আছেন তাঁরা সঙ্গীতকে দ্বীপান্তরে চালান করিতে পারিলে সুস্থ থাকেন। শ্যামের বাঁশির উপর রাগ করিয়া রাধিকা যেমন বাঁশবনটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপাড়িতে চাহিয়া ছিলেন ইঁহাদের সেই রকম ভাব। মাটির উপর পড়িলে গায়ে ধূলা লাগে বলিয়া পৃথিবীটাকে বরখাস্ত করিতে ইঁহারা কখনই সাহস করেন না কিন্তু গানকে ইঁহারা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করেন এই সাহসে যে, তাঁরা মনে করেন, গানটা বাহুল্য, ওটা না হইলেও কাজ চলে এবং পেট ভরে। এটা বোঝেন না যে, বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্যে নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য যাহাতে আত্মা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে;—কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোন সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। সেই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য।

সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা, তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ বিলাস হয় তবে তাহাতে নির্জ্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্ব্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে।

এতদিন আমাদের ভদ্রসমাজ গানকে ভয় করিয়া আসিতেছিল। তার কারণ, যা সকলের জিনিস, ভোগী তাকে বাঁধ দিয়া আপনার করাতেই তার স্রোত মরিয়াছে, সে দূষিত হইয়াছে। ঘরের বদ্ধ বাতাস যদি বিকৃত হয় তবে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তার যোগসাধন করা চাই। ইহাতে ভয় করিবার কারণ নাই, কেননা ইহাতে বাড়িটাকে হারানো হয় না। আজকালকার দেশাভিমানীরা ঐ ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরকে পাওয়াটাই আপনার বাড়িকে হারানো। যেন, যে-হাওয়া চৌদ্দ-পুরুষের নিশ্বাসে বিষিয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার নিজের হাওয়া, আর ঐ বিশ্বের হাওয়াটাই বিদেশী। এ কথা ভুলিয়া যান ঘরের হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের হাওয়ার যোগ যেখানে নাই, সেখানে ঘরই নাই সেখানে কারাগার।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র তারা চলে না—দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া

দিতে হইবে। তা সে কি গানে, কি সাহিত্যে, কি চিন্তায়, কি কর্ম্মে, কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে! এই ছাড়া-দেওয়াকে যারা ক্ষতি-হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারে বসিয়া উপবাসী। যারা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া রাখে তারাই রাখে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী-স্ত্রী।

শাস্ত্র আর দেশাচারের সমবেত চেষ্টা এবং নিশ্চেষ্টতার ফলে আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির মানসিক গতি ও পরিণতি যে ধারা অনুসরণ করে চলেছে—তাতে আমরা সবাই খুব খুসী, এবং ঘরে বাইরে তা নিয়ে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করতেও অল্প বিস্তর ব্যগ্র। ব্যাপারটাকে তর্কের অতীত করে', পদ্যের ছাঁদে বেঁধে আমরা বলে' থাকি,—

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা,
কোথা দিতে তাদের তুলনা ?"

উপরের চরণের "রূপবতী" কথাটাকে "চ-বৈ-তু-হি"র দলে ছেড়ে দিলে আশা করি কারো বিরাগ-ভাজন হবার আশঙ্কা নেই। আর, তাহলে বাকী যা রইল তার মানে দাঁড়াল এই যে—সাধুতা আর সতীত্বে ভারত-ললনা জগতে অতুলনীয়া। কিছুদিন আগেও যে দেশে ধরে বেঁধে "সতী" করবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে দেশের পক্ষে এমন ধারা দা'বী একেবারে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! পাতিব্রত্য যে হিন্দুরমণীর পক্ষে একটা জাতিগত সংস্কার এবং জন্মগত উত্তরাধিকার, সে কথা মেনে নিয়েই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

তবে, এ সব বিষয়ে, আমাদের সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের তুলনা অনেকটা বকের বাড়ীতে শেয়ালের নিমন্ত্রণের মতই অশোভন ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভূতপুর্ব্ব শাস্ত্রকারগণের অতিমাত্র শৃঙ্খলা-প্রিয়তার ফলে সমাজে স্ত্রী-জাতির পক্ষে কার্য্যতঃ যে লক্ষ্য এবং সাধনা সেকালে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, তা বহুকাল-ধরে আমাদের "সনাতন জড়তার" ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে এখন যে আকার লাভ করেছে সেটা অপর সকল সভ্যসমাজ থেকে ভিন্ন রকমের!

"সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো" মনে করে' আমরা ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রী-জাতিকে "স্ত্রী"র জাতিতে পরিণত করেছি! স্ত্রীত্বেই তাদের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ; বর্ণমালার অনুস্বর বিসর্গের মত সদাই তারা আশ্রয়-স্থানভাগী; কোনো রকম স্বাতন্ত্র্যই তাদের প্রাপ্য এবং গ্রাহ্য নয়—এ কথা নানান্ রকমে তাদের শুনিয়েছি, পড়িয়েছি,—শিখিয়েছি, বুঝিয়েছি। আমাদের স্ত্রী-জাতিকে আমরা দেখি—বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের পুরুষ-জাতির মধ্যে যোজকের মত। ব্যাপারটাকে তর্কের সময়ে যতই আমরা আধ্যাত্মিক আভায় এবং সামাজিক সম্ভ্রমে ভূষিত করি না কেন, সে গৌরব অনুভব ও উপভোগ করবার মত মার্জ্জনা এবং স্বাধীনতা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির থাকে না।

শিশুকালে বর্ণসংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কণ্ঠস্থ করি—"স্বামী পরম গুরু", "বন্ধ্যা নারীর আদর নাই"!—এ রকম সব দাম্পত্য এবং পারিবারিক সত্য ও সিদ্ধান্ত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-হৃদয়ে মুদ্রিত করবার প্রথা আর কোনো দেশেই নেই।

তারপর শৈশব অতিক্রম কর্‌তে না কর্‌তেই রূপকথা, ব্রতকথা ও উপকথার উপদ্রবে নারী-জীবনের গণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের কাছে সংহত এবং সুনির্দ্দিষ্ট হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-জাতির মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রশ্নেরও সমাধি হয়—"হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা" দিয়ে!

এম্নি করে' নারীজাতির মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আমরা স্ত্রীত্বের বনিয়াদ্ পাকা করি! এ যেন প্রাণ দিয়ে চোখ বাঁচানো। পাতিব্রত্য অতি উপাদেয় পদার্থ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু মনুষ্যত্ব তার চেয়ে ঢের বেশী মহার্হ। যে স্ত্রীত্বের মূলে রয়েছে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব,—যা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়োগুণে স্ত্রী-হৃদয়ে স্বভাবতঃই ফুটে ওঠে নি,—পারিপার্শ্বিক প্রেরণা এবং অপ্রাকৃত উত্তেজনার ফলে গোটা মনুষ্যত্বই যেখানে বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়েছে সেখানে তা নিয়ে ঢাক ঢোল পেটানো বুদ্ধিমানের কাজ বলে ত মনে হয় না।—তরকারী হিসেবে বাঁধা কপি উপাদেয় হলেও গাছ হিসেবে সে যে অতি বিশ্রী!

আমাদের সমাজের আত্মবিস্মৃত স্ত্রী-জাতির এই তথাকথিত পাতিব্রত্যে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের কোনো মহৎ কল্যাণই সাধিত হবার সম্ভাবনা নেই! অভিজ্ঞতার উপরে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, ঘাত প্রতিঘাতে যার মেরুদণ্ড শক্ত হবার অবসর পায় নি, প্রতি পদে শাস্ত্র আর দেশাচারের উপর ভর দিয়েই তার জান্ বাঁচাতে হবে। নিজের চোখ যার ফুটতে পায় নি—শাস্ত্রের চোখে দেশাচারের চস্‌মা এঁটেই তাকে সব দেখতে হবে! রজ্জুকেও তার সর্প জ্ঞান করে তফাৎ থাকতে হবে—নৈলে সর্পে রজ্জুভ্রম হবার

আশঙ্কা! দুগ্ধপোষ্য মামাশ্বশুরকে দেখলে ঘোম্‌টার আয়তন তার বাড়াতে হবে; আর বাপের বয়সী ভাসুরের ছায়া স্পর্শ করলে "তেরাত্র" তাকে উপবাস কর্‌তে হবে! এই তার পক্ষে বিধি।

নন্দলাল বহুকষ্টে কিছুদিন তার ভীষণ পণ রক্ষা কর্‌তে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার বাড়া নিশ্চয়ই আর বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশের স্ত্রী-সমাজও শাস্ত্র আর দেশাচারের কল কৌশলে মরে বেঁচে পত্নীত্ব বাঁচিয়ে চলে বটে, কিন্তু তাতে "পতি নারায়ণ" ছাড়া আর কোনো দেবতাই প্রসন্ন হন না। "পতি-নারায়ণ"কে অযথা অবজ্ঞা করতে আমি বলিনে, কিন্তু তারি মোহে "সত্যনারায়ণের" প্রসাদ উপেক্ষা করলে—বিনি তুফানেও ঘাটে এসে ভরাডুবি হয় সে কথা ত "পাঁচালী"তেই লেখা রয়েছে! সাধারণ ভাবে সেই কথাটার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধেরও উদ্দেশ্য।

(২)

দাম্পত্যদায়িত্বে যে কর্ত্তব্যবিভাগ সাধারণতঃ আমাদের সমাজে দেখা যায়, সেটা কি সমাজ তত্ত্ব কি মনস্তত্ত্ব কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা চলে না। নিরুপায় স্ত্রীর স্কন্ধে সমস্ত নৈতিক দায়িত্বটা নিঃশেষে চাপিয়ে স্বামীর হাতে দেওয়া হয়েছে আর্থিক দায়িত্ব, আর সার্ব্বভৌমিক অধিকার। আমাদের সমাজে স্বামীদের নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান নেই—এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে তার অনুশীলন এবং সম্পাদন হচ্ছে স্বামীর খুসী—অর্থাৎ optional—এই কথাই আমি বিশেষ করে' বল্‌তে চাই। এ কথা আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও বলা

চলে। স্বামী উপার্জ্জনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হ'লে সমাজে কিছুই বলার থাকে না (স্ত্রীর ত' থাক্‌তেই নেই সে কথায়)।—খেয়াল হ'লেই স্বামী "সংসার" ত্যাগ করে' কোনো "আশ্রম" বা "আড্ডায়" ভিড়ে যেতে পারেন—আর তাতে সমাজের বাহবাও অনেক স্থলে তাঁর জুটে থাকে! কিন্তু স্ত্রীর বেলায় পান থেকে চূণটুকু খস্‌লেই প্রলয়! যে পথের কথা তার কাছে বাৎলে দেওয়া হয়েছে, তা' কাদাজলে যতই পিছল, আর কাঁটাবনে যতই দুর্গম হোক না প্রাণের দায়ে তা' থেকে একটু এদিক-ওদিক হলেই তাকে যেতে হবে একেবারে রসাতল!

জামাতা বাবাজিকে আশীর্ব্বচন লিখ্‌তে আমরা "নিরাপদ্ দীর্ঘ-জীবেষু"র চাইতে বেশী কিছু লেখা বাহুল্য এবং অনাবশ্যক মনে করি; কিন্তু বধূমাতার বেলায় "সাবিত্রী সমতুল্যাসু"র কমে কিছুতেই চলে না। কেবল আশীর্ব্বচন লিখ্‌বার বেলাতেই যে এমন ধারা পক্ষপাত তা নয়; দুর্ব্বচন প্রয়োগের সময়েও আদান প্রদানটা এই অনুপাতেই হয়ে থাকে! সে কালে নাকি যে পাপে শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা হ'তো ঠিক সেই পাপের দরুণই ব্রাহ্মণের নামমাত্র অর্থদণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো! একালে আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক দণ্ডও এই আইনেরই ধারা অনুসরণ করে' চলে। শাদা এবং স্বল্প কথায় বল্‌তে গেলে আমাদের সমাজে স্বামীর অপরাধের দণ্ড নেই,—আর স্ত্রীর দোষের মার্জ্জনা নেই! শুধু তাই নয়; অনেক সময়ে স্বামীর দোষে স্ত্রীই অবমানিত হয়। স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মবোধ আর কোনো সমাজেই এতটা ঘনীভূত হ'তে পারে নি!—এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

সত্যবানের মত যজ্ঞনিষ্ঠ, অথবা পুণ্যশ্লোক নলের মত সত্যব্রত না হয়েই আমরা সাবিত্রী দময়ন্তীর কামনা করে' থাকি!—কাযেই, শাস্ত্রে

যে বলে—কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি—তার প্রমাণ আমরা অহরহই ঘরে ঘরে দেখ্‌তে পাই। হরধনু-ভঙ্গের শক্তি অনেক কাল হ'লই অন্তর্হিত হয়েছে সমাজ থেকে, কিন্তু সীতা-লাভের সখ্‌ পুরামাত্রাতেই বর্ত্তমান! সখের নেশায় আমরা একেবারেই ভুলে যাই যে—এ ঘোর কলিতে ভূঁই ফুঁড়ে সীতার আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই! আর তা' থাক্‌লেও তাঁকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত কর্‌বার মত জনক কোথায়? ত্রেতায় যখন সমাজে ত্রিপাদ পূণ্য আর এক পাদ মাত্র পাপ ছিল, তখনও জনক মাত্র একজনই জন্মে ছিলেন!—আর, এখন এই ঘোর কলিতে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ীকে মিথিলাপুরী বলে' অনুমান করে' বসি,—তা' হ'লে বাকী সবও উক্তরূপ অনুমান দিয়েই উপভোগ কর্‌তে হবে!—প্রত্যক্ষ কর্‌তে চাইলেই নেশার স্বপন ছুটে যাবে।

মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য সহজ, সার্থক এবং কল্যাণকর কর্‌তে হ'লে স্বামীর মনুষ্যত্ব আগে জাগাতে হবে। সংযম এবং শিক্ষার অভাবে যেখানে পুরুষ ক্রমেই অপাত্রে পরিণত হচ্ছে, সেখানে স্ত্রী-জাতির উপর কঠোর বিধানের ব্যবস্থা কর্‌লে কেবল তাদের মনুষ্যত্বই পঙ্গু হবে; আর সমাজের ঘরের আবর্জ্জনা আঙ্গিনায় এসে জড়ো হবে।

স্ত্রীকে "দেবী" করে' তুল্‌বার জন্যে আমাদের সমাজে যেমন ধারা ধরাধরি, বাঁধাবাঁধি, কষাকষি চলেছে, এর সিকির সিকি আয়োজনও যদি স্বামীকে দেবতা করে' তুলবার জন্যে নিয়োজিত হ'তো, তা' হ'লে বরং আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক হ'তো,—আর আমরাও হয়ত এমন ধারা অমানুষ হতাম না। কিন্তু তা হয় নি!

একচোখো সামাজিক অনুশাসনে আমাদের স্বামীসম্প্রদায় ক্রমেই দুঃশাসন হয়ে' উঠেছে, আর স্ত্রীসমাজ জীবন্মৃত হয়ে' পড়েছে!—অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা হয়েছেন "নরমের যম", আর এঁরা হয়েছেন "শক্তের ভক্ত"। এম্নি করে নরমকে নুইয়ে আমরা সমাজকে শৃঙ্খলিত করেছি!

স্মৃতি-সংহিতা সঙ্কলনের ঢের আগে, মানব-সমাজের অতি প্রারম্ভে, যখন মানুষে আর বাঘভালুকে প্রকারগত বিশেষ কোনই পার্থক্য ছিল না—সামাজিক শৃঙ্খলার এই সহজ সিদ্ধান্তটী তখন মানুষ আবিষ্কার করেছিল। তারপরে, সভ্যতার বিস্তৃতি এবং উন্নতির সাথে সাথে স্বামী সম্প্রদায়ের এই স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী ক্রমশঃ সংস্কৃত হয়ে আস্‌ছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ সমাজ কত উন্নত,—সে সমাজের স্ত্রী-জাতির অবস্থাই তার অন্যতম মাপকাঠি। পুঁথি পুরাণ থেকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক উদ্ধার করে', এ মাপকাঠির ব্যবহার আমরাও দরকার হ'লে করে থাকি। কিন্তু কর্‌লে হবে কি! পাঁজিতে অগাধ জলের কথা লেখা থাক্‌লেও তা' নিংড়ালে এক বিন্দুও পাওয়া যায় না। অনুষ্টুপ্ ছন্দে হাজার বছর আগে যা' লেখা হয়েছিল—এতদিন ধরে' আমাদের "সনাতন জড়তা" এবং জাতীয় দুর্দ্দশার কয়লা বালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে এখন সোজা বাংলায় যে আকারে তা' বেরিয়ে এসেছে, তা নিয়ে আর গর্ব্ব কর্‌বার কিছুই নেই!

(৩)

অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথের মুখে বঙ্কিম বাবু এই স্বগত উক্তিটী দিয়েছেন :—

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিপদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পূণ্য!"

রোহিণীকে হত্যা করবার আগে গোবিন্দলালও ভ্রমর সম্বন্ধে অনেকটা এই ধরণের মতই ব্যক্ত করেছিলেন। তবে, তখন সময়টা খুব ভালো না থাকাতে, আর উক্তিটীও একেবারে স্বগত ছিল না বলে' ব্যাপারটা স্বভাবতঃই এর চেয়ে একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ দুটী জায়গা পড়লেই আমার মনে হয়—"এত যদি সুখ তোমার কপালে, তবে কেন তোমার কাঁথা বগলে?" বস্তুতঃ আমাদের দেশে কাঁথা বগলে না আসা পর্য্যন্ত এ সব কথা ভাব্‌বার অবসর কোনো স্বামীরই হয় না—কারণ "পুড়্‌বে নারী উড়্‌বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"—এই হচ্ছে আমাদের দেশাচার।

ও সব কথা যাক্। এখন আমি একটু গোলে পড়েছি ঐ "কেবল স্ত্রী" কথাটী নিয়ে। নগেন্দ্রনাথের কথায়—"সূর্য্যমুখী কেবল তাঁর স্ত্রীর ছিলেন না তিনি—সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে

বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী”—এ সব ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁরা “সম্বন্ধে স্ত্রী” এবং “কেবল স্ত্রী” সংসারে এসে কি তাঁরা করেন? আর, যা’ করেন—সেই কি তাঁদের দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পক্ষে চরম এবং পরম কর্ত্তব্য? নগেন্দ্রনাথের কথার ভাবে বোধ হয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীই “কেবল-স্ত্রী”। আমার মনে হয়, সূর্য্যমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে,—তাঁর ভিতরেও “কেবল স্ত্রী”রই প্রাধান্য ছিল—“অধিকন্তু স্ত্রীর” উপরে। তাঁর যে পলায়ন, সেটা নির্জ্জিত “অধিকন্তু স্ত্রার” প’রে বিজয়ী “কেবল স্ত্রী”র নির্ব্বাসন দণ্ড।

যথার্থই যদি তিনি নগেন্দ্রনাথের পক্ষে স্নেহে মাতা, পরামর্শে শিক্ষক, চিন্তায় বুদ্ধি—এ সব হতেন তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হবার অবসর পেতো না! বিরহ-বিধুর নগেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—সংসারী নগেন্দ্রনাথ তেমন করে কখনো ভাবেন নি। সূর্য্যমুখী যদি সত্যিই তাঁর “চিন্তার বুদ্ধি” হবে, তবে কুন্দসম্বন্ধীয় অমনধারা সর্ব্বনেশে বুদ্ধি তিনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি সত্যিই সূর্য্যমুখীকে “স্নেহে মাতা” “পরামর্শে শিক্ষক” বলে ভাবতে পারতেন—তাহলে আর রূপের নেশা দমনের জন্যে তাঁকে মদের নেশার আশ্রয় নিতে হবে কেন?

বস্তুতঃ, শিক্ষিত এবং সাধারণ রকমের ধর্ম্মভীরু লোকে প্রলোভনের ভিতরে পড়লে গোল্লায় যাবার আগে যতটুকু ইতস্তত করে থাকে, গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ কেউই তার চেয়ে বড় বেশী কিছু করেন নি। এমন যে দৈবীপ্রতিমা, প্রণয়শালিনী, পতিব্রতা, সদাহিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রী-রত্ন, তা তাঁদের এ সঙ্কট সময়ে কোনোই কাজে

আসে নি! (আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস,—এঁদের গৃহিণীরা যদি ভ্রমর সূর্য্যমুখী ছাঁচের না হয়ে উগ্রচণ্ডা-ক্ষেমঙ্করী ধাঁচের হতেন, তাহলে এত সব গোলমাল কিছুই হতো না।)

এর কারণ কি? আমাদের সমাজে স্থশীলা সাধ্বী স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীর নৈতিক অধঃপতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না কেন? অনেকেই ত বউএর পরামর্শে ভাই ছাড়েন, মা ছাড়েন—কিন্তু কই; এমন ত শুনিনে,—কেউ কখনো স্ত্রীর চোখের জলে মদ ছেড়েছেন! এর কারণ বেশ স্পষ্ট। যে সব স্ত্রী স্বামীকে কুপরামর্শ দেয়, তারা রূঢ় অর্থে যতই সতী হোক না—পতিগতপ্রাণা তাঁরা নয়। তাদের চিন্তাগত একটী স্বাতন্ত্র্য আছে—আর সেটী মন্দের দিকে! কাজেই তারা সেই স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে, মন্দের টানে স্বচ্ছন্দে স্বামীকে নিজের পথে টেনে আনে! কিন্তু আমাদের পতিপ্রাণা স্ত্রীদের ত' স্বামী থেকে স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকতে নেই। স্বামীকে "ভালো" করবার স্পর্দ্ধা তাঁরা মনেও আনেন না। নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া পতনোন্মুখ স্বামীর উদ্ধার কল্পে আর কোনো উপায়ই ত তাঁরা জানেন না! যে স্বামী লক্ষ্মীরূপা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে রূপের নেশায় পাগল হতে পারে, সতীর চোখের জলের মর্য্যাদা সে বুঝবে কেমন করে? কাজেই, স্ত্রী যখন বলেন মদ ছাড়তে, তাঁরা তখন জবাব দেন—"সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।" কেবল মদ বলে নয় সব বিষয়েই আমাদের স্বামীদের এই এক বাঁধা জবাব! এ জবাবের নির্লজ্জতা এবং হীনতা তলিয়ে বুঝবার মত সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের স্বামীদের মন নেই—মাছের পক্ষে জল এবং পাখীর পক্ষে বাতাস যেমন সহজ-

প্রাপ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষেও সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক নির্ভর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তেম্নি অনায়াস-লভ্য। কাজেই যে নাকি "ছাড়ালেও ছাড়বে না" তাকে দিনের মধ্যে দু' শ' বার "দূর করে" দিতে আর আপত্তি কি ? যার আনুগত্য এত বেশী তার আধিপত্যে আর আশঙ্কা কি ?

সমাজে এমন হয় কিনা জানিনে ; কিন্তু গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মীতে" এমনও দেখেছি পতিপ্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অনুরোধ কচ্ছে'ন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক বিল্বমঙ্গলে অতিথিপরায়ণ 'বণিক' নিজ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অতিথির তুষ্টি সাধনে অনুরোধ করেছেন—সাধ্বী স্বামীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে তাতেও সম্মত! এমন সকল আদুরে পতি আর আষাঢ়ে সতীর সৃষ্টি আমাদের দেশের মাটীতে, আর আমাদের সমাজের নাটকেতেই সম্ভব!

(৪)

"বালিকা বধূ" আর "কিশোরী প্রিয়া" পরম রমণীয় পদার্থ,—তাতে হয়ত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসারচক্রে Lubricating oil-এর বদলে লক্ষ্মীবিলাস খুব বেশী দিন কার্য্যকরী হয় না! কাঁচামিঠে আম পাকলে পান্‌সে হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী! আমাদের সমাজে প্রথম মিলন সময়ে বয়সের তারতম্য খুব বেশী থাকাতে স্বামী স্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থেকে যায়। এ ব্যবধান সবদিক থেকে মিটিয়ে নেবার জন্যে কোনো

তরফ থেকেই বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না! পৃথিবীর আর আর সব সভ্যসমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তা না থাক্‌লে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর কাজ কর্ম্ম, চেষ্টা চরিত্র, এমন করে কেটে ছেঁটে ভাগ যোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, যার যার মতন নিজ নিজ কক্ষায় থেকেও তারা বছরের পর বছর সংসারমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে পারিবারিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্য শেষ করতে পারে। তাদের পরস্পরের বৈষয়িক মতামতের সংঘাত বা অপঘাতের কোনই সম্ভাবনা ঘটে না! "বুড়ি পরম বৈষ্ণব আর বুড়ো বেজায় শাক্ত" হওয়া সত্ত্বেও তারা "দুজনাতে মনের মিলে (!) সুখে" থাকতে পারে।

আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তার একান্ত অভাব এমন কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল বল্‌তে চাই, আমাদের সাংসারিক শৃঙ্খলার পক্ষে সেটা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য নয় বলে' অনেক স্থলেই সজ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত না হ'লেও অজ্ঞানে তা কতকটা উপেক্ষিত হয়! তারি ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি, একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। আমাদের চোখে যে মিলন খুব প্রগাঢ় বলে' প্রতীয়মান হয়, সেখানেও বুদ্ধি-বৈষম্যের একটা চোরা ফাঁক লুকোনো থাকে! শতসহস্র কাল্পনিক মিলনের মধ্যেও এই সত্যিকারের বিচ্ছেদটা চাপা পড়ে মারা যায় না। তবে সংস্কার এবং অভ্যাসের বশে—সর্ব্বোপরি, আমাদের সংসারিক জীবনের একঘেয়েমির দরুণ—আমাদের অনেকের কাছেই তা' ধরাপড়বার সম্ভাবনা নেই—একথা আমি স্বীকার করি!

এই বৈষম্যের ফলেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখানে যত মিল, সেখানে তত গোঁজামিলন! আঘাত পেলেই তা' চটে বেরিয়ে পড়ে! বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষ" আর "কৃষ্ণ কান্তের উইলে"—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজা-গুঁজি, জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সামনে ধরেছেন। রবিবাবুও "ঘরে বাইরে"তে ঠিক তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে। সমাজ হয় ত তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। মানুষের মন ছিল তাঁদের লক্ষ্য, সমাজ উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু তাতে কি? মানুষের মন ত সমাজের আওতাতেই বেড়ে ওঠে! কাজেই, কবির সৃষ্টিকে সার্থক এবং স্বাভাবিক করতে, তাঁকে, বাধ্য হয়েই মানুষের মনের সাথে সাথে সমাজের পরিণতির রহস্য উদ্ঘাটিত করতে হয়েছে। কবির কথাকে কাজের সাথে খতিয়ে দেখাই জীবিত সমাজের কর্ত্তব্য! আমাদেরও তাই করতে হবে।

সামাজিক বিধিব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা অসঙ্গতি সব সমাজেই আছে, কোনো সমাজেই তা' দূর করবার জন্যে কথা ও কেতাবের অভাব নেই! কিন্তু আমাদের মত আলোচনাবিমুখ এবং সমালোচনাঅসহিষ্ণু সমাজ খুব কমই দেখ্তে পাওয়া যায়! আমরা "কৃষ্ণ কান্তের উইল" পড়ে' ভ্রমরের "চেলির বহর দেখে ভাল বল্‌ব কি মন্দ বল্‌ব বুঝে উঠ্‌তে পারিনে; আর বিষবৃক্ষ পড়ে' সূর্য্যমুখীর "বারানসীর" বাহার দেখে অবাক হই! ফলে,—আজ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করে' উঠ্‌তে পারি নি, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের অঙ্গে কি মানায়! পাঠক রেলে ষ্টীমারে, সভা-সমিতিতে ক্রিয়াকর্ম্মে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে থাকেন!

শ্রাবণ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

‘অচলায়তন’।

‘অচলায়তন’খানি যেদিন ভূমিষ্ঠ হ’য়ে দশজনের চোখে পড়্‌ল সেদিন সে সঞ্চার করে’ গিয়েছিল—প্রবীণের মনে মনে বিরাগ আর নবীনের বুকে বুকে পুলক। এর অবশ্য কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে এই ‘অচলায়তন’ খানিতে প্রবীণদের আরামে আঘাত কর্‌বার একটা চেষ্টা আছে কিন্তু নবীনদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে অবশ্য এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে সকল দেশেই সকল সময়েই প্রবীণদের মধ্যেও অনেক নবীন লুকিয়ে থাকেন আবার নবীনদের মধ্যেও অনেক প্রবীণ জন্ম নেন।

‘অচলায়তন’ রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটক। কিন্তু আমরা নাটক বল্‌লে যা বুঝি—শেক্‌স্‌পীয়ার কালিদাস বল্‌লে যা বুঝি—এমন কি, মেটারলিঙ্ক্‌ ইব্‌সেন্‌ বল্‌লেও যা বুঝি এখানি ঠিক তা’ নয়। প্রথমতঃ চোখে-পড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নেই আর দ্বিতীয়তঃ মনে-লাগা বিশেষত্ব এই যে এতে পুরুষেরও যে চরিত্র-গুলো আছে তা মানুষের চরিত্র বল্‌লে সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। সে-গুলো যেন মানুষনামক ভগবানের যে সৃষ্ট জীবটী তারই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব—এক একটা দেহ অবলম্বন করে’ ফুটে উঠেছে। মানুষের ‘চরিত্রে’ আর ‘ভাবে’ প্রভেদ এই যে—চরিত্রটা মানুষের বাহিরের কিন্তু ভাব জিনিসটা তার অন্তরের। মানুষের চরিত্র হচ্ছে

সেইটে যেটা ফুটে ওঠে যখন সে অপরের সংস্পর্শে আসে, অপরের সঙ্গে ব্যবহার করে—কিন্তু ভাব তার ভিতরের বস্তু আপনার সত্তাতেই যার অস্তিত্ব। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে যে প্রথমটা হচ্ছে মানুষের objective experience আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে subjective experience, সেই জন্যেই আমরা এই অচলায়তনের পুরুষগুলোকে মানুষের 'চরিত্র' বল্‌তে নারাজ—এরা যেন মানুষের বিভিন্ন বিভিন্ন 'ভাব'। পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য্য অদীনপুণ্য, দর্ভকেরা, শোণপাংশুদল এরা যেন সবাই, মানুষের মর্ম্মতলে তার জীবন-দেবতা বসে নিশিদিন যে বীণা বাজাচ্ছে, সেই বীণার এক-একটা সুর; বড় জোর এক একখানি গান—আর এদের কাছে যেটা বহির্জগৎ তারও অর্থ তাদের ওই নিজের নিজের গানের অর্থে। আর তাই পঞ্চকে মহাপঞ্চকে এত প্রভেদ—বিরোধ বল্‌লেও হয়। কিন্তু জীবন-দেবতা জানে যে এ প্রভেদ বিরোধ নয়—বরং ঠিক তার উল্টো। এরা মানুষের জীবনে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেই চলেছে। জীবন-দেবতা জানে সে কথা। এই জীবন-দেবতা হচ্ছে দাদাঠাকুর। আর তাই দাদাঠাকুর "একলা হাজার মানুষ" আবার "মজার মানুষ"ও বটে—তাই দাদাঠাকুর "কোণের মানুষ" আবার "সব মিলনে মেলার মানুষ"ও বটে। কারণ মানুষের জীবন-দেবতা অনন্ত গুণের দেবতা। সেখানে অনন্ত রঙের আলোতে অনন্ত রাগিণী উঠছে—বিরামহীন রাগের মূর্চ্ছনায় বিচিত্র বিচিত্র ছবি ফুটছে। ক্ষুদ্র, মহৎ, বন্ধন, মুক্তি, হাসি, অশ্রু, করুণ রুদ্র—সব সত্য হয়ে রয়েছে সেখানে—আনন্দময় হয়ে রয়েছে সেখানে। তাই দাদাঠাকুর যখন অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে নতুন করে সবায়

আবার প্রাচীর গড়তে আদেশ করলেন তখন সেখান থেকে বাদ দিলেন না কাউকেও—সেখানে সবাই রইল—পঞ্চকও মহাপঞ্চকও—যে দুজন চিরকাল অচলায়তনে পরস্পর পরস্পরের পথে বাধা হয়েই কাটিয়ে এসেছে।

(২)

এই বইখানিতে একটা বিষয় আছে যেটা সম্বন্ধে কারও ভুল করবার কোনই সম্ভাবনা নেই সেটা হচ্ছে এই যে—এর আসল লোক হচ্ছে পঞ্চক। এই পঞ্চক কে? অচলায়তনের সবাই যদি জীবন-দেবতার বীণার এক একটী সুর হয়—তবে তার মধ্যে প্রথম সুরটী—প্রধান সুরটী হচ্ছে পঞ্চক। পঞ্চকের ঐ সুর আছে বলে' আর সকল সুরেরও ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চকের ঐ সুর থামিয়ে দিলে আর সকল সুরও একে একে থেমে যাবে। এ সুর হচ্ছে মানুষের সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মুক্তির সুর—এ জগতে ছাড়া-পাওয়ার সুর।

সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মানুষ—যে মানুষ চায় প্রকাশ—চায় অনন্ত রাগিণীর মাঝে বিচিত্র আলোকের মাঝে ছন্দে ছন্দে তালে তালে প্রতি পলে পলে ফুটে উঠতে,—আপনাকে এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে। যেমন করে গাছ আপনার ডালপালা ছড়িয়ে দেয়, যেমন করে ফুলটী আপনার সৌরভ বিলিয়ে দেয়—তেমনি করে ছড়িয়ে দিতে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু কেন? কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য? কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। প্রয়োজন যদি

কিছু থাকে তবে সেটা ভীষণ রকমের গৌণ। এ ছড়িয়ে দেওয়ার "কেন"র উত্তর হচ্ছে—আনন্দ। এই ছড়িয়ে দেওয়া, এই প্রকাশ হওয়াতে মানুষের আনন্দ আছে তাই—আবার মানুষের আনন্দ আছে তাই এই ছড়িয়ে দেওয়াই, প্রকাশ হওয়া। এ'কে আশ্রয় করে মানুষ যে প্রতিদিন মনে করে যে সে তার প্রয়োজন সাধন করে' নিচ্ছে, সেটা তার পাটোয়ারী বুদ্ধির মাপকাঠি। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে, সমস্ত সৃষ্টির সম্বন্ধে যেটা খাঁটি নিছক সত্য সেটা হচ্ছে ঐ আনন্দের খেলা। এই আনন্দকে বুকে করে', এই আনন্দময় জগতে মানুষ ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠুরীতে চোখ বুঁজে চিরকাল বসে থাকতে পারে না। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস। সে যে চায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের মিলন। সে চায় হৃদয়ের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুলতে—বিশ্বের রঙে হৃদয়টা পূর্ণ করতে। আর এই হচ্ছে পঞ্চক—এই হচ্ছে মানুষ। আর এইটে হচ্ছে "অচলায়তনের" মূল কথা।

কিন্তু এই যে পঞ্চক—এই যে মানুষ—এই যে তার জীবন-দেবতার প্রেরণা—যে প্রেরণার বলে আবহমানকাল হ'তে বিশ্বমানবের অন্তরে

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তি স্বাদ

সত্য হ'য়ে ফুটে আছে—তা সার্থক করবার পক্ষে মস্ত বাধা পঞ্চককে ঘিরে আছে অচলায়তনের আকাশ-জোড়া প্রাচীর; আর তার মনের চারপাশে ঘিরে আছে পঞ্চাশ হাজার বছরের রাশীকৃত পুঁথি আর তার

সংখ্যাহীন শ্লোক। পঞ্চকের ঘরের চারপাশে যে প্রাচীর তা যত বড়-বড় পাথর দিয়েই গড়া হোক্ না কেন—যত উঁচু করেই গাঁথা হোক্ না কেন—তা ফুৎকারে কোথায় উড়ে যেত—বালার্কের স্পর্শে নীহার-স্তূপের মত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যেত যদি না থাক্‌ত তার মনের চারপাশে ঐ অসংখ্য পুঁথি আর তার সংখ্যাবিহীন শ্লোক। অন্তর-দেবতার যে সত্যিকার বন্ধন তা অচলায়তনের প্রাচীরে নেই—তা আছে, পুঁথির "কাকচঞ্চু পরীক্ষায়," "দ্বাবিংশ পিশাচভয়ভঞ্জনে।" এই অচলায়তনে বিধির চাইতে নিষেধ বেশী—কারণ এখানে সাহসের চাইতে ভয় বেশী। যেখানে প্রতি পদে বাধা মান্‌তে হবে—প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে' পা ফেল্‌তে হবে—সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে অমানুষ, দুনিয়া হ'য়ে ওঠে অসুখের জায়গা। সেখানে অচলায়তনের উঁচু প্রাচীর খাড়া করে' বাহিরটাকে চিরকাল বাহিরে রাখাই ভাল—সেখানে জীবনটাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থি লাগিয়ে কসে' বেঁধে রাখাই হয়ত সুবিধার কথা, কিন্তু মানুষের জীবন-দেবতার সার্থকতা সেখানে মিল্‌বে না কিছুতেই—পঞ্চকের সেখানে হাহাকার—মানুষের সেখানে জীবন্মৃত্যু।

পঞ্চকের সেখানে চির-হাহাকার। সে যে রাশীকৃত পুঁথির চাপে আপনার জীবন-দেবতাকে ঢাকতে পারেনি—পঞ্চাশ হাজার শ্লোকের কল কল কলরোলের মাঝে আপনার জীবন-দেবতার সত্যিকার কথাটী ডুবিয়ে দিতে পারে নি। তার জীবন-দেবতা যে নিশিদিন তার অন্তরে অন্তরে অভিমানের সুরে ডাক্‌ছে—"পঞ্চক" "পঞ্চক"। হায়! এ ডাক ত অচলায়তনের আর কেউ শোনে নি।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,

আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানে না।

না, এমন করে' আর কেউ টানে না পঞ্চককে—যেমন করে' টান্‌ছে তার অন্তরের জীবন-দেবতা—কেউ না—পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে' ছাপ্পান্ন হাজার পুরুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে যে পুঁথিগুলো, যে শ্লোকগুলো, যে ক্রিয়াগুলো, যে আচারগুলো—সে-গুলো ত নয়ই। জীবন-দেবতার ডাকে পঞ্চক পাগল—বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মতো তার আকুলতা—ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মতো তার ব্যাকুলতা—কোথায় পড়ে রইল তার "ওট ওট তোতয় তোতয়"—তার "ধ্বজাগ্রকেয়ূরী" "চক্রেশমন্ত্র"—সেই অচলায়তনে সেই আলোঢাকা বাতাস বন্ধকরা প্রাচীরের মাঝে পঞ্চকের গলা চিরে গান বেরিয়ে এল—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ যে অচলায়তনের বিরুদ্ধে মানুষের জাজ্বল্যমান বিদ্রোহের সূচনা! অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে এ ব্যাপার কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি, কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

কতশ যুগ কে জানে তার পেষণেও মানুষের জীবন-দেবতা সরল না! সে আজও অচলায়তনে জন্মে অচলায়তনে মানুষ হ'য়ে ছুটে বেরুতে চায়—আপনার আনন্দে—বিশ্বের মাঝে—খোলা আকাশের তলে! না, জীবন-দেবতা মরে নি—মর্‌তে পারে না। ভগবান তেমন কাঁচা শিল্পী নন। পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে জীবন-দেবতার জয় হয়েছে। বাহিরেও তার জয় হবে নিশ্চয়। সেদিন বুঝি "অচলায়তনের" প্রাচীরের একটা পাথরও খাড়া হ'য়ে থাক্‌বে না।

(৩)

ঐ যে শোণপাংশুরা—যারা খেঁসারি ডালেরও চাষ করে আবার লোহাও পেটে, যারা নাপিত ক্ষৌর কর্‌তে কর্‌তে বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দিলে উল্টে নাপিতের গালে চড় কসিয়ে দেয়, আবার খেয়া নৌকয় উঠতেও তারা সেদিন কোনই ভয় করে না—অথচ এ সত্ত্বেও যারা একেবারে জাতকে-জাত অধঃপাতে যায় নি—সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে তাদের এমনি একটা সহজ স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ আছে যে, তাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একজটাদেবীও ভয় দেখাবার জন্যে বসে' থাকে না কিম্বা কারও গায়ের উপর হাঁই তুললেও তাদের আয়ু কমে যায় না। তারা হয়ত বাড়ীর উত্তর দিকটায় দিব্যি চাষ্ করে, সেখানে খেঁসারি ডালের বীজ বুনে দেয়—একজটাদেবীর একগাছি চুলও সেখান থেকে বেরয় না—বেরয় যা সেটা চমৎকার তাজা সোনারবরণ খেঁসারি ডাল অথচ এদের বজ্রবিদারণ-মন্ত্রও নেই, দ্বাবিংশপিশাচভয়-ভঞ্জনও নেই—হাজার প্রকার ভয় তাড়ানোর কোন মন্ত্রই নেই—বুঝি

এদের কোন ভয়ই নেই। অথচ—কিম্বা বুঝি সেই জন্যেই—এই শোণপাংশুদের এমন একটা শ্রী আছে, এমন একটা উল্লাস আছে যে অচলায়তনের বালকদেরও তা নাই।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা—এরা বেড়ে উঠেছে আপনারই আনন্দের ভিতর দিয়ে। এদের দৈনন্দিন কর্ম্মগুলো এদের এমন একটা সার্থকতা পাইয়ে দিয়েছে—এমন একটা রস পাইয়ে দিয়েছে যে সেই রসের আনন্দে তাদের প্রাণ ভরপুর; আর সেই প্রাণের আনন্দ, তাদের চোখে মুখে ললাটে আপনার ছায়া ফেলে তাদের করে তুলেছে শ্রীমান্, আনন্দমূর্ত্তি। কিন্তু ঐ যে "অচলায়তন" যেখানে দশ হাজার শ্লোকে মিলে বিশ হাজার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিচ্ছে—সেখানকার যে মানুষগুলো—তারা চল্‌ছে না, বসে রয়েছে—জীবন-দেবতার আনন্দে নয়। কারণ এরা যা কিছু করে, যা কিছু শেখে তার সঙ্গে এদের প্রাণের যোগ কোনখানেই নেই—এমন কি বুদ্ধির যোগও নেই। কারণ তাদের যে-সব মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ তার সম্বন্ধে কারও কোন প্রশ্ন করবারও অধিকার নেই। "হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই।" এ সবের সঙ্গে এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে অভ্যাসের যোগ—আর এই অভ্যাস সম্ভব হয়েছে অতীতের শাসনে। আর সেইজন্যে এদের মধ্যেকার যে "মানুষটা" সেটা বয়ে চলেছে একটা বিরাট ব্যর্থতা। কারণ মানুষের সম্বন্ধে সবার চাইতে সত্য যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ কল নয়। কিন্তু এমনি অভ্যাসের বল যে, এরা যে একটা বিরাট ব্যর্থতাকে বহন করে চলেছে সে কথাটাও এরা জান্‌ছে না—কেবল যে জান্‌ছে না তাই নয়, উল্টে আবার মনে করছে যে এইই অমৃত এইই মুক্তি এইই

আনন্দ। কিন্তু তবুও এদের মধ্যেকার "মানুষ" একেবারে মরে নি। এখনও একটু একটু তার স্পন্দন আছে। তাই যেদিন দাদাঠাকুরের দল এসে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এল, সেদিন তাদেরও প্রাণটা নেচে উঠলো—সেদিন যখন বালকেরা শুন্‌লে যে ষড়াসন বন্ধ, পংক্তি-ধৌতির দরকার নেই তখন তারা দুঃখিত হল না মোটেই—সেদিন তাদের "কি মজা রে কি মজা।" পঞ্চকের দু' ধারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে শোণপাংশুরা, আর একদিকে "অচলায়তন"—একদিকে তার প্রাণের ডাক গানের ডাক, আর একদিকে তার অতীতের আদেশের, অতীতের শাসনের ডাক—একদিকে খোলা আকাশের ডাক, আর এক-দিকে বন্ধ পুঁথির ডাক—একদিকে জীবনের আনন্দের ডাক, আর এক-দিকে মরণের শান্তির ডাক। পঞ্চককে কে জিতে নেবে? মানুষ কোথায় আপনার অমৃত খুঁজে পাবে? পঞ্চক তার মুক্তি অচলায়তনের বন্ধ পুঁথির শ্লোকের মাঝে খুঁজে পেলে না, খুঁজে পেলো তা খোলা বাতাসের সুরের মাঝে—মানুষ বুঝেছিল তার অমৃত, আঁধার-ঢাকা অচলায়তনের মধ্যে নেই, তা আছে আলোকমাখা আকাশের তলে।

এইটেই হচ্ছে আসল কথা। মানুষের মুক্তি, মানুষের অমৃত—তা আছে কোথায়? তার ধরে' রাখার মধ্যে নয়, তার ছাড়া-পাওয়ার মধ্যে। মানুষের হাত পা বোঝা হয়ে ওঠে তখন, যখন এদের বসিয়ে রাখা যায়—নইলে এরা মানুষের আনন্দেরই কারণ। আসল কথা হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে একটা ভগবানের বিধি আছে—তার হাত পা চোখ কান মন প্রত্যেকের, ভগবান-দত্ত একটা ধর্ম্ম আছে। মানুষের মঙ্গল ও আনন্দ আছে সেই সেই বিধি মানার মধ্যে, হাত পা চোখ

কান মনের সেই সেই ধর্ম্ম-উদযাপনের মধ্যে। মানুষের অমৃত এদের মেরে ফেলবার মধ্যে নেই—আছে এদের জাবন্ত করে' তোলবার মধ্যে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি—মানুষের জীবন-দেবতার ধর্ম্ম—তার সত্য কথা।

ঐ যে অচলায়তনের দল আর শোণপাংশুর দল এদের মধ্যে ঐ শোণপাংশুর দলই জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা মেনে চলেছে—তাই তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা পূর্ণ সার্থকতা রয়েছে—একটা জমাট আনন্দ রয়েছে—আর তাই এ জগৎটা তাদের কাছে মিথ্যা হয়ে ওঠে নি, মায়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তবুও এই শোণপাংশুদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা, একটা প্রকাণ্ড অভাব রয়ে গেছে—যেটা পঞ্চকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চল্‌ছে বটে কিন্তু জান্‌ছে না যে এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চল্‌ছে। আর তাই "এরা বাইরে থাকে বটে কিন্তু বাহিরটাকে দেখতেই পায় না।" কারণ এরা আপনার ভিতরটাকে মানে নি। দাদাঠাকুরের সঙ্গে এদের চোখের পরিচয় আছে বটে—কিন্তু তাকে এরা মন দিয়ে জানে না, প্রাণ দিয়ে চেনে না। দাদাঠাকুরকে এরা দাদাঠাকুর বলেই জানে গুরু বলে চেনে না। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে—চাই কি, একদিন এরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দাদাঠাকুরের অপমানই করে বস্‌বে।

মানুষের সকল অমঙ্গলের সূচনা হয় তখন যখন সে জীবন-দেবতাকে তার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করে তাঁর মনের সিংহাসনে অহং-দেবতার আসন পাতে। মানুষের জীবন মিথ্যা দিয়ে ভরে ওঠবার সুযোগ পায় তখনই। এ মিথ্যা আপনাকে বিস্তার করতে পারে দু'দিকে। এক

নীচুদিকে আর এক উঁচুদিকে—এক মানুষকে অস্বীকার করার দিকে, আর এক মানুষকে অতিমাত্র স্বীকার করার দিকে—এক "অচলায়তনের" দিক, আর এক মানুষের শক্তির দানবী-লীলার দিক।

কারণ ঐ যে "অচলায়তন"—তার প্রত্যেক পাথরটী খাড়া হ'য়ে উঠেছে মানুষের বিরাট অহঙ্কারের উপর—হাজার বালকের চোখের জল দিয়ে এর চুন শুর্‌কি গোলা হয়েছে—সুভদ্র যে উত্তরদিকের জানালা খুলতে চেয়েছিল বলে' তাকে ছয়মাস অন্ধকার কুঠুরীতে পুরে রাখবার মন্ত্রণা হয়েছিল—অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল যে পিপাসায় জল জল করে' প্রাণত্যাগ কর্‌লে, তবুও তার মুখে কেউ একবিন্দু জল দিলে না—এ সবের পিছনে যে একটা মস্ত বড় সত্ত্বগুণের খেলা চল্‌ছে তা মনে কর্‌বার কোন কারণ নেই—এসব হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের তামসিক লীলা—আর এর অন্যদিকটা হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের রাজসিক লীলা—যে লীলার—কতকটা উপশমের নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলে', বোধ হয় আরব্ধ হয়েছে বর্ত্তমান ইয়োরোপের মহাসমর।

এইখানেই মানুষের বিপদ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে চাই, জীবন-দেবতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন। দাদা-ঠাকুরকে দাদা-ঠাকুর বলেও জান্‌তে হবে আবার গুরু বলেও মান্‌তে হবে। "দাদাঠাকুরের মুখের কথাকে মনের ইচ্ছা করে তুল্‌তে হবে।" আর এ কর্‌তে হলে সারাদিন শোণপাংশুদের খালি পাক খেয়ে বেড়ালে চল্‌বে না। তাদের একটু বস্‌তে শিখ্‌তে হবে। আর এর জন্য দরকার মহাপঞ্চক। "কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়" তার মন্ত্র—"ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য" আছে ঐ মহাপঞ্চকের হাতে। সেই

জন্য মহাপঞ্চকেরও দরকার একটা বড় রকমের দরকার—ঐ "অচলায়তন" ভেঙ্গে সেখানে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করান হবে যে নূতন শুভ্র সৌধ, সেই নূতন সৌধের মাঝে। এই মহাপঞ্চক যেদিন শোণপাংশুর অন্তরে গিয়ে বস্‌বে—শোণপাংশু যেদিন মহাপঞ্চকের দেহে গিয়ে লাগবে—যেদিন মহাপঞ্চকের আত্মজয়ের উপরে স্থাপিত হবে শোণপাংশুর কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা, যেদিন শোণপাংশুর প্রবৃত্তি মহাপঞ্চকের সংযম দিয়ে নিয়মিত হবে—সেদিন মানুষ হবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—দেবতার চাইতেও মহীয়ান্—দেবতার চাইতেও গরীয়ান—ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা-সমস্যা।

আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যে গোলমালটা হচ্ছে তার মধ্যে ছাত্র-সমাজের কেউ কোন কথা বলেছেন কিনা জানি নে—যদি বা বলে থাকেন তবে এই গোলযোগে সেটা যে কারও কানে পৌঁছয় নি তা সুনিশ্চয়। ছাত্র-সমাজের মুখপাত্র হয়ে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই, ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতার দাবীতে কয়েকটা কথা বলতে চাই, গোলযোগ বাড়াবার তরে নয়, যাঁদের শিক্ষার কথা নিয়ে তর্ক উঠেছে তাদের কোন দিক থেকে বিচার করতে হবে সেটা দেখান আমার কাজ। আমরা যে হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে প্রত্যহ হাঁটাহাঁটি করছি তার ফলে পেয়েছি কি? অর্থাৎ আমরা দেখতে চাই আমরা কি শিখছি তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কতদূর এগিয়েছে বা পিছিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছে, University calender খুলে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা নিরূপণ করে একথা বলতে অনেকে ছুটে আসবেন জানি, কিন্তু অন্য দেশে যাই হোক এখানে অমন ধারা অঙ্ক কষে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। যদি কিছু পাই সেটা ফাজিল ভিন্ন আর কিছু নয় বলেই মনে হয়, কাজেই সেটাকে বাদ দেওয়াই উচিত। তার কারণটা পরে বলছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বা আশুতোষ সব দেশে দু একটী করে এসে থাকেন কাজেই তাঁদের দোহাই দিলে আমরা শুনবো না,

আমাদের দেখতে হবে সাধারণ ছাত্রের অবস্থা। তারা যে আদর্শ যে ব্যবস্থা যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠছে সেই আদর্শ, ব্যবস্থা ও আবহাওয়া শিক্ষার পক্ষে যথেষ্টরূপে উপযোগী কিনা তাই আমাদের বিচার্য্য। অন্য দেশের বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কাজ নেই কারণ এখানে তুলনা করা দুঃসাহস ভিন্ন আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার কথার উত্তরে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা মারা ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি দেখিয়ে বলবেন যে আগে আমাদের দেশে এ সব ছিল না; এ কথা মানি কিন্তু এ সব হয়ে যে বিশেষ উপকার হয়েছে তার লক্ষণ ত বড় বেশী দেখতে পাই নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলে মানুষ হিসেবে এঁরা যেমন থাকতেন এখনও তেমনি আছেন, অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শিক্ষার আদর্শ যাই হোক না, এখানে সেটা যে অচল তা আমরা সবাই জানি, অবশ্য জ্ঞানলাভ করবার জন্যে জ্ঞানের চর্চ্চা করে সব দেশেই এমন লোক কম কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপার্জ্জিত জ্ঞান কাজে খাটাবার মত শিক্ষা সকলেই পায়। জ্ঞান জিনিসটা মনের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়, যা মেশে না তা জ্ঞান নয়—কিন্তু আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যে জ্ঞান নয় তার প্রমাণ, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, যদি থাকত তবে কোননা কোন আকারে তার প্রকাশ হত। আমাদের এই বিদ্যাটা নিতান্ত অবিদ্যার মত ঘাড়ের উপর বসে রক্ত মাংস খাচ্ছে শুধু তাই নয় প্রাণ পর্য্যন্ত শুষছে। তাই আমরা যত শীঘ্র পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ী পার হয়েই এই যুগ সঞ্চিত বিদ্যার বোঝা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরি এবং বাপ দাদা যেমন করে জীবন কাটিয়ে ছিলেন সেই ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কোন রকমে আর খাপ খাওয়াতে পারি না—আমাদের সেই আলস্যময় জীবনের উপর আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যেন দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে। আমাদের দ্বারা আর কিছু হবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের ছাত্রজীবনের চারিদিকে শিক্ষার কোন আবহাওয়া নেই বল্লে অত্যুক্তি হবে না। এই একটা সময় যখন জীবনে যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর তাকে আমরা সারা প্রাণ দিয়ে পূজা করতে পারি—এই সময়ে আমরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করি বিজ্ঞেরা যা শুনলে অবজ্ঞার হাসি হাসবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের এই আরাধনার আবহাওয়ার মধ্যে আমরা থাকতে পাই নে। দোষটা যে আমাদের নয় তার কারণ আবহাওয়াটা তৈরী আমরা করি নে—যথার্থ শিক্ষার চারদিকে সেটা আপনি গড়ে উঠে এবং ছাত্র-জীবনের খোলা দরজার মধ্যে সেটা আপনি ঢুকে পড়ে মানুষ গড়বার যথেষ্ট উপাদান এনে দেয়।

আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষক এই ছুটি-পথ আটকে বসে আছেন। শিক্ষার আদর্শকে তারা এমন খর্ব্ব করেছেন, শিক্ষার আবহাওয়াটা তাঁরা এমনি ঘুলিয়ে রেখেছেন, যে সেখানে থাকলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, কাজেই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা কিসে দম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি কারণ পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার সম্বন্ধে চাচার অনেক উপদেশ আমরা প্রত্যহই পাই।

(২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণাগুণ বিচার হয় পরীক্ষার সাহায্যে। শিক্ষিতজনের পক্ষে পরীক্ষা নাকি কষ্টিপাথরের মত কাজ করে। কষ্টিপাথরের মর্য্যাদা তার দ্বারা যে ধাতুর পরীক্ষা হয় সেই ধাতুর উপরে

নির্ভর করে তার নিজের দাম নিয়ে কেউ বড় মাথা ঘামায় না—এখানে কিন্তু তার উল্টোটাই হয়েছে—শিক্ষা যত হোক আর না হোক পরীক্ষার উপর সকলেরি ঝোঁক, কাজেই তার দাম অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। কোন রকমে তার উপর আঁচড় ফেলতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষার দাবী গুরুতর হয়ে ওঠায়, শিক্ষা ছেড়ে আমরা পরীক্ষাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছি, কোন রকমে চোখ কাণ বুজে বৈতরণীটা পার হয়ে যাই, তারপর কি তা জানি না। আমি পরীক্ষার উপর কটাক্ষপাত করছি না যাতে পরীক্ষার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে উঠে তার চেষ্টা করছি।

পরীক্ষাভীতিটা আমাদের মধ্যে যে সংক্রামক হয়ে উঠেছে তার কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্য আর পরীক্ষকের কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটীর উদ্দেশ্য এক নয়। অনেকে হয়ত University regulations খুলবেন আমার কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে, যেমন নারী-সমস্যা নিয়ে কথা উঠলে তাঁরা মনু খুলে বসেন। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিক তা নয়। মনুতে যা লেখা আছে তা মানলে বোধ হয় কোন তর্ক উঠত না—University regulations-এ যা লেখা আছে তা মেনে চললে হয়ত পরীক্ষাটা অত ভয়ের কারণ হয়ে উঠত না। শিক্ষার আদর্শ এইখানেই খর্ব্ব হয়েছে—শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের কাছে আমরা যেমন শুনি তাতে পরীক্ষাকে একটা সঙ্কট মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেমন করে আদর্শ খর্ব্ব হয়েছে তা নিয়ে বিচার করবার মত বিদ্যা বা সময় আমার নেই, তবে বর্ত্তমানের এই খর্ব্বতার মূলে আমরা যাঁদের দেখতে পাই তাঁদের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলতে চাই, তাহলে আমাদের কথাটা পরিষ্কার হয়ে আসবে।

বাড়িতে অভিভাবক ও স্কুল কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ হয়েছেন যে আমাদের নিজের হাতে করবার মধ্যে কেবল নোট মুখস্থ ছাড়া আর কিছু নেই। এ বিষয়ে আমরা এক একটী কল বনে গেছি—আমাদের ভুলতে হয়েছে যে আমরা নিজেরা ভাবতে পারি, চিন্তাশক্তি কাজে খাটাতে পারি, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারি—আমাদের মনের এই স্বাভাবিক গতিটুকু এখন মাষ্টারের নোটের খাতার মধ্যেই বন্ধ। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা সহজ জ্ঞানের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করার ফলে নিজের শক্তির উপর আস্থা বড় কম হয়ে যায়। আমাদের হয়েছেও তাই।

গতানুগতিক ভাবে জীবনটাকে কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়াকে যাঁরা চরম মনে করেন তাঁদের কাছে নতুন কিছু আশা করা অবশ্য নিরাশ হবার জন্যই। আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ও এর হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। তাঁরা যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন তা নয়, কিন্তু সে পদ্ধতি যে আমাদের দেশে খাটে ও তাতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যায় এমনতর চিন্তা তাঁরা করেন কিনা সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁরা যে নিয়মে শিখেছেন সেই নিয়মেই শেখাতে চান, পরিবর্ত্তনের কথাটাকে কোন রকমে আমল দিতে চান না—যদিও তাঁরা জানেন যে আগের ব্যবস্থা অভ্রান্ত নয় এবং আগে যা চলেছে এখন তা নাও চলতে পারে। মনের প্রসার, জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তা-শক্তির বৃদ্ধির দিকে তাঁদের নজর যতখানি পরীক্ষার সাফল্যের দিকে দৃষ্টি তার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁরা যে আমাদের মঙ্গল চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায় একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার

উদ্দেশ্য যদি চাকরীর সুপারিশ হয় তবে তাঁরা যে ঠিক কাজ করছেন এ কথা সবাই বলতে বাধ্য কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক ঐটি কিনা তা নিয়ে কিছু গোল আছে! যাই হোক তাঁরা যে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাজ করুন না কেন, তার ফলে আমাদের অবস্থা বড় বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপদেশের চেয়ে উদাহরণের জোর ঢের বেশী। নোট সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে খাটে। আমরা যে আদর্শ ধরে কাজ করি তাতে নোটই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র syllabus বজায় রেখে আমরা চলি বলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমাদের অবকাশ থাকলেও নিজেদের আগ্রহ ও উপর-ওয়ালার উৎসাহ যথেষ্ট কম। স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ না পাওয়ায় আমরা মনে এক একটী কুঁড়ের বাদশা হয়ে দাঁড়িয়েছি। তার ফলে অবকাশ পেলেও পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কোন রকম পরিশ্রমে অভ্যস্ত না থাকার দরুন আর কোন বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকে না। দোষটা আমাদের কিন্তু আমরা এর জন্যে মুখ্য ভাবে দোষী নই। মানুষের স্বভাবের মধ্যে অনুকরণটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। নতুন পথ কেটে যাবার মত সাহস ও শক্তি সকলের নেই। কাজেই বাপ দাদার অনুকরণ করাটা আমরা নিজের পথ কেটে যাওয়ার চেয়ে সহজ মনে করি। তার ফল যে কি হচ্ছে সে দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নেই, কারণ আমরা চিন্তার কোন ধার ধারি না সে কাজটা আমাদের শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত আছে।

আমাদের প্রধান সমস্যটা এইখানেই। আমরা বলি শিক্ষক মশায় ঠিক পথটা দেখিয়ে দিন সারা পথ হাতধরে নিয়ে যাবার কোন দরকার

দেখি না। হয়ত আমরা পা ফেল্‌তে ভুল করতে পারি কিন্তু তা বলে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করে শক্তিকে অকেজো করে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সত্য নেই। যে ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে সুফল পাওয়া যাচ্ছে শুধু আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম হবে এ কথার কোন মানে নেই এবং এ ব্যবস্থায় কোন কোন স্থানে সুফল ফলেছে তাও আমরা জানি।

আমাদের শিক্ষালাভের পথে আরও দশ রকমের বাধা আছে কিন্তু সে-সবের বিচার কয়েকবার হয়ে গেছে। শিক্ষকের লক্ষ্য, শিক্ষার আদর্শ নিয়ে যারা তর্ক করছেন তাঁরা তর্ক করুন কিন্তু যাঁরা আমাদের মঙ্গলের চেষ্টায় আছেন তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন পরীক্ষা-সঙ্কটের এই চোরা-বালি থেকে তাঁরা আমাদের উদ্ধার করুন। শিক্ষা যদি যথেষ্ট পাওয়া যায় তবে পরীক্ষা যেমনই হোক তাকে সঙ্কট মনে করবার কোন কারণই থাকবে না। অধিকন্তু আমরা কিছু না শেখবার জন্যে যদি দেহ মন প্রাণ সব জখম করতে পারি কিছু শেখবার জন্যে তার চেয়ে কিছু বেশী কর্‌তে পারব এ সুনিশ্চয়।

আমরা হোমরুলের আবেদন, কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ বা কন্যাপণ নিয়ে চাঁদার খাতা খুলছিনে, আমরা প্রার্থনা করছি যে বর্ত্তমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেন সার্থক হয়ে উঠে। যা'হক করে এটাকে খাড়া করে রাখার কোন ফল নেই, অন্যায় ক্ষতির পরিমাণ তাতে বাড়বে বই কমবে না। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা করুন যাতে প্রধান সমস্যাটার সমাধান হয়, অনুকরণের যুগে পশ্চিমের অনুকরণ ত অনেক করেছি এখন একটু বুঝে অনুসরণ করলে যথেষ্ট উপকার হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৪৩

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অন্নচিন্তা।

:*:-

(১)

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটী পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাক্‌লে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটী প্রাচীন আচার্য্যেরা জেনেছিলেন, যোগবলে। কেননা সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতী সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ঐ সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্য্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটী প্রচার করেছেন সেটী পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলীর মত, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এই খানে তর্ক তুল্‌বেন যে বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation. আর পদার্থ মানে বস্তু নয় বিলাতী দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটীর অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-

ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হ'ল হিন্দু দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মারবার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি কোনও খাঁটি হিন্দু এ সব তর্কে কান দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রোয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটা অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিনিদর্শনের বর্ণনা আছে যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন ; ঐ শাস্ত্রের পারদর্শী না হ'লে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমন কি একটা রসেশ্বরদর্শন আছে যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হ'য়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে ; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুসি হবেন যে শ্রুতিপ্রমাণটা আহৃত হ'য়েছে সেটা তাঁদের সুপরিচিত "রসো বৈ সঃ রসো হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুঁথিতেও অন্নদর্শন ব'লে কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে প্রাচীনকালে এ দেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয় নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাক্‌লে যে তার একটা দর্শনও থাক্‌ত তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আর কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ ক'র্‌বেন না। এবং আমার এই

যুক্তিটী যে সম্পূর্ণরূপে 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত' তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার ক'র্‌বেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন কর্‌লে চল্‌বে না। অপ্রীতিকর হলেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে বলতে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে (১) যে, দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক! একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হতে পারে। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবরুণের উপাখ্যান। আমার সুপণ্ডিত পাঠকগণের অবশ্যই এই শ্রুতি-প্রসঙ্গটী জানা আছে। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বরুণ তাঁকে বললেন তপস্যাদ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা কর। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' বলে দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা করতে বললেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায়

(১) আদি অন্ত ঠিক জানা না থাকলেও এই রকম যে একটা যুগ ছিল এটা জানা আছে। ম্যাক্সমুলর দেখুন।

ভৃগুর বোধ হল প্রাণই ব্রহ্ম। এই রকমে তৃতীয়বারে জানলেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থ বারে বুঝলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌঁছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' নানা রকম সব দুর্ব্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটী কেহই ধরতে পারেন নি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাকলে তবেই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এবং একটু বিচার করে দেখলে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাকবে না। কেননা উপাখ্যানটী শেষ করেই শ্রুতি চারটী পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিষ্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে উঠবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটী পড়লেই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি তার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি যে ঐ সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ঐ sense-বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পারতেন না। ফলে বর্ত্তমান কালে

আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনার' বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একবারে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ঐ সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা করবার মত সৎসাহস তাঁদের সকলেরি ছিল।

যা হোক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামান নি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেন নি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ করছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশী, এবং কিসে ও বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটী রকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশাক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কি বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গালা-দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চটপট ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরাল বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেন না তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে কিন্তু উপার্জ্জন করবে না তার জন্য সটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে শিল্প-

বাণিজ্যে না ঢুকে লেখাপড়া শিখে চাকুরী খুঁজে বেড়ায় বলে বাঙ্গলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষিদের গঞ্জনা শুন্‌ছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সেটা তাদের দেখান কেউ প্রয়োজন মনে করি নে। ভাবটা এই যে নাইবা থাক্‌ল বাঙ্গালীর ছেলের মূলধন নাই বা থাক্‌ল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা গড়ে তোলে না, বড় রকম ব্যবসার মালিক হয়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ঐ রকম ব্যাপার করেছে, তা ত পুঁথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য স্কুল কলেজ সব তুলে দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে আসবার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙ্গালীর ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্ত্তমানে ধনেজনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায় বসে আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎ-পিণ্ডে পৌঁছিতে হ'লে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়াই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙ্গালীর ছেলের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশী সজাগ ও উৎসাহান্বিত করতে হলে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনই ফল পাওয়া যায় না। দেশী শিল্পকে উৎসাহ

দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিকাল ইকনমি' নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, এবং বুঝলেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু স্বরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনী। অথচ এরা যে হাতে কলমে কাজে লাগতে পারে না বা কাজ উদ্ধার করতে পারে না, এমন নয়। এরা অর্দ্ধোদয়-যোগে দেশের দীনতমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে ; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্টমেণ্টের,' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটী যেমন করে' নির্ব্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্ব্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্টমেণ্টের' কর্ত্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয় ; জাতির একটা দুর্নাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কীর গুলিতে টাইগ্রিসের পারে প্রাণ দিতে রাজী হয়, এবং তার শিক্ষানবীশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ ত অতি স্পষ্ট যে এ সকলি কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে, সংসারযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও

বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুঁথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান হয় যাঁরা খুব হীন অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সৎগুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশীরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজী হাতের লেখা লিখ্‌তে আরম্ভ করেই সময় আর টাকা যে একই জিনিষ 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হ'লেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুঁথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্ম্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্ত্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমন কি তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথ্‌তে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গত রকম হৈ চৈ করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উদ্বেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও ঐ চিন্তা আর ঐ চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে' নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এইরকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাক্‌তে হয়, ঔষধও গিলতে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাকেই সব চেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্ব্বেই বলেছি এতে

আমাদের দোষ, কিছু নেই। দোষ পূর্ব্বপুরুষদের যাঁরা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোন স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি। কেননা জানি বেফাঁস কথা যা কিছু ব'লবো তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হ'য়ে চিন্তা করবার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২)

দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হ'লে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্য্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সব চেয়ে ব্যাপক অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্ন-শাস্ত্রের শাস্ত্রী নন তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য, নাম চার্লস্ ডারুইন। ভৃগু-বরুণ-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্ন-তত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারুইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর ভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডারুইন পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছে থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজ মন্ত্রটী পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণ

রক্ষার উপযোগী পর্য্যপ্ত অন্ন বসুমতি যোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমের সঙ্গে জপ করতে করতে পূর্ব্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটে নি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হ'ল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ডারুইনকে দেখালেন। তিনি দেখলেন স্থলে, জলে, আকাশে—অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্ব্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে—অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হ'ল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্চে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব প্রতিযোগিতার আকারে। কোনটা বেশী ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্ত্তিতে সংহার করছেন। শেষ পর্য্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনও রকমে শেষ পর্য্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে ডারুইন কাল জয় করে অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চল্‌তে চল্‌তে একদিন মানুষে এসে

ঠেক্‌ল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে একদিন তা মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ হ'ল। কেমন ক'রে হ'ল সে কথা পণ্ডিত-দের তর্ককোলাহলে অপণ্ডিতসাধারণের কানে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী সবই যেন স্পষ্ট করে বলে দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে থাকবার নয়, এর জন্য একদিন সোণার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার তার এই মূর্ত্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য্য এক ব্যাপার সংঘটিত হল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, মানুষের মূর্ত্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্য্যের মতন জ্বলে উঠল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ্‌ল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারি রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন যেদিন এই মানুষও রাজটীকা ললাটে নিয়ে কাঙালের মত তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হতে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে একটু সুস্থির হওয়ার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজতে এক দেশ হতে আর এক দেশে চল্‌তে চল্‌তে তার পায়ে ব্যথা ধরে উঠল।

এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহু যুগ কেটে গেল। শেষে একদিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে উঠল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব না,—অন্নকে সৃষ্টি করব, স্বল্প অন্নকে বহু করব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেক-বারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোণার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে তপস্যা করলে কালো মাটীর বুক চিরে সোণার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হতে হয় না। মানুষ জানল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটীর তলে জলের অফুরন্ত ধারার মত মাটীর মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে; লাঙ্গলের ফালে তাকে তুলে আনতে জানলে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারুইন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হল। মাটীর টানে উদ্ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে উঠল, শিল্প বাণিজ্যের সুরু হল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোনার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে' মানুষের এই যে যাত্রা এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে' অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য্য অংশ, সেটির বিকাশ হ'ল। মানুষ দেখ্‌ল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই,—তার পরিমাণ যতই অপর্য্যাপ্ত হ'ক, তার প্রকার যতই বিবিধ হ'ক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জান্‌তে আরম্ভ করে' মানুষ বুঝ্‌ল যে তার স্বভাবে একটা কি আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে' সে জান্‌ল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে' যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণিরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশী রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ীর টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হ'ল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথা সর্ব্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিঁড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী। এই লোকে পৌঁছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত করেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ত তা হ'লে অন্ন দাস হলেও মানুষের জীবনে তার সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও

অপচয় হ'ত না। সোনার শিকলে অন্নকে বাঁধলেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরান থাক্‌ত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরতে হলেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চল্‌তে হ'ত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌঁছিতে জানলেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়। আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

(৩)

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হয়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দের পথের যাত্রী দেখে, মানব-জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে', অন্ন চিরদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষের সভ্যতার যে মুক্তির কথা বলেছি সে হ'ল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যতদিন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মত এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে' মানুষকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'ট্রাজেডির' প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্ত্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি

মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপর কর্তৃত্ব করত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী হয়েছিল নিজেকে বিরল করে, আপনাকে দুর্লভ করে। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে এই উপায়টা ব্যর্থ কর্‌ল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হত, তাহলে নামে প্রভু হলেও রোমের শেষ সম্রাটদের মত মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হয়েছে মানুষের সভ্যতার ঐ বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংশ করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংশ করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্ত্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্ত্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হয়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্য্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা জয়ী হয়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হয়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্ত্তমান

কল্পনার মত এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়ত কেবল স্বপ্ন। হয়ত মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে চলতে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে আনন্দের পথে চলতে পেরেছে। ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্ত্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্য্যরশ্মি বিজয়-মাল্যের মত এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষিদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না।

“অন্নং ন নিন্দ্যাৎ”; অন্নের নিন্দা করি নে। “অন্নং বহুকুর্বীত”; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জ্জন করা যায়। মহাকালের দংশনেও ছিন্ন হতে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! ‘অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা’ বলে তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন মধ্যযান পথের পথিক হলে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্ম-লোক হতে ফিরে আসতে না হয় তার নির্দ্ধারণ কর।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-বিচার।

যে দু'দিক হতে বাংলা সাহিত্য বিচার করা হয়ে থাকে, তা হচ্চে ভাষা ও নীতি; আর, যে দু'দিক সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ভাব ও শিল্প।

ভাষা সম্বন্ধে উভয় দলের বক্তব্য একপ্রকার নিঃশেষিত হয়েছে বলে মনে হয়;—এখন যা চলেছে তা হচ্ছে নিছক গালি। আর গালিটা যে কোনদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, কারণ নিশ্চিত-অপরাধীকে দেখিয়ে দিলেও অনিরপেক্ষতা দোষে দোষী হতে হয়। সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়, তখন শুধু সাহিত্যের নয়, সমাজেরও দুঃসময়, কারণ সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতাসম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

ভাষা নিয়ে এই যে বিতণ্ডাটা হচ্ছে, এর ভিতর যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট করে, তা হচ্ছে ভাষার সীমালঙ্ঘন নিয়ে তর্ক। পুথির ভাষার প্রকৃতি কিপ্রকার হওয়া উচিত—তা নিয়ে তর্ক সম্ভব হলেও, শব্দসংখ্যা নির্দ্দেশ করতে যাওয়া যার-পর-নাই বিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলা ভাষা প্রাকৃত হলেও, প্রকৃত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি থাকতে পারে না। সংস্কৃতের রাজ্য হতে সে যদি শব্দ এনে বেমালুম হজম করতে পারে, তবে সেটা তার প্রকৃতিগত, এবং প্রাণধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভাষাকে দুর্ব্বিচনীয় করতে নব্যপন্থীদের আপত্তি

থাক্‌লেও, উহাকে অনির্ব্বচনীয় করতে তাঁদের কোনো আপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁদের তর্কের বিষয় হচ্ছে ভাষার সচলতা, তাকে মন্থরতা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষিপ্র, সতেজ, চতুর করা। ইংরাজী যদি Anglo-Saxon ভাষা হত, তবে তা কখনই এত সম্পদশালী হতে পারত না। Norman Conquest-এর ফলে যখন অজস্র Norman শব্দ তাদের নানা অর্থ-বৈচিত্র্য নিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করলে, তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা রইল না, এবং সে ভাষা Anglo-Saxon ও রইল না, Norman ও হল না—হল বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষা। বাংলা তেমনি প্রাকৃতও নয়, সংস্কৃতও নয়—তা বাংলা।

তারপর নব্যসাহিত্যে দুর্নীতি দেখে যাঁরা এতটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন যে, লেখকদের কশাঘাত করা আবশ্যক মনে করেন তাঁদের শাসনে যে দেশের কল্যাণকামনা অন্তর্নিহিত রয়েছে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঐ দুর্নীতি যে কাল্পনিক, তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবার ধৃষ্টতা আশা করি মার্জ্জনীয়।

নীতির ক্ষেত্রে ইভল্যুসনের নিয়ম কার্য্য করে কিনা, বা কোনও বিশেষ নীতিশাস্ত্র চিরধ্রুব থাকতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে প্রথমে কিছু না বলে,—নব্যসাহিত্যে বর্ত্তমান নীতির সীমা কোথায় লঙ্ঘিত হয়েছে, তা দেখা যাক। "ঘরে বাইরে" দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। "ঘরে বাইরের" ভিতর কেহ কেহ বর্ত্তমান সমাজভিত্তির ভাবী টলটলায়মান অবস্থা দেখে সচকিত হয়ে পড়েছেন, এবং লেখনীর সাহায্যে সম্ভব না হলে, লগুড়ের সাহায্যে এ "কালাপাহাড়কে" সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সাধু। কিন্তু বঙ্গনারীর সম্মুখে কবি কি বিমলাকে আদর্শস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, না বঙ্গযুবকের

কাছে সন্দীপকে আদর্শ নায়করূপে স্থাপন করেছেন? সন্দীপ ও বিমলার বন্ধনহীনতা—যাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলা হয়েছে—কি নিখিলেশের উদারতা, ত্যাগ, প্রেম ও সংযমকে সমধিক মহিমান্বিত করছে না? "ঘরে বাইরে" পড়ে একজন সরল পাঠক বলেছেন, "সন্দীপকে ঘর থেকে বের করে দিলেই তো এ সব হিজিবিজির সৃষ্টি হত না"! নিজের স্নিগ্ধজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়ে কে আদর্শরূপে আমাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে?—নিখিলেশ। বিরাগী না হয়ে ত্যাগদ্বারা ভোগকে কে মহিমান্বিত করছে?—নিখিলেশ। মৃত্যু অপেক্ষাও দারুণ বিপদের সম্মুখে কে স্থির, সমাহিত?—নিখিলেশ। আদর্শ কে?—নিখিলেশ।

সমাজে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা পৃথিবীব্যাপী, এবং সত্য সম্বন্ধ এখনো নির্ণীত হয় নি। তবে স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্বের ভারটা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপানোটাই যে স্বাভাবিক, এ সহজ কথাটি তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয় নি, কারণ তা নাহলে স্ত্রীজাতির মনুষ্যত্বকে একেবারেই খর্ব্ব করা হয়। বার্ণার্ডশ তাঁর "Irrational Knot"-এ এ সত্যটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেছেন। সুতরাং দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখতে হলে, কার্য্যক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদানও আবশ্যক। স্ত্রীজাতি বাঙালীর কাছে কাঁচাকলাজাতীয়। রৌদ্র-বাতাসের সংস্পর্শে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের ভিতর তার যথার্থ স্থান নেবার পূর্ব্বেই তাকে লঘুপথ্যরূপে হজমের চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কারণ এবম্বিধ করাই hygienic। ব্যাধিগ্রস্ত বাঙালীর পক্ষে ও-বস্তুর পরিণত ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে হজম করা দুঃসাধ্য বলে, অপরিপক্ক অবস্থায় রন্ধনের সাহায্যে উহাকে মুখরোচক করার চেষ্টা করতে হয়। এও একটা আর্ট বটে।

কিন্তু তাতে করে যা পাওয়া যায় তা মানুষ নয়—তা পুতুল, এবং সেই পরিবারকেই Ibsen "Doll's House" বলেছেন, যেখানে চালকের ইঙ্গিতে পুতুল নৃত্য করতে থাকে। তাঁর "The Wild Duck" ও "The Lady of the Sea"-তে ও এই বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। শেষোক্ত পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বামীকে সাগরের মতো অসীম, উদার, গভীর ও বাধামুক্ত হতে হবে।

স্বাতন্ত্র্যের সহিত মিলনের সামঞ্জস্য কিরূপে সংঘটিত হতে পারে, এটা সম্ভবতঃ বুঝে ওঠা কঠিন; কিন্তু উভয়ের মিলন তো আর একের বিনাশ নয়;—স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেই মিলন। সুরের মাধুর্য্য ছন্দের মিলকে অনাবশ্যক করে। প্রেমের গভীরতায় ব্যবহারিক বিরোধ লুপ্ত হয়ে যায়, এবং মুক্তির ক্ষেত্রই প্রেমের লীলাভূমি। সম্ভবতঃ নিখিলেশের অসাধারণ ক্ষমাশীলতা কোনো কোনো পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হয়েছে। ক্ষমার রাজ্যে নারীজাতির একচ্ছত্র আধিপত্যে আমরা অভ্যস্ত। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁরা রাজ্ঞী হয়েছেন। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বা নিষ্ঠুরতা তাঁরা যখন নম্র হয়ে মার্জ্জনা করেন তখন তার ভিতর কোনো অসাধারণতাই আমরা দেখতে পাই নে, কেননা সেটা পুরুষের প্রাপ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং স্ত্রীসম্বন্ধে স্বামীর অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম আমাদিগকে এতই রুষ্ট করে তোলে যে, আমরা যষ্ঠী উত্তোলন করতে বাধ্য হই। বিমলা সম্বন্ধে নিখিলেশ সীতানির্ব্বাসনের পালা যে অভিনয় করেন নি—এ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে।

এরূপ রুষ্ট হওয়ার মূলে একটা গুরুতর কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে অতীতনামক শব্দটির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে না পারা। জগতে কিছুই

চিরকালের মতো হয়ে যায় না, অর্থাৎ কোনোকিছুরই সমাপ্তি নেই। কথাটি "Being" ও "Becoming" সম্বন্ধে মামুলী কুটতর্ক নয়—ইহা একটি সত্য; এবং এটি বর্ত্তমান যুগের একটি বিশেষ-সুর, যার প্রধান গায়ক Maurice Maeterlinck ও Rudolf Eucken।

Eucken বলেছেন—"If all depends on the slender thread of the fleeting moment of the present, which illumines and endures merely for a twinkling of an eye, but to sink into the abyss of nothingness, then all life would mean a mere exit into death......Without connexion there is no content of life"। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভিতর দিয়ে অতীত যে নিয়ত আপনাকে গড়ে তুলচে, তা ভুললে অতীতের সমগ্র চেহারা দেখা হবেনা, সুতরাং খণ্ডভাবে দেখলে তাকে ভুল দেখা হবে! অতীত অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত পদার্থ নয়,—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংঘাতে সে রূপান্তর প্রাপ্ত হতে থাকে। Thomas Hardy তাঁর "Tess of the Durbervilles"-এ Tess-এর চরিত্রে এ সত্যটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। নিখিলেশ সেই সমগ্রতার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে ছিল। সে সত্য চেয়েছিল, মোহ চায়নি। সকল বিরোধের ভিতরেও নিখিলেশ প্রেমের শাশ্বতরূপ হারায়নি। তার মানসী, অপরিচ্ছন্ন দর্পনের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ, বিকৃত হয়েছিল মাত্র। তাই নিখিলেশ বল্‌ছে—

"এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখন

বলি আয়নাটাই আমার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখন ছবি সরে যায়। থাক্‌না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জল করে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।”

সাহিত্যে যে পদে পদে টীকার আবশ্যক হয়ে পড়ে, এটা মানব-জাতির দুর্ভাগ্য। শুধু টীকার আবশ্যক হলেও এতটা গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হত না,—বিশদ টিপ্পনির আবশ্যকতা আরো বেশী। বাংলা নব্যসাহিত্যে টিপ্পনি মানে ভ্রান্তির সঙ্গে লড়াই;—comment নয়,—vindication। নব্যপন্থীরা শুধু ভাললাগার কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। নজির না দেখিয়ে, কারো বিশেষ লেখা ভাল লাগচে, এ কথা প্রকাশ করা বিপদ-সঙ্কুল।

সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেই সমালোচনা আছে। ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনায় সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর “Poetry is a criticism of life” এখনো বহু সাহিত্যিকের চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করছে। এঁদের সমালোচনায় সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। মনটাকে যতদূর সম্ভব সংস্কার বর্জ্জিত করে এঁরা সত্যলাভের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য-প্রাসাদে এঁরা যেন আমাদিগকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং অবরুদ্ধ দ্বার-গুলিকে উদঘাটিত করে ভিতরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে চমৎকৃত করছেন। অপরপক্ষে বিদেশীয় সাহিত্যে বিরুদ্ধ সমালোচকও রয়েছেন। Ibsenকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। Cardinal Newmanকে

বিস্তর লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। Dante বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের দুর্ভাগ্য কাব্যকলাঘটিত নয়;—এঁদের বাণীর অপূর্ব্বতার জন্য; রসভাগের জন্য নয়;—বস্তুভাগের জন্য।

ইদানীং সমালোচনার মাপকাঠি আবিষ্কার করতে অনেকেই লেগে গেছেন। প্রথম আবিষ্কারের গৌরব যাঁর ভাগ্যেই পড়ুক, মাপকাঠিটি ব্যবহার করতে হলে যে ক্ষমতাটির একান্ত প্রয়োজন তা এখনি বলে রাখা যেতে পারে;—সেটি হচ্ছে সহানুভূতি। লেখকের সঙ্গে অনুভব করবার যাঁর ক্ষমতা নেই, তিনি সমালোচনার আসরে নামলে সাহিত্যের কোনো উন্নতি তো হতেই পারে না, বরং অশেষ অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা। নব্যসাহিত্যের ভাবের দৈন্য ও ভাষার দৈন্যের প্রতি সম্প্রতিঅঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়েছে। "ভাষার দৈন্য" বাক্যটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখনো সমঝে উঠতে পাচ্ছি নে। সবুজ পত্রীয় ভাষাকে "বীরবলী" বা "বিদ্‌ঘুটে" যা-ই বলা চলুক, দীন বললে শুধু "দীন" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অসাবধানতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ভাষার phonetics-এর সঙ্গে তার দীনতার কোনোই সম্বন্ধ নেই।

নব্য সাহিত্যের আর একটি দুর্নাম এই যে, তা সোজা কথাকে সোজা করে বলতে জানে না বা বলে না,—বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে যে জিনিসটুকু পাওয়া যায়, তা এতই সামান্য যে মজুরী পোষায় না।

ঠিক একই ভাবকে পুনঃপুনঃ নানা কথায় প্রকাশ করলে, অর্থাৎ একই কথা একশো বার বললে তার জন্য একটা জবাবদিহি নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের বিভিন্নতা দ্বারা Shades of meaning সূচিত হচ্ছে কিনা, তা খুঁজে দেখা উচিত। তা ছাড়া শব্দরাজ্যেও শিল্প

আছে, এবং সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধা নেই। গদ্যসাহিত্যেও সঙ্গীতের আবশ্যক। নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা এ সাহিত্যের ভাবে দেশের অভাব মোচন হচ্ছে না। কূপ খনন, প্রাইমারি বিদ্যালয় সংস্থাপন, ম্যালেরিয়া দমন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, নব্য সাহিত্যিকগণ চিত্তের স্বাধীনতা ওরফে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দান করছেন, নয় তো ব্যর্থজীবনের সার্থকতা প্রমাণ করছেন, বা আলস্যের নিগূঢ় মহিমা কূটতর্কের সাহায্যে প্রতিপাদন করছেন—এক কথায় হেলাফেলায় জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—ওরূপ করার ভিতরে যে রমণীয়তা আছে—তা পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। এই ত হচ্ছে সমালোচকদের মত।

এককালে ইংলণ্ডেও কোনো কোনো লেখক "Art for art's sake" বাক্যটি সইতে পারেন নি! কিন্তু এখন সেদিন ঘুচে গেছে। Blackmore-এর "Lorna Doone" নিছক romance, কিন্তু রসসৌন্দর্য্যে epic-এর সৌভাগ্য লাভ করেছে। Hawthorne-এর "Scarlet Letter", Poe-এর "Tales of Mystery & Imagmation" শুধু রসিকের জন্য লিখিত। "Quo Vadis"-এ Cæsar-এর চরিত্র ওরূপ ভাবে বর্ণনা না করলে ইতিহাস কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হত না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক সবুজ পত্র-সম্পাদক মহাশয় বিচার করেছেন, এবং তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে উক্ত ব্যাধি দমনের

চেষ্টা না করেও সাহিত্য চলতে পারে, এমন কি ওরূপেই সাহিত্যের চলা উচিত।

ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে, এবং সেজন্য তাঁকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, কেননা শাস্ত্রেই রয়েছে "আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,"—অতএব তাঁর সাতখুন মাপ। কিন্তু মাটির কবি এ বিপুল সৃষ্টি-কাব্যের ভিতর আনন্দ আবিষ্কার করতে গেলেই তাঁর দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকে না। লোক চক্ষুর অন্তরালে লক্ষফুল বিনা লক্ষ্যে ঝরে পড়চে; লক্ষগ্রহ বিনালক্ষ্যে নৃত্য করচে; লক্ষজীব বিনালক্ষ্যে দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসচে, যেন শুধু ফিরে যেতে; লক্ষহাসি হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে; লক্ষকান্না বৃথাই বক্ষবিদীর্ণ করচে। এ সকল বিচিত্র ব্যাপারের সংমিশ্রনে যে মহাকাব্য রচিত হচ্ছে, তা যে ভগবানের শুধু লীলাখেলা—তা মানতে তো কারো আপত্তি দেখছি নে!

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই—সুতরাং সাহিত্যেও—সত্যকে জানতে হলে প্রথমতম এবং প্রধানতম আবশ্যকীয় জিনিস হচ্ছে চিত্তের স্বাধীনতা। মানুষের বিশেষত্ব হচ্ছে বিচার-ক্ষমতা, অন্ততঃ বিচার-প্রবৃত্তি। যেখানে সে প্রবৃত্তি নেই, সেখানে তর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা শুধু অরণ্যে রোদন।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

পুষা

আচার ও বিচার।

আচার ও বিচারের মধ্যে বিবাদটা সম্প্রতি যেন একটু বেশী মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। উভয়ের এই গরমিলটা যে নিতান্ত একেলে—সেকালে যে ইহার নামগন্ধ ছিল না, এমন একটা আক্ষেপের কারণ নিশ্চিতই নাই। মানুষ যে দিন হইতে এই ধরাধামে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, সেই দিনেই এই বিবাদের সূত্রপাত। তবে অবশ্যই ইহা ভাদ্রের ভরা নদীর মত চিরক্ষণই খর একটানা বয় না, ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি, উজান ভাটি সবই আছে।

আচার যে প্রথম দেখা দেয়, সে তো বিচারেরই হুকুমে। দুয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকাই ত সামাজিক সুস্থতার অবস্থা। সমাজের দেহে যখন ব্যাধির প্রকোপ ঘটে, তখনই না এই বিরোধের সূচনা। সমাজ যে কখনই সুস্থ থাকে না এমন নয়, তাই বিচার ও আচারের মিলও অনেক সময় অনেক স্থলে টিঁকিয়া থাকে। কিন্তু যখন বিবাদ বাধে, তখন আর সহজে মিটে না। গালাগালি থেকে হাতাহাতি, এমন কি রক্তারক্তিতেও দাঁড়াইতে পারে।

তবে সুখের বিষয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ এখন অনেকটা মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে। অবশ্য বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাপারে ইহার ঠিক উল্টা। যে দিন ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ উভয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে দিন জগতে মহা মঙ্গলের যুগ দেখা দিবে। বর্ত্তমানে বিচার ও

আচারপক্ষের বিরোধে ততটা হলাহল না থাকুক, ইহা যে শুক ও শারীর দাম্পত্য কলহের মত সহজে মিটিবার নয়, এটা ঠিক। এখন সভ্য সমাজে বিচার ও আচার পূর্ব্বের ন্যায় আর রক্তচক্ষে পরস্পরে ভাল ঠুকিয়া দাঁড়ায় না বটে, তাহা বলিয়া রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি এখনও বড় কম নাই। এখন এক পক্ষ অপর পক্ষকে আগুনে পোড়ায় না, বা জলে ডুবায় না বলিয়াই যে একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া কেবলই সুধাবচনে বুঝাইতে থাকে, সমগ্র মানবসমাজ আজও এতটা সমুন্নত নয়। যাই হক, এখন এই বিরোধের বিষয়ে কিছু বলিবার আগে ইহার প্রকৃতিটা একটু বুঝিতে চেস্টা করা যাক।

একটা প্রথা যখন দেখা দেয়, তাহার মুলে একটা বিচার ও যুক্তি অবশ্যই থাকে। ভাষান্তরে প্রথাটাকে বিচারের একটা সম্পত্তিবিশেষ বলা যাইতে পারে। নিজের জিনিস হইলেও বিচার, প্রথার রক্ষার ভার চিরদিন নিজের হাতে রাখে না। কালে সেটা আচারেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। প্রথাটাকে যখন কাজের পর কাজে লাগান হয়, বিচার আর তাহাকে লইয়া প্রতিপদে নাড়া-চাড়া করে না। সেটাকে আচারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে কতক নিশ্চিন্ত থাকে। অনেক সময় বহুদিন ধরিয়া বিচার তাহার খোঁজ-খবরও বড় রাখে না। আচার কিছুদিন সেটাকে চালায়ও বেশ। কিন্তু সে ক্রমে সেটাকে নিজেরই একটা শক্তির বিকাশ বলিয়া মনে করে, সেটার সঙ্গে বিচারের যে কিছু সম্পর্ক আছে, তাহা সে যেন এক রকম ভুলিয়াই যায়। এইরূপে প্রথাটা ক্রমে আচারের হাতে একটা উৎপীড়ন ও উপদ্রবের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিচার হইতে বিচ্যুত হইলে, আচার একটা অন্ধ শক্তি মাত্র। অনেক সময় এই মোহান্ধ আচার নিজের প্রভাব ও জেদ বজায়

রাখিতেই বেশী সমুৎসুক, সমাজের হিতের দিকে সে ফিরিয়াও তাকায় না। তাই যে প্রথাটা প্রথমে মঙ্গলের মুর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল আচারের জোর ও জবরদস্তিতে সেটা ক্রমে মহা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে।

একটা বিশেষ উদাহরণ লইয়াই ব্যাপার দেখা যাক্। বাঙ্গালায় কৌলীন্য-প্রথা অবশ্যই প্রথমে সৎ বিচারবুদ্ধি হইতেই দেখা দিয়াছিল। গুণের আদর করা সমাজের পক্ষে অবশ্যই হিতকর। কৌলীন্য-প্রথা মূলতঃ এই গুণের আদর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রথাটী যখন অন্ধ আচারের কবলে পড়িয়া গেল, তখন কোথায় তাহার সেই প্রাথমিক মঙ্গল মুর্ত্তি! সূর্য্য-বংশের একজন গুণসম্পন্ন রাজা যখন মুনি-পুত্রের শাপে রাক্ষস হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার উপদ্রবে দেশময় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। কৌলীন্য-প্রথায় কাহার অভিশাপ লাগিল জানি না, কিন্তু তাহার উপদ্রবে বড় কম রাক্ষসী শক্তির লীলা দেখা যায় নাই। ঐ যে নৈকষ্য কুলীনপ্রবরের চিতাগ্নির সঙ্গে কাহন দুই চার বাঙ্গালী রমণী—তাহাদের বয়সের ভিন্নতা শুধু পাঁচ হইতে পঞ্চাশের মধ্যেই নয়, মানুষের আয়ুষ্কাল ঐ উভয় সংখ্যার অপর পার্শ্বেও যতটা যাইতে পারে, তাহাও বাদ পড়ে না—অম্লান বদনে শাঁখা ভাঙ্গিতেছে ও সিঁদুর মুছিতেছে, কৌলীন্য-প্রথার এই বিকট লীলাটা রাক্ষস দেহধারী সৌদাসের উপদ্রবকেও কি হার মানায় নাই? আশার কথা, অভিশপ্ত সৌদাস যেমন শেষে শাপমুক্ত হইয়াছিল, এই বাঙ্গালা দেশটাও ক্রমে এই নাগপাশটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। বিচার আবার আচারের কবল হইতে এই প্রথাটীকে কাড়িয়া লইতেছে।

তবে পৃথিবীর সকল আচারেই কি শেষে এতটা কালো রংয়ের পোঁচ পড়ে? নিশ্চয়ই নয়। কৌলীন্য-প্রথা এতটা বিকট মুর্ত্তি

ধরিয়াছে বলিয়া যে প্রথামাত্রেই শেষে উহার মত হইয়া দাঁড়ায়, অবশ্যই এ কথা বলা চলে না। কিন্তু বিচার ও যুক্তির সংস্পর্শ ছাড়িয়া বহুদিন একা থাকিলে, প্রথা যে ক্রমে বিগড়াইতে থাকে, এটা সত্য কথা।

(২)

কৌলীন্য-প্রথার মত সকল প্রথার এতটা অপব্যবহার না ঘটুক, কিন্তু অনেক প্রথারই শেষে সুযোগ্য ব্যবহার থাকে না। বিচার তাই আচারের হাত থেকে সেগুলো লইয়া একটু মাজা ঘষা করিতে চায়। দেশের যে অবস্থার মধ্যে একটা প্রথা দেখা দেয়, সে অবস্থা কি চিরদিন একই থাকে? চুরি ও ডাকাতির সময় শ্যামচাঁদের অর্থ রূপচাঁদের পেটরায় থাকুক, ভালই। কিন্তু তাহা বলিয়া যখন উপদ্রব চলিয়া যায়, তখন শ্যামচাঁদ তাহা নিজের হাতে লইয়া কেন নিজের কোন কাজে না লাগাইবে? রূপচাঁদের তাহা এমন করিয়া আটকাইয়া রাখা কেন?

আচ্ছা, এবার ধরা যাক বাঙ্গালার অবরোধ-প্রথা। ইহা নিশ্চিতই হিন্দুত্বের একটা বিশেষ বা সনাতন অঙ্গ নয়। যদি তাহা হইত, তবে সমগ্র হিন্দুর মধ্যেই ইহার প্রভাব দেখা যাইত। হিন্দুমান্দ্রাজ বা হিন্দুবোম্বায়ে এই প্রথার নিদর্শন খুব কমই মিলে। বাঙ্গালাতেই ইহার বিশেষ আঁটাআঁটি। মুসলমান-যুগের পূর্ব্বে এখানেও ইহার আধিপত্য এতটা ছিল না। ঠিক কোন সময়ে বা কোন কারণে ইহা প্রথমে দেখা দিয়াছিল, তাহার আলোচনা এখন নাই করিলাম। কিন্তু এই প্রথাটা যে বিশেষ প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা যে অকারণে বাঙ্গালী রমণীকে ঘরের কোণে আটক করিয়া রাখে নাই, এটা বোধ

হয় সকলেই মানিবেন। একটা প্রবল অত্যাচারের হাত থেকে দুর্ব্বলের রক্ষার জন্যই ইহার সৃষ্টি, অনেকে এইরূপ বুঝেন। ফল কথা একটা সাময়িক অবস্থার বিচার হইতেই এই আচারের আবির্ভাব। কিন্তু এখন আবার সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, বিচার এই আচারটাকে একটু বদলাতেই চায়। আচার বিচারের এই কাজে বাধা দিতে ছাড়ে নাই, কিন্তু দুই এক পা করিয়া হঠিয়াছে। যাঁহারা এই প্রথাটাকে একটু বেশী মাত্রায় লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর রাগিয়াই উঠি, আর ঠাট্টাই করি কেহই আর এই প্রথাটিকে পূর্ব্বের মত কড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

বিচারের তাড়নায় আচারের বাঁধন ক্রমে শ্লেথ হইতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যরূপারা ক্রমে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রস্নাত রেলওয়ে-মঞ্চে গিয়া দেখা দিতেছেন। লোকের ভিড়ের মধ্যে দেড় হাত ঘোমটা দিয়া কি আর দোড়ধাপ করা চলে, কাজেই সেটারও বহর ক্রমে কমিয়া আসিল। অসূর্য্যম্পশ্যরূপার যুগটাকে এখন আর বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। যেরূপ ব্যাপার, কালে এ শব্দটা দেখিতেছি শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসেই থাকিয়া যাইবে, বাঙ্গালীর গৃহবাসে উহা বড় আর লক্ষিত হইবে না।

তবেই দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ দুই প্রকার স্থলে বিচার আচারকে লইয়া একটু বোঝা পড়া করিতে চায়। এক, যখন প্রথা-বিশেষের অপব্যবহার ঘটে, দ্বিতীয়, যখন দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সেটা খাপ্ খায় না। এই দুই রকমের দুইটি মাত্র প্রথার এখানে উল্লেখ করা গিয়াছে। সমগ্র মানব-সমাজ ও তাহার ইতিবৃত্ত খুঁজিলে বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। তবে এইরূপ প্রথাগুলি ঐ

দুইটা ভাগের ঠিক একটা ভাগে পড়িবেই, ইহা বলা চলে না। কারণ এই রকম একটা প্রথার দুই রকম বিশেষত্বই থাকিতে পারে, অশুভ ব্যবহার ও অযথা ব্যবহার একেরই এই দুইটী দিক থাকিতে পারে। সাধারণত এই প্রকারের সকল প্রথাতেই কিছু না কিছু এই দুইটী লক্ষণই দেখা যায়। তবে অনেক স্থলে একটী লক্ষণকে আর একটীর চেয়ে বড়ই প্রবল মনে হয়। এই লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারেই এই প্রকার একটী মোটামুটি ভাগ করা চলে। ফল কথা, প্রথাবিশেষের অযোগ্য বা বেখাপ্পা ব্যবহারের মধ্যে কিছু না কিছু অশুভ ঘটে, আবার অশুভ ব্যবহারটা তো অযোগ্য বা বেখাপ্পা বটেই।

(৩)

যাক্, এ সম্বন্ধে বিভাগটা সূক্ষ্ম না হউক, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রথাগুলা লইয়াই যে বিচার ও আচারে লড়াই বাধে এবং সে লড়াই যে সহজে মিটে না, এটা ঠিক। সমগ্র মানব-সমাজ ধরিলে পৃথিবীর বক্ষে এই লড়াই যে বারমাসই চলিতেছে, এরূপ বলাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। কারণ আচারের অন্ত নাই, বিচারের বিরাম নাই। একটী বিশেষ দেশের একটা বিশেষ আচার লইয়া অবশ্যই অনেক সময় কোন রকম গোলযোগ নাও থাকিতে পারে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আচার ও বিচারের সম্পর্কটা একেবারে অহি-নকুলের সম্পর্কের মত নয়। প্রথমে দুয়ের মধ্যে একটী বিশেষ মাঁখামাখি থাকিবারই কথা—আর এইটীই হইল সামাজিক সুস্থতা বা আরামের অবস্থা। কিন্তু ছোট খাটো দেশসম্বন্ধে যাহাই হউক, সমগ্র পৃথিবীময় এই আরামটা কখন লক্ষিত হয় বলিয়া মনে হয় না।

যে ব্যাপারেই হউক আরামের অবস্থাটা যে বেশ সুখকর, এ সম্বন্ধে বড় দ্বিমত নাই। কিন্তু বিসম্বাদকে বর্জ্জন করিয়া কেবল আরামে কাল কাটানো বুঝি প্রকৃতির অভিপ্রায় নয়। বিশ্বপ্রকৃতিরও নয় মানবপ্রকৃতিরও নয়। অন্ততঃ দুয়ের ভাগ্যে একটানা আরামের ভোগ বিধাতা যেন লিখেন নাই। তাই বিশ্বের মাঝে একটা না একটা সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে, মানব-সমাজেও এই সংঘর্ষের কখন অনাটন হয় না। বিশ্বের তুলনায় মানব-সমাজ অবশ্যই অতি ক্ষুদ্র। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেক সময়েই আমরা একটা আরামের আশা করিতে পারি। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না কেন? এখানে হিসাবে যে একটু ভুল হইতেছে। বিশ্বের কাছে মানব-সমাজ নিশ্চয় খুবই ছোট সমুদ্রের কাছে জলবিন্দু, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এ কথাটা যে শুধু বাহিরের আয়তনেই খাটে। মানবের যে বাহির ছাড়া একটা অন্তর-আয়তন আছে। বিশ্বের সেটা আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ তাহার খোঁজ আমরা বড় পাই নাই। মানবের বাহিরের চেয়ে এই অন্তরের আয়তনটা এত বেশী যে আমরা তাহার মাপজোখ কোন দিন করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আচার ও বিচারের সংঘর্ষটা মানবের এই অন্তর-রাজ্যের অন্তর্গত। তাই এই বিপুল মানসক্ষেত্রে ইহার বিরতির আশাটাও যেন সুদূরপরাহত।

এখন দ্রষ্টব্য বিচার বলিয়া এই জিনিসটা দেখা দেয় কোথায়? অবশ্যই এটা একটা দৈব বিড়ম্বনা নয়। বিচার ও আচারের ভাঙ্গা-গড়ায় দেবতারা কোন হাত লাগান না। আচার মানুষেই গড়ে, ভাঙ্গেও তাহা মানুষে। অনেক সময় পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া গড়ে, আবার অনেক সময় একজনের মাথাতেই আসে, শেষে পাঁচজন

আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। গড়ার বেলা যেমন, ভাঙ্গার বেলায়ও তেমন। হয় একজন, নয় পাঁচজনে মিলিয়াই বিচারের হাতুড়ী তোলে। যাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ ইহাঁদেরও হাতুড়ী ধরিতে হইয়াছে। নিজেদের হাপরে দেশের অনেক আচারকে ইহাঁরা ভাঙ্গিয়া পিটিয়া অন্য রকম করিয়া গড়িয়াছেন। ইহাঁদের অপেক্ষা কম নামজাদা লোকেরাও এ কাজে হাত দিয়াছেন। ক্ষমতার তুলনায় তাঁহারও তাঁহাদের সময়ের বড় কম গণ্য ব্যক্তি নহেন। নানক, কবীর, লুথার, নক্স—ইহাদেরও নাম পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবের স্থান পাইয়াছে। ধরণীর বক্ষে বর্ত্তমানেও এইরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। ইহাঁদেরও ললাটে প্রতিভার জ্যোতি দেদীপ্যমান। চারি পাশের আবরণ সেটাকে যতই ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করুক, তাহার প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না।

(৪)

আচার জিনিসটা কি নিতান্তই ভূতের বোঝা, ওটাকে যে কোন রকমে সমাজের ঘাড় হইতে নামনই কি উন্নতির একমাত্র নিদর্শন? উহা কি কেবলই জগদ্দল-পাথরের মত মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া রাখে, উাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই কি মানুষ অমনি হাউয়ের মত উপরের দিকে ছুটিয়া যায়? এমন একটা অসম্ভব ধারণা কাহারও আছে কি না জানি না, আচারকে এতটা অমঙ্গল মনে করিবার কোন কারণই নাই। আচার আষাঢ়ে গল্পের ভুঁইফোড় রাক্ষসের মত আকাশ

পাতাল হাঁ করিয়া সহসা নিজের বিকট মূর্ত্তি বাহির করে না, উহা বাস্তবিকই বিচারের পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতেই উদ্ভূত হয়। এমন পবিত্র আকারে যাহার জন্ম তাহাতে মানুষের কোন হিত সাধিত হয় না, এ কথা বলিলে মানিবে কে ?

বাস্তবিক যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত মহাবীরের মতই আচারের কর্ম্মশক্তি অপরাজেয়। লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে বিচার যতদিন এই সত্যকে নিয়মিত রাখে, ততদিন তাহা দ্বারা মানুষের কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আচারকে বাদ দিয়া যদি শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজগুলা চালান হইত, তবে কার্য্যের ক্ষেত্র কখন তেমন ব্যাপক হইত না, কাজও তেমন জোরে চলিত না। সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মত বিচার প্রতি পদে এতটা যুক্তি ও তর্কের ওলট-পালট করিত যে তাহার কাজের অবসর কমই মিলিত। তাহা ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির উপর সকল মানুষের তো সমান দখল নাই। তাই মনে হয় শুধু বিচারের হাতে কাজের ভার থাকিলে, কাজটা বড়ই ঢিমে চলে, এমন কি অনেক স্থলে একেবারে হয়তো চলেই না।

পৃথিবীর কোন জায়গায়ই আজও এমনটা ঘটে নাই। আচার ও বিচার চিরদিন সর্ব্বত্র পাশাপাশি আছে। কখন দুইয়ে মিলিয়া একসঙ্গে মানবের উন্নতির পথ সাফ করে, আবার কখন বা দুজনে হাতাহাতি ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতেই মানবসমাজকে ঠেলিয়া ক্রমে উচ্চের দিকে লইয়া যায় যদি বা কখন এই ঠেলাঠেলির মধ্যে সমাজটা একটু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে, সে অধঃপতন, সাময়িক। তাহাকে আবার উঠিতেই হয় এবং যতদিন না একটু সাম্যের অবস্থা আসে, ততদিন ধাক্কা খাইতে খাইতেই চলিতে হয়। এইরূপ বিপরীত ধাক্কার মধ্যে উন্নতির

গতি কখনই দ্রুত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া নিয়তি যে মানব-সমাজের ললাটে কখনো একটা দুরপনেয় চিরস্থবিরত্বের রেখা টানিয়া বসে, এ বিশ্বাস করা চলে না।

তবেই বুঝিতেছি, মানব-সমাজে বিচার ও আচার দুয়েরই প্রয়োজন। একটা অথবা অন্যটাকে ধরিলেই আমাদের চলে না। যাঁহারা আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা আচারের পাট একেবারে লোপাট করিয়া কেবলমাত্র বিচারকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সমাজের পরিচালনায় বিচার রাজা, আচার তাহার কার্যাধ্যক্ষ। যেখানে আচার বিচারকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে কিংবা ঐরূপ হইতে চেষ্টা পাইয়াছে বিচারপক্ষীয়েরা সে স্থলে বিচারকে আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র, কার্য্যাধ্যক্ষের পদটাকে একেবারে উঠাইয়া দেন নাই। তাঁহারা কখনও বা বিদ্রোহী কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে অনুরক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া, আবার কখন বা পূর্ব্বের কার্য্যাধ্যক্ষটিকে শাসনে ও সদুপদেশে প্রকৃতিস্থ করিয়া সমাজের পরিচালনায় সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচারের কার্য্যশক্তির বিলোপ করা কাহারও অভিপ্রেত নয়, সেই শক্তিকে বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখাই বিচারপক্ষীয়ের উদ্দেশ্য। যখন কোন আচার সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়ায়, তখন এ উদ্দেশ্য সাধন করা বড় সহজ নয়। একটা বিষম সংঘর্ষের সম্ভাবনা তখন আছেই।

বর্ত্তমানে ঐ সম্ভাবনাটা সত্যে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবী ব্যাপিয়া বলিলেই হয়, এখন এই বিচার ও আচারের একটা মহা সংঘর্ষ চলিতেছে। আমাদের দেশটা পৃথিবী ছাড়া নহে, এখানেও যে সেই সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। পরিণামে ন্যায়েরই জয়, এ আশা

মানুষ চিরকালই করে, দেবতাও সে আশা ভঙ্গ করেন না। সংঘর্ষ যদি অনিবার্য্যই হয়, তবে তাহা চলুক, কিন্তু ইহাতে বিদ্বেষটা যেন বেশী জা৷গয়া না উঠে, উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে সমাজের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল নাই।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

শরৎ।

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোণার আবির
ধরেছে সোণালি রঙ সবুজ প্রান্তর ॥

ক্ষীণপ্রাণ সুকুমার সলজ্জ মন্থর
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোণার স্বপন আজ প্রকৃতি কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর ॥

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া।
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া ॥

আলোর সোণার পাতে মোড়া নভদেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা ;
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই ঘন কেশ ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কংগ্রেসের দলাদলি।

সম্প্রতি বাংলায় কংগ্রেসের দল যে দু'টুকরো হয়ে পড়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাদের দেশে যাত্রার দল বেশী দিন গোটা থাকে না, একদিন-না-একদিন তার ভিতর থেকে একটা-না-একটা ভাঙ্গা দল বেরিয়ে পড়েই পড়ে।

আমি যখন ছোট ছেলে, তখন বাংলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল, তার নাম বৌ-মাষ্টারের দল। সেই দল ভেঙ্গে যখন দু'দল হল, তখন উভয় দলই নিজেদের বৌ-মাষ্টারের দল বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। দেশের লোক,—কোন পক্ষের দাবী ঠিক, তা ঠিক কর্‌তে না পেরে,—এই নামের মামলার একটা দু-পক্ষের-মনরাখা-গোছের মীমাংসা করে দিলে। যে দলে জুড়ি বেশী আর ছোকরা কম, তার নাম দিলে বৌ-মাষ্টারের দল,—আর যে দলে ছোকরা বেশী আর জুড়ি কম, সে দলের নাম রাখলে বৌ-মাষ্টারের ভাঙ্গা দল

আজকের দিনে, কলিকাতা সহরে, যখন কংগ্রেসের উভয় দলই নিজেদের অভ্যর্থনা-সমিতি বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমার মতে এ দুয়ের ভিতর যে দলে জুড়ি বেশী ছোকরা কম, সে

দলকে পুরোণো বৌ-মাষ্টারের দল—আর যে দলে ছোকরা বেশী জুড়ি কম, সে দলকে নতুন বৌ-মাষ্টারের দল বলাই সঙ্গত। এ দুটি নাম এই দুই দলের গায়ে যে কেমন খাপে খাপে বসে যায়, তা যাঁর চোখ আছে তাঁকে আর দেখিয়ে দিতে হবে না।

এ দলাদলির কারণটা যে কি, তা আমাদের বুঝে দেখা আবশ্যক।

এবার কংগ্রেসের যাত্রা শুনতে ভারত-সাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তা স্বয়ং মন্‌টেগু সাহেব, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে এদেশে আস্‌ছেন; এবং গুজব এই যে, তাঁকে খুসি করতে পারলে, তিনি আমাদের একটা মস্ত বড় পেলা দেবেন—স্বরাজ্য। সুতরাং এবারে কে মূল গায়েন হবেন—তাই নিয়ে যত মারামারি। মন্‌টেগু সাহেবের মনের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; কার গলা শুনে তিনি খুসি হবেন আর কার গলা শুনে তিনি চটে যাবেন,—পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ, এ দুয়ের ভিতর কোনটি তাঁর বেশী পছন্দসই—সে কথা বলা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কেননা আমরা হচ্ছি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নই। যেহেতু আমাদের কাজ হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, আর এঁদের পরের খেয়ে দেশের গরু চরানো,—সে কারণ আমরা অবশ্য এঁদের চাইতে ঢের বেশী নির্ব্বোধ জীব। তবে সাহিত্যের দিক থেকে এ কথা আমরা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট যে বক্তৃতা পাঠ করবেন, তা পাঠ করে আমরা খুসি হব; কেননা তাতে এমন একটি জিনিস থাকবে, যা কংগ্রেসের খাতে

নেই;--সে হচ্ছে Style। কংগ্রেসী-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, সে সাহিত্য গড়া যেমন সহজ, পড়া তেমনি কঠিন। মামুলি কংগ্রেসী সাহিত্যের দুধে পৌঁছনো যে কতটা অসম্ভব, তার পরিচয় পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে, এবং ইংরাজি ভাষাতেও যে খাঁটি বাঙ্গলা বক্তৃতা করা যায়, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে।

আবার এ কথাও শুনতে পাই যে, ঝগড়াটা আসলে গায়ক নিয়ে নয়,—পালা নিয়ে। এক দলের মতে নাকি পালাটা হওয়া উচিত "ভারতভিক্ষা", আর এক দলের মতে "ভারতসঙ্গীত"।

পুরোণো দল নূতন দলকে বলছেন যে, অর্ব্বাচীন তোমরা যদি গান ধরো—

"বাজরে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"—

তাহলে তোমরা সত্য সত্যই শিঙ্গে ফুঁক্‌বে।

অপরপক্ষে নতুন দল পুরোণো দলকে বলছেন যে, প্রাচীন তোমরা যদি গান ধরো—

"কি শুনিরে আজ, পুরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ-ধ্বনি কেনরে হয়"—

তাহলে সে আনন্দধ্বনি বস্তুতঃ আক্রন্দধ্বনিই হবে।

কথায় যে শুধু কথা বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে তার সুরও চড়ে যায়। তাই দু-পক্ষই আজ চড়া সুরে কড়া কথা বলতে সুরু করেছেন, —অবশ্য পরস্পরকে। সে সব কথার অলঙ্কার বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে—নবীন দলের মতে, কংগ্রেস এবার প্রাচীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের কীর্ত্তনের চোটে দশের দশা ধরবে, আর দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না; আর প্রবীণ দলের মতে, কংগ্রেস এবার নবীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের নর্ত্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূয়যজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।

এ দুই পক্ষের কোন পক্ষ ঠিক বলা কঠিন। কেননা উভয় পক্ষেরই নিজের নিজের হয়ে দু চার কথা বলবার আছে। পুরোণো দল বলেন—দেখো, আমরা আজ ত্রিশ বৎসর ধরে চাইতে চাইতে চাওয়া বিষয়ে পাকা হয়ে উঠেছি; সুতরাং মন্‌টেগু সাহেবের কাছে কি চাইতে হবে, তা আমরা যেমন জানি এমন আর কেউ জানে না।

নূতন দল এর উত্তরে বলেন,—হ্যাদেখো, তোমরা গত ত্রিশ বৎসর ধরে চেয়ে আসছ বটে, কিন্তু মেকি ছাড়া আর কিছু পেয়ে এসো নি। এখন যখন বিলেত আমাদের বহুকালের দেনা পরিশোধ করতে উদ্যত হয়েছে—তখন আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা ষোল আনা বুঝে নেব, আর তার প্রতি পয়সাটি বাজিয়ে নেব।

এখন ন্যায্য পাওনাটা কি, তাই নিয়েই ত যত গোল। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের যে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, তার পরিচয় ত তাঁদের কথাবার্ত্তায় বড় একটা পাওয়া যায় না। গোলের মূল ত ঐখানেই। আমাদের ভাবী "স্বরাজের" একটা স্পষ্ট রূপ কারও চোখে নেই—অথচ তার নাম সকলের মুখেই রয়েছে। অতএব আসল বস্তুর চাইতে তার নামের মাহাত্ম্য ঢের বেড়ে গেছে! তাই "হোম-রুল" এবং সেল্‌ফ্‌-গভর্ণমেণ্ট উভয়ে যুদ্ধং দেহি বলে কংগ্রেসের আসরে নেবেছেন। অথচ এই দুটি বাক্যের যে একই অর্থ, তার দলিল কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের দস্তখতি দরখাস্ত। অতএব দেখা গেল ঝগড়াটা পালা নিয়েও নয়, কেননা উভয় পক্ষের মতেই এবার কংগ্রেসে অযোধ্যা কাণ্ডের অভিনয় হবে—অর্থাৎ লক্ষ্ণৌএর পালার পুনরভিনয় হবে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে—"বর বড় কি কণে বড়" এই নিয়েই আড়াআড়ি।

রাজনীতিতে রাজনীতিতে যখন বিবাদ ঘটে, তখন তার মীমাংসা করে দিতে পারে একমাত্র সরল নীতি ; আর যেখানে দু-পক্ষই বেঁকে বসে, সেখানে তাদের সিধে করে বসাতে পারে একমাত্র সেই লোক— যিনি কোনও পক্ষেরই তাঁবে নন, এবং দু-পক্ষেরই উপরে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই আসরে নামাতে, দেশে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। রাজনীতি যাঁদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হর্ষের কারণ,—তাঁরা জানেন মনের উদারতায় আর হৃদয়ের গভীরতায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, এবং তাঁর বাণী পৃথিবীসুদ্ধ লোক কাণ খাড়া করে শুনবে, কেননা ভাষার সৌন্দর্য্যে আর ভাবের ঐশ্বর্য্যে সে বাণীর তুলনা ভু-ভারতে মেলা দুর্লভ। অপর পক্ষে রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা ভয় পান যে কংগ্রেসের আসরে দণ্ডায়মান হলে তিনি শুধু প্রেমের গান গাইবেন,—কেননা তিনি কবি। তিনি যে হিংসার গান গাইবেন না, এ কথা সত্য। দেশের কথা আর দ্বেষের কথা যে এক কথা নয়, এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে।—ভয়ের আরও কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তার উপর তিনি বাউল,—সুতরাং তিনি কংগ্রেসের সাধা রাগ ও বাঁধা তাল কিছুই মানবেন না, এমন কি সে বৈঠকের কায়দাকানুনও নয়। যেখানে হাঁটুগেড়ে বসে সুরভাঁজা দস্তুর, সেখানে হয়ত তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে খোলা গলায় এমনি সুর ধরে দেবেন, যে সুরের আগুন

ছড়িয়ে যাবে সবখানে। কাজেই রাজনীতির পেশাদার ওস্তাদেরা হয় গালে হাত দিয়ে বসে ঢোক গিলছেন, নয় বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

আমি বলি তোমাদের কোনও ভয় নেই। যে চোরা গলিতে তোমরা ঢুকেছ, সেখান থেকে কেউ যদি তোমাদের উদ্ধার করতে পারে—তাহলে এক রবীন্দ্রনাথই পারবেন, অপর কেউ পারবে না। কেননা তিনি মুক্ত আকাশের দেশের লোক,—তাঁর অনুগামী যে হবে, তাকে দিনের আলোয় সত্যের সরল ও উদার রাজপথে আসতেই হবে।

এদিকে তোমরা ত ভ্রাতৃবিরোধে মেতে আছ,—আর ওদিকে? ওদিকে এ দেশের বে-সরকারী ইংরেজের দলও মনটেগু সাহেবকে বেশ ভাল করে গান শোনাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁরা Bray-Chorus নামক একটি বিলাতি যাত্রার দল এক রাতে গড়ে তুলেছেন। এঁদের পালার নাম স্বরাজ-দমন, এবং তার ধুয়ো হচ্ছে—"হয় এদেশ থেকে সরব নয় এদেশকে সারব"। এতে আমাদের দু দলই ভয় খেয়ে গেছেন। চীৎকার এঁদের সুরু হলে যে আমাদের সারা হয়, তার পরিচয় ত পূর্ব্বেও পেয়েছি। এর কারণও বেশ স্পষ্ট। কেননা প্রথমতঃ এঁরা গাইবেন বীররসের গান, আর আমরা করুণরসের; দ্বিতীয়তঃ এঁদের গলার জোর আমাদের চাইতে ঢের বেশী; তৃতীয়তঃ এঁরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন—

যা আমরা মোটেই পারি নে। সুতরাং এ আশঙ্কা অসঙ্গত নয় যে, এঁদের বিরাট harmony-র ভিতর আমাদের স্বরাটের melody শোনাই যাবে না—বিশেষতঃ যখন ইংরেজ-কাগজওয়ালাদের জর্ম্মাণ ফুফুব্যাগু গাল ফুলিয়ে দিন নেই রাত নেই এঁদের সঙ্গত করবে।

মনু বলেছেন ভারতবর্ষে চারটি মাত্র বর্ণ আছে,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—কিন্তু নাস্তি পঞ্চমঃ। এ ত সেকালের কথা। একালে ভারতবর্ষে, চন্দ্রের দুই পক্ষের মত সবে দুটিমাত্র বর্ণ আছে,—কালো আর সাদা; এ সত্যটা আমরা ভুলে যাচ্ছিলুম বলে এই বে-সরকারী ইংরেজের দল সেটি আবার আমাদের কানে ধরে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এর পর কালোর ভিতর দুটি পক্ষের সৃষ্টি শুধু দৃষ্টির অভাব থেকেই সম্ভব হয়।

এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, কংগ্রেসের দুটি ভাঙ্গাদল আবার জোড়া লাগবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—কেমন করে? আমি বলি, তোমরা যা করে ভেঙ্গেছিলে, আবার তাই করে জোড় লাগাও,—অর্থাৎ না ভেবেচিন্তে। বিচ্ছেদ ঘটেছিল রাগের মাথায়—মিলন ঘটুক অনুরাগের ক্রোড়ে। অনুরাগ যে স্বভাবতঃই রাগের অনুসরণ করে, তার পরিচয় ত তার উপসর্গেই পাওয়া যায়।

"খণ্ডিতার" পুনর্মিলন ঘটাতে হলে অবশ্য কিঞ্চিৎ সাধ্যসাধনার আবশ্যক। এ সাধাসাধি একটু বেশী করেই করতে হবে, কেননা যাদের বাইরে মান নেই তাদের যে ঘরে অভিমান বেশী—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত; আর তা ছাড়া এ কার্য্য নবীনদের পক্ষে করাই সঙ্গত, কেননা অতীতের প্রতি ভক্তি ত আমাদের সহজ ধর্ম্ম। তবে প্রবীণদের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, মানভঞ্জনের পালাটা যেন বেশী লম্বা না করেন। নইলে আমাদের রাজনীতির মিলনান্ত নাটক চাই কি বিয়োগান্ত প্রহসন হয়ে উঠতে পারে।

বাজারে গুজব যে, প্রবীণদল যেমন অভ্যর্থনা সমিতি হতে পালিয়ে এ যাত্রা নবীন দলের হাত থেকে বেঁচেছেন—তেমনি তাঁরা চেষ্টায় আছেন যে, বাঙ্গলা থেকে পালিয়ে এ যাত্রা কংগ্রেসকে বাঁচাবেন। কংগ্রেস ঠাঁই-নাড়া হলেই যে তাজা হয়ে উঠবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্বরাটের নাম শুনলেই আমার সুরাটের কথা মনে পড়ে। দেশ যে একটু বেসামাল হলেই সুরট হয়ে ওঠে—যাঁর কিছুমাত্র রাগের জ্ঞান আছে, তিনিই তা জানেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আক্কেলে ইসারা বাস্।

এই গৃহবিবাদের মূলে একটা ভুল ধারণা আছে। দুপক্ষই মনে করছেন যে, তাঁরা কে কি বলেন তার উপরই ভারতবর্ষের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি! ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যে ভারত-বর্ষের স্থান যে কোথায়, সে সমস্যা আজ শুধু ঘরের সমস্যা নয়—

বাইরেরও সমস্যা। এবং এ সমস্যার মীমাংসায় ঘরের চাইতে বাইরের হাত বেশী থাকবে। কেননা যে সকল পলিটিকাল কূপ-মণ্ডুকদের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালেই আবদ্ধ, তাঁদের কাকলিও ঘরের বাইরে যায় না। ভারতবর্ষের ভাগ্য যে প্রসন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু তার ভিতর বিধাতার হাত আছে। ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারোমাস শুনতে পাই নে। আজকের দিনে আকাশজুড়ে ধর্ম্মের জয়-ঢাক বেজে উঠেছে, এবং তার ধ্বনি বিশ্বমানবের কানে এসে পৌঁচেছে—এমন কি কোটী কোটী ভারতবাসীরাও তা শুনতে পেয়েছে,—কেননা তারা মূক হলেও বধির নয়। এই হচ্ছে একমাত্র আশার কথা। জাতীয় জীবনের একটি বিরাট পর্ব্ব তখনই রচিত হয়, যখন জাতির মনে একটি নূতন সত্যের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানব যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে, সে হচ্ছে এই যে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্কটা হচ্ছে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক, দাস ও প্রভুর নয়। এই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে নবযুগের ধর্ম্ম। এই যুগ-ধর্ম্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকেও চাই নে;—অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হতে চেষ্টা করো না।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

বীরবল।

আমার ধর্ম্ম।

সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটীকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্ম্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয় ত সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্ম্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্ম্মটি তার? যে-ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুল্‌চে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-ধর্ম্ম। সেই প্রাণধর্ম্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্চে তার ধর্ম্ম। এই জন্যে আমাদের ভাষায় ধর্ম্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্চে জলের ধর্ম্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্চে আগুনের ধর্ম্ম। তেমনি মানুষের ধর্ম্মটিই হচ্চে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষরূপ আছে। সেইটেই হচ্চে তার বিশেষ ধর্ম্ম। সেইখানেই সে-ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করচে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে এ'কে সম্পূর্ণ নষ্ট

করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানিনে কেন তবু অন্য সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনো-মতেই লুপ্ত করতে পারিনে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে' আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্য্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করচে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্য্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্ম্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে-পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয় তাহলে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েচে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েচে তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বল্‌ত আমার প্রেতমূর্ত্তিটা দেখা যাচ্চে তাহলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা সুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বল্লে এই বোঝায় যে, আমার বর্ত্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয় আমার অতীতটাই আমার পক্ষে

একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চল্‌চে—কিন্তু মাঝে থেকে কোনো এক সময়ে তার ধর্ম্মটা এম্‌নি থেমে গিয়েচে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য-একটি কাগজে অন্য-একজন লেখক আমার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচা বয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্ত স্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলে ছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেচি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুল্‌লে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চল্‌তি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিষ্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়ত যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েচে। সেই রকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েচে। যখনি সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনি জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্যে তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না

মেলে তাহলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। আপনাকে জানো এই কথাটাই শেষ কথা নয় আপনাকে জানাও এটাও খুব বড় কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎজুড়ে রয়েচে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না—নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানা রকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেচে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কি এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে ত চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চল্‌চে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন কিছু বলেন, যা আমার মতে সঙ্গত নয় তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য একথা মান্‌তে হবে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্চে পথ-চল্‌তি পথিকের নোট-বইয়ের টোঁকা কথার

মত। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেচেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চল্‌তে চল্‌তে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেচে সেইগুলিই হচ্চে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুস্কিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে-ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্ম্মের দায় চোকে, ধর্ম্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতক-

গুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ এক দল এমন-একটি শান্তি চান, যে-শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্য দল এমন একটি স্বর্গ চান যে-স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্ম্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে-অর্থ তাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে' এবং সকল দিকে অতিক্রম করে' বিরাজ করচে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্ব্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না করা, আর-এক, মনের মত খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে-একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু'রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আরেক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়—তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত ঠিক সময়মত উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে' যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে—তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেচে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানচে বলেই সে যে-মুহূর্ত্তে দুঃখকে পাচ্চে সেই মুহূর্ত্তে দুঃখকে অতিক্রম করচে, যে-মুহূর্ত্তে নিয়মকে মানচে সেই মুহূর্ত্তে তার মন তার থেকে মুক্তি লাভ করচে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি, সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে সমস্ত দুঃখকে সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানচে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়। সে-আনন্দ শাস্তির চেয়ে বড়, সে-আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়।

এখন কথা হচ্চে এই যে, আমি কোন্ ধর্ম্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন "আমার ধর্ম্ম" কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃষ্টান সে যে খৃষ্টের অনুরূপ হতে পেরেচে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এত বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্ম্মের আদর্শটি কি ?

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—

আমিত কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

> "আমি যে সব নিতে চাইরে—
> আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।"

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক্ তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘরগড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুল্‌লে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মত—তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্ব্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মত এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এ রকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্চে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাক্‌লে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখ্‌তে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে' এবং অতিক্রম করে'—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে' তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে' পৃথিবীটি বস্তুতঃ যেমন,—অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেম্‌নি করেই জান্‌বার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশী, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দ্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার ঘাত-প্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ম্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্চে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তং, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যং।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘট্‌তে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্ব-মানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়-আমির সঙ্গে আমরা মিল্‌তে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখ শোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাইনে, তখন

প্রাণপণে কেবলি সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোট ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে—তখন

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালী।

এই বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, "সোণার তরীর" "বিশ্বনৃত্যে"।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে :—

ঐ কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।

অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গমবন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করচেন এখানে তাঁরি কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্চে সেই ঐক্যটি কি? সেই হচ্চে শিবং। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুইভাগ হয়ে বাড়্তে চলেচে, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধ্ল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্ব-প্রকৃতির বৃহৎশান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যের দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১।

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাব-রসরাশি
কৈশোর করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্তে শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত শর্ব্বরী সন্ধ্যাবধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়া থাকে দূরে
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে,—দাও চিত্তে বল,
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

২।

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি "চিত্রায়" "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েচে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি ?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে.
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা !

মাধুর্য্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে ?

কে সে ? জানিনা কে ! চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি,—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে;
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে, বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্য্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে ত বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে,—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত লোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,

কেন আসে মর্ম্ম ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান !

এ আহ্বান এ ত শক্তিকেই আহ্বান ; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই :—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসচে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায়

যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্চে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্চে তাকে নাম দিতে পারচে না, তাকে নানা নামে ডাকচে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বারবার হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখচে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চল্‌চে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে,
চিনিনা যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই অবস্থায় রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যে-একটি বোধ কবির সাম্‌নে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল, তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই এক অংশ তুলে দিই।

"কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখ্‌তে বল্‌চে,—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুন্‌তে প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুল্‌চে?

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল ততই পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার বর্ষশেষ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে:—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান,
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিবনা দিক্।
গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলঙ্কার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা রকম রং ফুট্‌তে থাকে, গাছের মাথার

উপরটা ঝিকমিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে সুরু করে,—সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলঙ্কারিক। কিন্তু তা'তে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্য্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মীড় টেনে এখনি অশান্ত সুরের ঝঙ্কারে বেজে উঠ্‌বে। এমনি করে ধর্ম্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলঙ্কারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানস-প্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানা প্রকার রং ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল; নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্ব-মানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে "পাগল" বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কি কথাটা কল্পনার অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে।

"আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া, ভীত; আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে

বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষকে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। * * নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপন খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য ইঁহার সুর নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।"

"* * * * * * আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা-

ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহা পুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুইয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্ব্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি, রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।”

তার পরে আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েচে—জীবনে এই দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।

কহ, মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই,
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না!
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ ব'বে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবেনা রাঙা বরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবেনা ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কত মত ছিল আয়োজন
ছিল কত মত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,

তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

* * * *

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরুক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব, ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

"খেয়া"তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে ? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জ্জনের মত ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসচেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেচে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা!
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখ রাতের রাজা।

ঐ "খেয়া"তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই, যে, ফুলের মালা চেয়ে ছিলুম, কিন্তু কি পেলুম?

এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি!

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়?

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়।

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়্ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়্ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মান্‌তেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্চে শান্তং শিবমদ্বৈতং। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই ত মানুষ তাঁকে ডাকচে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ—তার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্চে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে! রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত-সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেচি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েচেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজচেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ,—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে

নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বল্লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেচে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করচে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ;—অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েচে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করচে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করচে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করচে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই ত তার শ্রী, এই ত তার উৎসব, এতেই ত সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেচে, আনন্দময় করেচে। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে খেলা মনে হয় কিন্তু এ ত খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্য্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও ত গাছ-তলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

"রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে-বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই ত তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে

দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করচে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে', আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে'। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, "দুর্গংপথস্তৎ-কবয়োবদন্তি"—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে' তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

"মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, তুমি আমাকে চিন্‌বে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মান্‌বে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মান্‌বে না জানি কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেচি।

আমি ত মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেচে সে ঐ গুরু এসেচেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্‌তে হচ্চে। তিনি আস্‌বেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আস্‌বেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই ত হঠাৎ আগুন জ্বল্‌ল, তাই ত সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই ত যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্চে।

এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে ঃ—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই ক'রে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার॥

এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্ম্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখ্‌তে পায়,—যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেচি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেচি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বল্‌তেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্চি।

জীবনকে সত্য বলে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখ্‌তে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার

সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দ্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দ্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্চে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ'ত অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছন যায়। তাই যুবকেরা বল্লে,—আন্‌ব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে'। মানুষের ইতিহাসে ত এই লীলা, এই বসন্তউৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে' নিজ্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই ত য়ুরোপে চল্‌চে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েচে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌চে ঃ—"যুগে যুগে মানুষ লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্চে,—আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"—বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কা'দের পত্র? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর

মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাখা আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে,—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

"চন্দ্রহাস। এ কি! এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দ্দার! বুড়ো কোথায়?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কি?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে—এখন মনে হচ্চে তুমি বালক,—যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম! এ ত বড় আশ্চর্য্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!"

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড় করে, নূতন করে পেতে চাচ্চে।

তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে-জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে, সে ত কেবলি মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেচে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে বারে বারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেচে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি,
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে,
নাইক অবহেলা॥

আমার ধর্ম্ম কি, তা যে আজো আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বল্‌তে পারি নে—অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোন পুঁথিতে-লেখা ধর্ম্ম সে ত নয়। সেই ধর্ম্মকে জীবনের মর্ম্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্য্য-রসভোগ যে সেই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি,—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জ্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ, তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই,—তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে,—তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,

মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে স্বর্গ ত জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়—তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

"গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মা'কে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি,
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদন খানি।"

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আস্‌তেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘট্‌ল। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিট্‌তে পারে কোথায়?—অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্ম্ম-বোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম্মবোধের এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের

অধিকার লাভ করেচে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেচে। সে সাবিত্রীর মত যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেচে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েচে, তবেই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেচে। ধর্ম্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি—তারা পারে যাবে কি করে? সেই জন্যেই ত মানুষ প্রার্থনা করে,—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। "গময়" এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচ্চে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই:—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়!

তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয় !
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক্ ক্ষয় !
তোমারি হউক জয় !
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয় !
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয় !
প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয় !
তোমারি হউক জয় !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়।

-*-

তীরে তীরে নৌকা রেখে ভরানদী পাড়ি দেবার আশা পোষণ করা "ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" নয়,—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এই সোজা কথাটা বোঝা কারো কারো পক্ষে ভারী শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলাচ্য বিষয় যখনই তাঁদের অপ্রীতিকর হয়ে ওটে, তখনই তাঁরা সামাজকে সামনে রেখে স্বচ্ছন্দে শস্ত্র-চালনা সুরু করেন! এতে তাঁদের রণ-কৌশল যথেষ্টই প্রকাশ পায়, কিন্তু পৌরুষ-একটুও না। মতামতের-আসরে সমাজকে শিখণ্ডীর আসনে নামিয়ে নিয়ে এলে তারও গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হয় বলে' ত' মনে হয় না। কথায় কথায় "মাথার দিব্যি" দিলে অবিলম্বেই সেটা যেমন কথার-কথায় পরিণত হয়—আমাদের দেশে সাহিত্যের আসরে সমাজের দোহাই জিনিসটাও তেম্নি নিরর্থক হয়ে পড়েছে!

সমাজের দোহাইএর আরো একটা দিক আছে। দেশী বাজি-করেরা "ভানুমতী"র খেলা দেখাতে গিয়ে, প্রথমেই ঝুলি খুলে বের করে বসে—"আত্মারাম সরকারের হাড়"। সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে "নজরবন্দী" করবার পক্ষে সেইটেই নাকি তাদের ব্রহ্মাস্ত্র! আমাদের সাহিত্যের আসরে সম্প্রতি এম্নিধারা ভানুমতীর খেলার সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে। জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক হিন্দু-সমাজের মুখবন্ধ দিয়ে আমরা পাঠক-সমাজের "নজর-বন্ধ" করি। এর ফলে পাঠকের নিরপেক্ষ আলোচনার স্পৃহা এবং অভিনিবেশের শক্তি

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে!—সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন ধারা ঐন্দ্রজালিক উপায় কখনো সাধু-সাহিত্য-সম্মত হতে পারে না!

সবারি মনে রাখা উচিত—সমাজ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের দেওয়ানী-সনন্দ কারো হাতেই ন্যস্ত হয় নি; সমাজ পেটেণ্টও নয়, লিমিটেড্ কোম্পানীও নয়।

মানুষ অবস্থার উত্তেজনায়, সুবিধার অনুরোধে সমাজ গড়ে। পারিপার্শ্বিক কারণপরম্পরায় ধীরে ধীরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত এবং অনুসৃত হয়। যূথবদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সমাজের পার্থক্যই হয়েছে—তার পরিবর্ত্তনশীলতায়। মানুষের মন ত ইতরপ্রাণীর মনের মত কয়েকটা দানাবাঁধা সহজ বুদ্ধির সমাবেশ মাত্র নয়;—তার যে সম্ভাবনা অশেষ, পরিণতি অনন্ত! সেই জন্যেই ত' মানুষের সমাজের অভিব্যক্তির কখনো শেষ হয় না। কোনো সমাজের কোনো অনুশাসনই অপরিবর্ত্তনীয় হতে পারে না! যাঁরা সমাজকে মানুষের উপরে বসাবেন—তাঁরা চুলোর আগুনকে প্রশ্রয় দিয়ে চালে ওঠাবেন।—তাঁদের গৃহদাহ অনিবার্য্য। আমাদের দেশে কারো কারো ভাবের ঘরে এম্নি করেই আগুন লেগেছে!

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারার উজান বেয়ে গেলে নিশ্চয়ই এমন সব ঘাটের সন্ধান পাওয়া যাবে—যা এখন নিতান্তই অঘাটা! ঘাটকে অঘাটা, অঘাটাকে ঘাট কে করেছে? যুগে যুগে সমাজ-শরীরে যে সব পরিবর্ত্তন-পরম্পরা সংঘটিত হয়েছে,—সে কার ইঙ্গিতে, কার অনুরোধে? সমাজ কিছু আর সৌর-জগতের অংশবিশেষ নয় যে, সামাজিক-জীবের সনাতন-জড়তা সত্ত্বেও, তার ঋতুপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন হবে! মানুষের মনই ত' সমাজের পক্ষে

সোনার-কাঠি, রূপার কাঠি!—তার ঘাত-প্রতিঘাতেই ত' সমাজ-প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের জ্বালা আর বর্ষার বিরহ, শীতের সন্ন্যাস আর বসন্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

যখনই, যে কোনো কারণেই হোক না, কোনো সমাজের মানুষের মানসিক গতি স্থগিত হয়েছে, তখনই শুধু সে সমাজ স্থাবর হয়ে সহসা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মনের ফোয়ারা জমাট বেঁধে গেলে সমাজের স্রোত স্বভাবতঃই মরে আসে। সে অবস্থা উন্নতির পরিপন্থী!

সমাজকে উন্নতির অনুকূল রাখতে হলে সামাজিক মনের গতি সবদিকে অব্যাহত রাখতে হবে!—মনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও প্রসারিত করতে হবে;—এতে সমাজের প্রতিপত্তি কমে যাবে—এমন ভয় করলে চলবে না। বাছুর দুধ খেতে খেতে, গাভীর পদ-আস্ফালন আর শৃঙ্গ-তাড়না উপেক্ষা করেও, পরম আগ্রহভরে মাতৃস্তনে আঘাত দিয়ে নবাগত স্তন্য স্রোতের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তাতে তার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় কিনা বলা যায় না, তবে মায়ের অপত্য-স্নেহ যে কমে না সেটা ত' প্রত্যক্ষ সত্য! আমার বিশ্বাস সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটবে। আমাদের সমাজের পরিণতির সম্ভাবনা বহুবিধ এবং বহু বিস্তৃত। কিন্তু সে সবই যে আঘাতের অপেক্ষা রাখে। সময়োচিত আঘাতেই ত সমাজের প্রকৃত উদ্বোধন! এ কাজে যাঁরা বাধা দেবেন সমাজদ্রোহী—তাঁরা!

(২)

ভক্তির আতিশয্যে আমরা আমাদের সমাজকে যে ক্ষীণ আর ক্ষণভঙ্গুর মনে করি,—সেটা আমাদের কল্পনার দৈন্য অথবা অপবাদ

ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনের সামাজিকতা যতদিন থাকবে সমাজও ততদিন কোনো না কোনো আকারে থাকবেই!—এ জিনিস ভাঙ্গে না—কেবলি গড়ে, কেবলি বাড়ে! সমাজের কোনো একটা বিশেষ মূর্ত্তির পরে অহৈতুকী ভক্তি, কোনো এক বিশিষ্ট ধরণের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের পরে অন্ধ পক্ষপাত কখনো মনের স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয়! বর্ত্তমানের পরে অসন্তোষ অতৃপ্তির ভিতরেই ত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ নিহিত রয়েছে!

জগতের সমস্ত উন্নত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে যে "হারামনি"র অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তা থেকে কেন আমরা আমাদের সমাজকে একঘরে করে রাখতে চাইব? আর, চাইলেই সে চেষ্টা কি সফল হবে? চোখ মেলে আমাদের সমাজের পানে চাইলেই ত সে ব্যর্থ চেষ্টার শত সহস্র নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখতে পাবো! এ ব্যাপার এত স্পষ্ট—আর এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সে সব দেখাতে যাওয়ার মানে—পাঠকের দৃষ্টিশক্তির প্রতি অবিচার করা। হাতের কঙ্কন আরসিতে দেখে আর লাভ কি? শিক্ষিত পাঠক সরল ভাবে নিজের নিজের মন অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন—তার ঘাটে ঘাটে পুরাতন সমাজের কত "সনাতন" বিধি-নিষেধের শব অন্ত্যেষ্টি সংকারের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে! তথাকথিত সমাজের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের প্রতি আমাদের যে সামাজিক কর্ত্তব্য তা আমরা বরাবর উপেক্ষা করেই আসছি! ফলে আমাদের মনে যা মরে রয়েছে, কাজে তাই ভূত হয়ে নেমে আসে। বর্ত্তমান কালে, শিক্ষিত লোকের "সামাজিক নিষ্ঠা" মানে সুনিপুণ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটাতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে

সব সময়ে শাদা-চোখে এটা ধরা পড়ে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। আমরা প্রত্যেকেই বানান করছি "বিড়াল", আর সকলে মিলে উচ্চারণ করে আস্‌ছি—"মেকুর"। আমাদের সমাজের এ সদর-মফস্বল-রহস্য আর কতদিন চল্‌বে?

বিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৈষম্য নাকি অতীত যুগের নানা বিজাতীয় সংঘাত এবং অপঘাতের মাঝে আমাদের সমাজ আর সভ্যতার পক্ষে রক্ষা-কবচের কাজ করেছিল। (এই প্রসঙ্গে তাঁরা পাশ্চাত্য সংঘর্ষে নিগ্রো আর Red Indian-দের শোচনীয় পরিণামের উল্লেখ কর্‌তেও ছাড়েন না।—যেন তারা আমাদের, আর আমরা তাদের মাসতুত ভাই!) আমি সে কথা মানি নে। আমার মনে হয়, তাঁরা কার্য্যটাকে কারণ বলে' ভুল করেছেন। আমাদের সমাজে সদর-মফস্বলের বৈষম্য ছিল বলে' হিন্দু-সভ্যতা যে আজ জানে-প্রাণে বেঁচে আছে—সে কথা ঠিক নয়! হিন্দু-সভ্যতা বিজাতীয় সভ্যতার সংঘর্ষে একেবারে অভিভূত হয় নি বলেই—প্রাণে মরে নি বলেই—আমাদের সমাজে সদর মফস্বলের সৃষ্টি হয়েছে।—এটা একটা দৈব দুর্ঘটনা! হিন্দু-সভ্যতা চালাকী করে বাঁচে নি, বেঁচেছে গায়ের জোরে। তার মূলে যে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্য্য-সভ্যতার যে মহিয়সী বাণীর অনুরণন রয়েছে তারি সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবেই সে জর্জ্জরিত হয়েও জীবন হারায় নি।

একটা উপমা দিলেই বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। আমি যদি হঠাৎ দোতালার ছাদ থেকে একেবারে মাটীতে পড়ে যাই—তাতে যদি আমার পুঁটি-মাছের প্রাণ বেরিয়েই যায়,—তাহলে ত সব দেনা-পাওনাই

ঢুকে গেল ;—কিন্তু যদি আমার জীবনীশক্তি যথেষ্ট প্রাণবন্ত থাকে ; সোজা কথায়, যদি আমার আরো কিছুদিন পরমায়ু লেখা থাকে—এবং পড়ে গিয়ে না মরে' আমি যদি হাত পা ভেঙ্গে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হয়ে যাই ; তাহলে বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন না। আর, এমন কথা মনে করাও সঙ্গত হবে না যে, হাত পা ভেঙ্গে গেছে বলেই প্রাণটা বেঁচেছে। দুর্ঘটনার লক্ষ্য ছিল প্রাণ, কিন্তু ও বস্তু আমাতে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ছিল বলে দুর্ঘটনার ফল সে পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি ; হাত পায়ের পরে ঝাল মিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। হাত পা যে ভেঙ্গেছে তাতেও আমার বিশেষ হাত নেই ; আর প্রাণটা যদি যেত তাতেও আমার কিছুই বলবার ছিল না। তবে ও বস্তু যে যায় নি সেটা হচ্ছে "আমার পিতৃ-পুরুষের বহু পুণ্যের জোর"। প্রাণটাই যদি যেত, তাহলে, হাত পা ভাঙ্‌তো কার ? প্রাণটা যায় নি বলেই ত হাত পা ভাঙ্গা অবস্থার দুর্গতি ভোগ করবার জন্যে রয়েছি—আমি !

আমরা যে আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের মনকে বিদেশী, বিজাতি এবং বিধর্ম্মীর প্রভুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে পারি নি—আমাদের সামাজিক কপটতা হচ্ছে তারি দণ্ড। প্রায়শ্চিত্তকে পৌরুষ বলে গরব করার চেয়ে হীনতা আর কি হতে পারে ?—আমরা তাই করছি ! এতে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা, তার উদ্‌যাপন অযথা বিলম্বিত হচ্ছে !

(৩)

মতামতের ঘনঘটার ভিতরে আর একটা জিনিসের বেশ প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত বর্ষণ আজকাল দেখা যাচ্ছে।—"শান্তির বারি" নয়,

সেটা হচ্ছে সংযমের বক্তৃতা। সবুজ-দমনে সঙ্গীন-হস্ত সম্প্রদায়ের মুখে সংযমের বক্তৃতা সাজে ভালো, ছোটে খুব! বোধ হয় এই জন্যেই তাঁদের মুখের সংযমের বক্তৃতার কার্য্যকারিতা "শান্তির বারি"র চাইতে শিলাবৃষ্টির সঙ্গেই মেলে বেশী! তবু, এ কথার আলোচনা আমাদের কর্‌তেই হবে।

হতে পারে, সবুজের বিরুদ্ধে সংযমের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রবীণের পক্ষে জলে না নেমে সাঁতার কাটবার কল্পনা মনে স্থান দেওয়া যে নিতান্তই "মিথ্যাচার"—সে সম্বন্ধে আর দুই মত হতে পারে না।

যে কাজ করে, ভুল করবার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে। যে চলেছে মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট সে হয়েও থাকে। তাই বলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? জাতীয়-জীবনে কর্ম্মের উদ্দীপনা এলে অধিকারের সীমা মাঝে মাঝে অনধিকারের রাজ্যে গিয়ে পড়বেই। তাই বলে বর্গীর ভয় দেখিয়ে, দেশের সব নবীন প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই কি বুদ্ধিমানের উপদেশ? পাটোয়ারী হিসেবে লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে, সংযম আর সংকল্পের পাইকারী দর যাচাই করে, উদ্দীপনার আমদানী রপ্তানী ভাবের হাটে কোনো দিনই সম্ভবপর হয় না। এ কাজ কর্‌তে যাঁরা বিশেষ ভাবেই ব্যগ্র, কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ আসে—তাঁরা বুঝি কাজ না করবার ছুতো খুঁজতেই ব্যস্ত! উচ্ছ্বাস যেখানে নেই, সংযম সেখানে নিরর্থক। উপার্জ্জনের উন্মদনা যেখানে কোনো কালেই ছিল না,—সঞ্চয়ের সংযম সেখানে কোন্ কাজে লাগবে? গ্রীষ্মের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রলীলাই ত পরবর্ত্তী বর্ষার মেঘ-মেদুর স্তব্ধতাকে সার্থক করে দেয়।

আমাদের সামাজিক প্রকৃতিতে শীতের শিশির শুকাতে না শুকাতেই যাঁরা বর্ষার জলের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সামাজিক প্রকৃতি থেকে যাঁরা বসন্তের উচ্ছ্বাস আর গ্রীষ্মের উদ্দীপনাকে নির্ব্বাসিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন;—আমার বিশ্বাস তাঁদের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা আর অসঙ্গত আশা কখনো সফল হবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে,—কর্ম্ম থেকে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ থেকেই পর্জ্জন্যের উৎপত্তি।

সামাজিক সংযমের সমালোচনা ব্যপদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি---ব্যক্তিগত চিন্তা-স্রোতের স্বাধীন প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলে, আমাদের সামাজিক ঐক্য, পারিবারিক বন্ধন শ্লথ এবং শিথিল হয়ে, অচিরেই স্খলিত এবং বিধ্বস্ত হবে। এ সব শোচনীয় পরিণামের মর্ম্মভেদী বর্ণনা আমাদের লেখনী মুখে এমন জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে,—পড়লে মনে হয় যেন এইমাত্রই লেখক তেমন একটা দেশ থেকে ফিরে আসছেন---যেখানে ভাই ভাইকে সম্মান করে না; বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের ছেলে, স্বাধীন চিন্তার উত্তেজনায়, অবলীলাক্রমে বাপের গলায় ছুরি বসায়; মা স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নবজাত শিশুকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; হয়ত বা নবজাত শিশুও উত্তরাধিকার সূত্রে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" লাভ করে পূতনা বধের পুনরভিনয় করে থাকে। ব্যাপার গুরুতর বটে। কিন্তু ততোধিক গুরুতর আমাদের এই সর্ব্বজ্ঞতা। "সর্ব্বজ্ঞ" উপাধিটা লাভ করতে হলে, যে বিশেষ গুণটা আয়ত্ত করা দরকার, গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষ রকমেই তার চর্চ্চা হয়েছে—আমাদের দেশে। তারি ফলে উন্নতিশীল সভ্য-সমাজসমূহের সুধীসম্প্রদায় আজ যে সব

সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন,—আমাদের নখদর্পনেই আমরা তার সমাধান দেখতে. পাচ্ছি। সেটী হচ্ছে আমাদের সনাতন শাস্ত্রীয় সালসা, আর তার সাথে দেশাচারের সহস্র অনুপান।

এ যেন শিশুর কান্নাকাটি থামাতে গিয়ে দুধের সাথে আফিমের প্রয়োগ। আমরা যাকে শান্তি বলি, প্রকৃত পক্ষে সেটা হচ্ছে সামাজিক সুষুপ্তি! এই যদি সামাজিক জীবনের চরম লক্ষ্য হতো,—তাহলে অ৽শিশ্চি ও ব্যবস্থা খুবই সমীচিন এবং বিজ্ঞানসম্মত হতো! কিন্তু তা ত নয়। অন্নচিন্তা যার নেই এমন লোকের পক্ষেও পক্ষাঘাত খুব লোভনীয় হতে পারে না। সমস্যা-পরিশূন্য অবস্থাই ত সামাজিক জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাত! এমন কোনো শাস্ত্রানুশাসন সূত্রের সমাহার কল্পনাতেই আনা যায় না, যাতে করে মানুষের ক্রমবিকাশশীল মনের সকল রকমের সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর হয়।

এই অসম্পূর্ণতার ফাঁক দিয়েই ত যুগে যুগে মানুষের চিন্তা এবং সাধনা সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করেছে। যে দিন আমরা এ প্রবেশিকা বন্ধ করেছি—সেই দিন থেকেই আমাদের সমাজে সামাজিক উচ্চ-চিন্তার স্রোতও মরে এসেছে। আজ যে আমাদের সমাজজোড়া এত অশান্তি—এই যে নমঃশূদ্র তার জল চালাতে চায়, কৈবর্ত্ত আর ভাড়া খাটতে চায় না, বারুই যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারের জন্যে ব্যগ্র—এ সবই ত সেই বন্ধ-দুয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে "সবুজ" মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, যার দমনে বঙ্গ-সাহিত্য আজ মুখর—তাও ত সেই বন্ধ-দুয়ারে তাদের বিরুদ্ধ মনের ঘাত প্রতিঘাত। এ চাঞ্চল্যের ভিতরে সমাজ-বিদ্বেষ নেই, আছে সমাজকে গতিশীল করবার আগ্রহ!

দেশে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনের সংকল্প মনে না এনেও, স্বরাজের আশা পোষণ করা যদি সম্ভব হয়, তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার কু-মৎলব না এঁটেও, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা কষ্ট-কল্পনা বলে গণ্য হবে কেন? দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে অসহিষ্ণু করে তোলবার চেষ্টা যদি দেশভক্তির পরিচয় হয়, তবে সমাজের হীনতা, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে স্বজাতিকে সজাগ করবার চেষ্টা কোন্ যুক্তিবলে সমাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে? রাজনৈতিক আলোচনায় নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, পরের প্রবলতার তলে নিজের দৌর্ব্বল্য চাপা দিয়ে নানান্ রকমের মুখরোচক প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়; আর সামাজিক সমালোচনায় সকল দোষ মাথা পেতে মেনে নিয়ে, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হয়। এই কারণেই কি এ বিষয়ে আমাদের এত বিরাগ? রাজনৈতিক আন্দোলনে পরের রাঁধা ভাতে বেগুন সিদ্ধ দিয়েই, এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তা শেষ করে আসছি; কাজেই এখন সামাজিক ব্যাপারে, নিজের চুলিতে নিজে ফুঁ দেবার কথায় যে আমাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হবে—তাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে?

(৪)

বহু যুক্তি তর্কের আড়ম্বর দিয়ে অনেক সময়ে আমরা আর একটা কথার অবতারণা করে থাকি। কান্ত-কবির তরজমায় সেটা হচ্ছে—"যা করবে আস্তে ধীরে—ঘা করো কেন খুঁচিয়ে"! এবম্বিধ আপত্তির মূলে রয়েছে আমাদের কর্ম্ম-বিমুখতা। সামাজিক গতি-শীলতা এতদিন

ধরে' বন্ধ থেকে আজ স্বতঃই যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌বে—এমন আশা করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত এমন পরম-অভ্যস্ত প্রক্রিয়া আর মানুষের জীবনে কি আছে? তবু দু'-চার মিনিটের জলে-ডোবা মানুষের প্রাণ বায়ুর চলাচল আবার নিয়মিত করতে তার হাত-পা ধরে' কতই না সাধাসাধি করতে হয়।

জাপানে এ বেলা ওবেলা দু'বেলাই প্রায় ভূমিকম্প হয়; কাজেই জাপানীরা সেটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ধরে' নিয়েই বাড়ী-ঘর তৈরী করে। আর আমাদের এখানে কালে ভদ্রে ভূমিকম্প হয়; আমরা ঘর-বাড়ী বানানোর সময় তা' নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামইনে। এই জন্যেই আমাদের দেশে ভূমিকম্প যখন হয়, তখন বেশ এক হাত দেখিয়েই যায়।—মুক্তপ্রাণ, গতিশীল সমাজের পক্ষে সংস্কার ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক; আর, আমাদের সমাজের পক্ষে সংস্কার হচ্ছে ভূমিকম্পের মতই স্মরণীয়! আমাদের সমাজের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল; আর, তাতে করে' আমাদের মনের অবস্থাটাও—"বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" ধরণের হয়ে গিয়েছে। আমাদের সামাজিক মনের নঙ্গর বহুকাল-সঞ্চিত পাঁকের নীচে এম্নি শক্ত হয়েই এঁটে বসেছে যে যথেষ্ট জোরজবরদস্তি ছাড়া এ ওঠ্‌বার নয়। কিন্তু এতে হাত দিলেই আমাদের বুকে বাজে! অভ্যাসের পাঁকটাকে আমরা সমাজের প্রাণবস্তু বলে' ভুল করি; পরগাছেকে আমরা গাছের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে' মনে করি! এই কারণেই আমাদের সমাজের প্রাণ ক্রমেই কোন-ঠাসা হয়ে যাচ্ছে, আর দেহ ক্রমেই রক্তশূন্য হয়ে পড়ছে।

এ অবস্থার প্রতীকার চেষ্টা কি সমাজ দ্রোহ? দেশের সাম্‌নে

সমাজের দূষিত অংশ অনবগুণ্ঠিত করা কি দূষণীয়? দুঃসময়ে গ্রহ-বৈগুণ্যে সমাজে যে সব দোষ ঢুকেছে সে গুলিকে সামাজের অঙ্গীভূত হ'তে প্রশ্রয় না দিয়ে বিদূরিত করবার চেষ্টা করা কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা? আমার ত' মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দুরই এটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সমাজের "আসন্ন-বন্ধু"দের মতে এ কাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল বলে' বিবেচিত হয়—তাহ'লে আমাদের মনে এ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়াই বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয়েছে। আজ শৃঙ্খলিত অবস্থার প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে, হয়ত, আমাদের মনের সদিচ্ছা কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে দাঁড়াবে;—কিন্তু পরিণামে শৃঙ্খল যখন টুটে যাবে, তখন স্বভাবতঃই সামাজে আবার শান্তির প্রবাহ চল্‌বে।

ত্রেতায় যুগাবতারের কর্ম্ম-জীবনের সূচনা হয়েছিল পাষাণী উদ্ধারেণ—তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা নবজীবন লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের অর্দ্ধস্ফুট উষার আকাশে, চক্রবালের কোলে কোলে, মেঘের নীচে যার আলোর রেখা মাঝে মাঝে ফুটে উঠে আমাদের সকলের মনকে নিয়ে এমন করে' খেলা করছে তারও প্রথম কাজ হবে—পাষাণ উদ্ধার—অমাদের সামাজিক মনের শাপ—বিমোচন। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ, আমাদের কর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সাহিত্যিক জীবনের সাধনা যে আলোতে মণ্ডিত হয়ে, রঞ্জিত হয়ে, আজ আমাদের "আঁখির আগে" এসে দাঁড়িয়েছে, তারি সাম্‌নে উন্মুক্ত করে' দিতে হবে—আমাদের সামাজিক মনের সকল দুয়ার—সদর খিড়কি দুই-ই!

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

আশ্বিন ১৩২৪।

দুখানি ফরাসী চিঠি।

সম্প্রতি এদেশের ইংরেজ খবরের-কাগজওয়ালারা রবীন্দ্রনাথের উপর নানারূপ কটু কথা প্রয়োগ করছেন। সে সব কথার মর্ম্ম এই যে, বিলাতের লোক যখন ভদ্রতা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা করেছেন, তখন এ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা তাঁর পক্ষে অভদ্রতা।—তারপর তিনি যখন কবি, তখন রাজনীতির চর্চ্চা তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।

ইউরোপ যে ভদ্রতার খাতিরে তাঁর কবিতার প্রশংসা করে নি, কিন্তু তা নিজগুণেই যে ইউরোপের শিরোধার্য্য হয়েছে, এবং কবিরও যে রাজনীতির অন্তত নীতি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে,—তার প্রমাণস্বরূপ আমি দু'খানি ফরাসী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

ইউরোপে যে খণ্ডপ্রলয় চলেছে, তার অবসানে মানবসমাজ যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই থাক্‌বে—এ বিশ্বাস শুধু অসাধারণ জড়মতি লোকের থাক্‌তে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের যে নব-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে এসিয়ারও যথাযোগ্য স্থান থাক্‌বে, এবং এসিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক অনেকটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কের উপরেই নির্ভর কর্‌বে।—এসিয়া ও ইউরোপের এই ভাবী মিলনের বাণী, আসন্ন নবযুগের নববার্ত্তা ঘোষণা কর্‌তে পারবেন কবি,—

ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নয়।—সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবি একেবারে নীরব থাক্‌তে পারেন না।

চিঠি দু'খানি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক কোনও বঙ্গযুবককে লিখিত।—একখানির লেখক একজন বেল্‌জিয়ান, অপরখানির একজন ফরাসী। প্রথম ব্যক্তির নাম Maeterlinck, দ্বিতীয়ের—Romain Rolland। এ দুই ব্যক্তির পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে দেওয়ার কোনও আবশ্যক নেই—আর আমার বিশ্বাস ইংরেজ খবরওয়ালারাও এঁদের অন্তত নামের সঙ্গে পরিচিত। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র পত্র দু'খানি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

সম্পাদক।

Les Abeilles
Avenue des Beaumettes Nov. 1916.
Nice.

L'hommage de votre lettre, venu de si loin,—bien que dans toute la sincèrité de ma pensée, il dépasse beaucoup le mérite de mon effort,—m'a très profondement touché. J'ai surtout été heureux et fier d'apprendre que c'est votre grand poète Rabindra Nath Tagore qui a bien voulu me faire connaître parmi vous. Rien ne pouvait m'être plus sensible, car je considère certaines pages du "Gitanjali"—la seule de ses *œuvres* que je connaisse—comme les plus hautes, les plus profondes, les plus divinement humaines qu' on ait écrites jusqu'à ce jour.

MAETERLINCK.

[TRANSLATION OF M. MAETERLINCK'S LETTER.]

The tribute contained in your letter received from such a great distance, has touched me profoundly, although I sincerely believe it is out of all proportion to the merit of my work. I am, above all, happy and proud to learn that it is your great poet Rabindra Nath Tagore who has tried to make me known to you. Nothing could have affected me more deeply, for I consider certain pages of the "Gitanjali,"—the only one of his works that I know—the highest, the most profound, the most divinely human that have been written to this day.

Dimanche, 18 Mars, 1917.

Ami lointain, je vous remercie de votre sympathie. Je suis heureux que mon *Jean Christophe* ait trouvé dans votre cœur tant d'échos. Ce m'est une preuve de plus de la fraternité universelle des âmes. Cette fraternité, j'y crois, et je travaille a en établir la conscience profonde entre les hommes de tous les peuples, de toutes les races. Tout particulièrement, je sens, depuis quelques années, le besoin urgent de rapprocher l'esprit de l'Europe de celui de l'Asie. Ni l'un ni l'autre ne se suffit, à soi seul. Ce sont les deux hémisphères de la pensée. Il faut les réunir. Que ce soit la grande mission de l'age qui va venir ! Si j'étais plus jeune, je m'y vouerais tout entier. Je me contente de la joie de goûter par avance la plénitude de la civilisation future, qui réalisera l'union des deux moitiés de l'âme humaine. J'admire votre Rabindra Nath Tagore, parceque je sens un peu en lui déjà vibrer cette harmonie.

Puissent mes yeux un jour boire (comme mon esprit) cette lumière de l'Inde, que je vois à travers vos lignes, lorsque vous décrivez la nature qui vous entoure.

Bien cordialement à vous,

ROMAIN ROLLAND.

Hotel Beauséjour, Champel, Genève (Suisse),

(faire suivre).

[TRANSLATION OF M. ROMAIN ROLLAND'S LETTER.]

Sunday, 18th March, 1917.

My far-away friend, I thank you for your sympathy. I am glad that my *John Christopher* has found so many echoes in your heart. It is one more proof to me of the universal fraternity of souls. I believe in this fraternity, and I strive to establish a deep consciousness of it in the minds of people of different countries and different races. I have been feeling especially for some years past, the urgent need of bringing the spirit of Europe into contact with the spirit of Asia. Neither the one nor the other is sufficient unto itself. They are the two hemispheres of thought. It is necessary to unite them. Let this be the grand mission of the age which is to come! If I were younger, I would dedicate myself entirely to this mission. I content myself with the joy of tasting in advance the plenitude of the civilization of the future, which will realise the union of these two halves of the human heart. I admire your Rabindra Nath Tagore, because I feel this harmony to some extent vibrating in him already.

May my eyes (like my spirit) one day drink this light of India, which I see through your lines, when you describe the nature which surrounds you!

Sincerely yours,

ROMAIN ROLLAND.

Hotel Beauséjour, Champel,

Geneva (Switzerland).

গীতি-কবিতা।

যখন রেলওয়ে হয়নি, টেলিগ্রাফ হয়নি, খাওয়া পরার সংগ্রাম আজকার মতো এমন কঠিন হয়ে ওঠে নি, তখন মানুষের দিনটে আর মনটা ভরে থাকত অনেকখানি অবসর দিয়ে—আর সেইটে ছিল মহা-কাব্যের যুগ। কোন গোলমাল নেই—দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হয়ে লিখে যাও—সর্গের পর সর্গ, পর্ব্বের পর পর্ব্ব—ছাপাখানার তাগিদ্ নেই, পাঠকের "দেহি দেহি" রব নেই—শুধু লিখে যাও, যতদিন খুসি—দশ বছর, বিশ বছর পঁচিশ বছর ধরে লিখে যাও—শুধু লিখবারই আনন্দে রে। কিন্তু আজকাল যখন আমাদের খাওয়া পরা জোগাড় করতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা কেটে যায়—যখন জগতটা এমনি বেগে চলেছে যে, সেই চলার মাঝে কারও এমন সাধ্য নেই যে দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকে—তা ছাড়া যখন ছাপাখানার উদর পূরণ কর্‌তে হবে—পাঠকদের মাসিক বরাদ্দটা মিটিয়ে দিতে হবে—তখন গীতি-কবিতাই হচ্ছে প্রশস্ত। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝে কোন রকমে একটু সময় করে নিয়ে গোটাকয় লাইনে ছন্দ তাল মান লাগিয়ে একটা কিছু লিখে ফেল—নইলে উপায় নেই—পরমুহূর্ত্তে কিসের ধাক্কায় যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তার ঠিক নেই। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তেই হয়ত গুন্ গুন্ করে একটা কিছু রচনা করে ফেল্‌লে—নইলে উপায় নেই—এমনিই কাল। তাই এইটে হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

কিন্তু তাই বলে যে মহাকাব্যের যুগে কেউ গীতি-কবিতা লিখলে সৃষ্টিটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিম্বা গীতি-কবিতার যুগে মহাকাব্য লিখলে তাকে পিনাল কোডের ধারায় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু ওটা গেল বাহিরের কথা। আর এটা বোধ হয় সবাই মানবেন যে মানুষের বাহিরটা দিয়ে তার ভিতরটা গড়ে ওঠে না—তার ভিতরটা দিয়েই তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এর একটা ভিতরের কারণও আছে—যে কারণটাই হচ্ছে আসল কারণ। সে কারণটা হচ্ছে এই যে, মহাকাব্য লিখতে হলে লেখকের যে মানস-জগত চাই—যে mentality দরকার, মানুষ সেই মানস-জগত থেকে সরে পড়েছে—সেই mentality-টা সে হারিয়ে ফেলেছে।

মহাকাব্য লিখতে হলে যে-সব উপাদান দরকার সে-সব উপাদান আর মানুষের মনে প্রাণে অন্তরে মিল্‌ছে না। সেই বীরত্ব শূরত্ব শৌর্য্য বীর্য্য সেই classical heroism আর মানুষের প্রাণে নেই। বল্‌ছি না যে আজকার মানুষ ভীরু বা কাপুরুষ কিম্বা মরতে ভয় পায়। না, তবে যখন যুদ্ধটা চলে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে—যেখানে ছ' মাইল দূর থেকে একটা বোতাম টিপে দিলেম আর কামানটা ফায়ার হয়ে গেল, সেখানে সিংহবিক্রমের ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আছে ঠাণ্ডা মাথার। আজকার মানুষও যে সাহসী সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাহসটা কল-কব্জা দিয়ে এমনি করে নিয়মিত যে, সে-সাহস বুদ্ধির কোঠায় পড়ে একেবারে বেকার বসে আছে, তার প্রাণ অধিকার করে আর তার বীরমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। আর যেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করা না যায় সেটা কলমের আগা দিয়েও বেরোয় না। যদি বা বেরোয় তবে সেটা মুখের কথা হয়েই

বেরোয়। আর মুখের কথার স্থান কাব্যে ত নেইই—আর যেখানেই থাক। মুখের কথায় চিড়ে যদি বা ভেজে—মানুষের মন ভেজে না কিছুতেই। আর ঐ শূরত্ব বীরত্ব heroism ছাড়া মহাকাব্য ভাল জমে না—এটা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। তাই মহাকাব্যের যুগ আর নেই।

এই ডেমোক্রেসির যুগে মানুষের মনের মধ্যে আর আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। যখন মেটারলিঙ্ক পড়ি তখন দেখি সেখানে রাজার কথায় আর রাজ-ভৃত্যের কথায় বড় বিশেষ তফাৎ নেই। ডেমোক্রেসির আবহাওয়াতে রাজাও আর রাজা নেই, রাজভৃত্যও আর রাজভৃত্য নেই। সেই আবহাওয়াতে বাস করে' লেখকের মন থেকেও রাজা আর রাজভৃত্যের ভেদ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেখকের মনে প্রাণে যেটা নেই তার লেখায় সেটা জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না কিছুতেই—কারণ মানুষ মুখে যে কথাই বলুক না কেন তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে তার অনুভবের ভিতরে। আর মহাকাব্য হচ্ছে প্রধানত হয় দেবরাজ্যের নয় আভিজাত্যের গান। শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব ধীরত্ব গম্ভীরত্ব—সব বিষয়ে, ফরাসীতে যাকে বলে grandeur তাই সেখানে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা চাই। নইলে মহাকাব্যের মহাকাব্যত্বই নষ্ট। তাই দায়ে পড়েই মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে।

কিন্তু ওটা গেল অভাবের দিক—যে জন্যে মহাকাব্য আর লেখা হচ্ছে না তার negative side। উপরন্তু মানুষের একটা ভাবের দিক—positive side আছে যার গুণে গীতি-কবিতা লেখা চলছে। সেটা হচ্ছে এই যে মানুষ বুঝেছে যে তার ভিতরটা তার বাহিরটা থেকে বড়। সে আজ বাহিরের ঘটনাবলীকে দেখতে ততটা ভাল-

বাসে না যতটা ভালবাসে তার অন্তরের লীলা দেখতে। তাই আজকার কবির আর ভার্জিলের মতো Arma virumque cano—I sing of arms and heroes বলে সন্তোষ নেই—সে আজ চায়—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে—

সে আজ চায় অন্তরের এক একটী সুর ধরে, এক একটী অনুভব ধরে' তারি মূর্ত্তি ছন্দে অর্থে তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে। আর সে জন্যে গীতি-কবিতাই প্রশস্ত। তাই এটা হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

(২)

গীতি-কবিতা বলি সেইটেকে যেটার স্বরূপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকিটা গীত। গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করবে এর ওপরে যে সে কবিতার অর্থ কতখানি তার কথা গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণ যেটা সেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে। ভাবের সঙ্গীত বলছি এই জন্যে যে, সঙ্গীত জিনিসটার মধ্যে কি শেষে কোন দাঁড়ি টানা নেই—অর্থাৎ গান জিনিসটার আরম্ভ থাক্‌লেও এর শেষের দিকটায় একটা dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা। আর এই জন্যেই বোধ হয় উঁচুদরের গীতি-কবিতা অনেকের কাছে অস্পষ্ট বলে' মনে হয় এবং অনেকে

তা বস্তুতন্ত্রহীন মনে করেন কারণ ও জিনিসটাই এম্‌নি যে ওর মানে কোন খানেই শেষ হয় না। যে গীতি-কবিতাটা তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও দাঁড়ি টেনে বসেছে সেটা অর্থ হিসেবে যতই স্পষ্ট হোক্ না কেন গীতি-কবিতা হিসেবে তার মান খর্ব্বই হবে। কারণ গীতি-কাবতার প্রাণই হচ্ছে ভাবের সঙ্গীত। আর সঙ্গীত জিনিসটার শেষের দিকে দাঁড়ি টানা নেই। এই কথাটা আরও একটু বিশদ করে' বলবার চেষ্টা কর্‌ব।

যখন বইটা খুলে' চোখ দুটো বুলিয়ে যাই
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

তখন বেশ বুঝ্‌তে পারি যে ঐ চার লাইনের মধ্যে সব চাইতে যা উপভোগ কর্‌ছি সেটা হচ্ছে তার না—আসাটা। "সে যে আসে আসে আসে"র সঙ্গে সঙ্গে তার আসাটা বাস্তবিক শেষ হ'য়ে যায় নি এই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে আরামের খবর। ঐ যে "আসে আসে আসে"র পরে ছাপায় দাঁড়ি থাক্‌লেও তাতে মনের পাতায় কোন দাঁড়ি পরে না সেইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ—আর সেইটে হচ্ছে এর প্রাণ। "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে"; কত দীর্ঘ যে সে রাস্তা—সে যে কতদূরে—কোন দিগন্তের কোন পার থেকে যে সে আস্‌ছে—কোন্ অনন্তের ভিতর দিয়ে যে সে হেঁটে চলেছে—যে তাতে মনটাও একেবারে অনন্তের পথে উধাও হয়ে যায়—আর এইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ।

কিন্তু "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী" যে চলে' আস্‌ছে সে যদি হঠাৎ একদিন গোঁফে চাঁড়া দিয়ে এসে কবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেত তবে সেটা আর গীতি-কবিতা থাক্‌ত না, সেটা হ'য়ে পড়্‌ত রয়টারের তারের খবর—একেবারে চাক্ষুষ, জাজ্জ্বল্যমান, নিরেট অর্থযুক্ত,—আর তারপর যদি সে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে' সেটা খেতে খেতে চাষ আবাদের খবর জিজ্ঞেস কর্‌ত তবে ত কথাই নেই—-সেটা যে হ'ত ভীষণ ভাবে বস্তুতান্ত্রিক তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু গীতি-কবিতার তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি হ'ত অনেক বেশী ; কিন্তু তার চাইতেও বেশী ক্ষতি হ'ত পাঠকদের। কেন ?—সেটা বল্‌ছি।

মানুষের অন্তরে দুটো সুরের তার রয়েছে। তার একটাতে বাজে সান্তের সুর আর একটাতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে অনন্তের সুর। আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর মধ্যে ঐ সান্ত সুরটাই নিশিদিন বাজিয়ে চলেছি। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে ঐ অনন্তের সুরটাও কারও কারও অন্তরে এক একবার করে' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আর ঐ অনন্তের সুরটা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়ে এসেছে বলে' মানুষ আজকার যা তাই। নইলে সেই আদিম কালের অন্ধকার যুগে তীর ধনুক দিয়ে বন্য পশু শীকার কর্‌তে কর্‌তে তার হাতে কড়া পড়ে' যেত কিন্তু তার মনের গায়ে কোন দাগ প্‌ড়বারই অবসর পেত না।

কেবল তাই নয়। এই অনন্তের সুর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বলে আমরা সাহস করে ভাবতে পারি যে বাস্তবিক আমরা তেমন বদ্ধজীব নই—আমাদের একটা মুক্তির দিকও আছে। এই যে রক্তমাংসের শরীর তা যতই নিরেট হোক না কেন, যতই

চাক্ষুষ, যতই জাজ্বল্যমান, যতই শক্ত হোক না কেন, আমরা তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাই নি। আমাদেরও একটা দিক আছে যে দিকটায় দিগন্তের বাতাস বয়ে যায়—অনন্তের আলো ছেয়ে যায়। এই দিকটা মানুষের অনন্ত আশার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার দিক। আর তার এই অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দিকটা আছে বলে হাজার হাজার যুগ কাটিয়ে এসেও মানুষের বাঁচা, আজও শেষ হয়ে যায় নি—অর্থশূন্য হয়ে যায় নি। আজও তার কত ভাববার কত করবার আছে। যেদিন মানুষ তার এই অনন্তের দিকের গোড়ায় এসে পৌঁছিবে—সেদিন থেকে তার বাঁচাটা হবে ঝকমারি পূর্ব্ব-জীবনের জাবর কাটা—সেদিন আসবে মহাপ্রলয়—সেদিন সব মুছে ফেলে আবার মানুষকে সেই গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে।

এই যে অনন্তের দিক, মুক্তির দিক—এইটে হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর আনন্দের দিক। এই বৃহত্তর আনন্দের দিকটা যার জীবনে যত বেশী প্রকাশ পেয়েছে মানবজন্ম তার তত বেশী সার্থক হয়েছে। কারণ "মানব" নামক যে সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাটী তার সাধারণ সূত্র হচ্ছে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

আর তার স্বীকার্য্য (postulate) হচ্ছে—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।"

বলেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সান্ত সুরটাই বাজিয়েত চলেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাঁদের মধ্যে—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্—ঐ অনন্তের সুরটা অকারণেই বেজে ওঠে। আর এই সব লোকই

মানব সমাজে অন্যান্য লোক থেকে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে! কেউ বা কবি, কেউ বা চিত্রকর, কেউ বা গায়ক কেউ বা আর একটা কিছু। কিন্তু আমরাও আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে ঐ অনন্তের ঝঙ্কার না শুন্‌লে প্রাণে বাঁচি নে। ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার মাঝে মাঝে গন্ধ না পেলে আমাদের অস্তিত্বটাকে সম্পূর্ণ করে' পাই নে—ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার হাওয়া মাঝে মাঝে প্রাণে না লাগ্‌লে আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে একঘেয়ে—দুর্ব্বিসহ। তাই কবিকে ডেকে বলি—হে কবি এমন কিছু লেখো যার ছন্দে অর্থে ঝঙ্কারে আমারও অন্তরে অনন্তের তারটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। চিত্রকরকে ডেকে বলি—হে চিত্রকর এমন কিছু আঁকো যার রেখায় বর্ণে সৌন্দর্য্যে আমার অন্তরে যে অনন্তের ছবিখানি আছে তা মূর্ত্তি পাবে। গায়ককে বলি—হে গায়ক এমন কিছু গাও যার সুরে সুরে আমার হৃদয়ের অনন্তের সুরটাও পরতে পরতে খুলে যাবে। এই যে কবি চিত্রকর গায়ক প্রভৃতি—এঁরা মানুষকে তাদের এই সবার চাইতে অনির্ব্বচনীয় জিনিসটি পাইয়ে দেন বলে' লোকের কাছে তাঁদের এত সম্মান—সমাজ তাঁদের এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমরা গীতি-কবিতার কাছথেকে ঐ অনির্ব্বচনীয় জিনিসটাই পাবার আকাঙ্খা করে' বসে' থাকি। যেন তার ছন্দ অর্থ সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' সেখানে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে যে—জগতে আমি আমাকে পাই বৃহত্তর করে' মুক্ততর করে'—যেখান থেকে ভূমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে কোন রকম লজ্জা পাই নে। আর সেই জন্যেই বলছি যে গীতি-কবিতা যদি তার পাঠককে ঐ জিনিসটি পাইয়ে না দেয় তবে গীতি-কবিতার যত ক্ষতি হোক্ না হোক্ তার চাইতে বেশী ক্ষতি পাঠকদের। আর

গীতি-কবিতা পাঠককে ঐ জিনিসটা পাইয়ে দিতে পারে না—যদি না তার অর্থ তার কথাগুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়—যদি না তার শেষের দিকে একটা ভাবের dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা থাকে।

অন্ততপক্ষে গীতি-কবিতার যে ক্ষুদ্র দেহ—সেই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে একটা বৃহৎ হৃদয়ের—একটা গভীর হৃদয়ের পরিচয় থাকা চাই—যে হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে পাঠক তার আপনার হৃদয়টারও বৃহত্ব গভীরত্ব টের পেয়ে যায়—নইলে গীতি-কবিতার অনেকখানিই ব্যর্থ।

ঠিক হোক্ বেঠিক হোক্ গীতি-কবিতা সম্বন্ধে এই কথাগুলোই মনে আস্‌ছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সনেট।

কি ভাবিছ বসি পান্থ জীবন বেলায়
　　মুখে হাসি চোখে জল দৃষ্টি কত দূরে ?
সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু, আশা নিরাশার
　　সহস্র ঊর্ম্মির খেলা ; আহ্বানের সুরে

কে সদা ইঙ্গিত করে নামিতে খেলায়
　　মথিয়া লহরীমালা দিতে সন্তরণ,—
কোথায় দেখেছ কারে ? কিসের আশায়
　　সংহত করেছ তব হৃদয় স্পন্দন ?

যাও যাও নামি যাও অজানার পানে
　　জীবন কৃতার্থ হবে উদ্যমে প্রয়াসে
ব্যর্থতাও তৃপ্ত হবে জীবনের গানে
　　শ্রান্ত হিয়া শান্তি পাবে নিবৃত্তি-নিবাসে ;—
　　আজি যদি রুদ্ধ কর অমৃতেরে ধরি'
　　জীবন উঠিবে শুধু হাহাকারে ভরি'।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৫৮

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বাংলার ভবিষ্যৎ।

(মির্জ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত)

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন, তখন তিনি বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলা লেখার ঔচিত্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা কর্‌তে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনের "পত্রসূচনা" বঙ্গসরস্বতীর তরফ থেকে একাধারে আরজি, জবাব ও সওয়াল-জবাব। বাংলা লেখার জন্য, বাঙ্গালীর পক্ষে স্বদেশীশিক্ষিত সমাজের নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন যে একদিন ছিল, এ ব্যাপার আজকের দিনে আমাদের কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে।

—"যতদিন না শিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই"।—

বঙ্কিমের এ উক্তির সত্যতা যে যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে, এ আমাদের ধারণার বহির্ভূত, কেননা এ সত্য আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে না উঠলেও স্বীকার্য্য হয়েছে; কিন্তু বঙ্কিম যে সময়ে লেখনী ধারণ করেন, সে সময়ে এ সত্যকে মেনে নেওয়া দূরে থাক, কেউ ধরে নিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে যুগে ছিল ইংরাজির রেওয়াজ এবং ইংরাজিরই প্রতিপত্তি। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়—অর্থাৎ ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়, ইংরাজি পড়্‌তেন, ইংরাজি লিখতেন, ইংরাজি ছাড়া আর কিছু লিখতেনও না পড়্‌তেনও না, এবং সম্ভবত কথাবার্ত্তাও

কইতেন ঐ রাজভাষাতেই। নতুবা বঙ্কিমের এ কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না যে,—

"ইংরাজি-লেখক, ইংরাজি-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই।"

(২)

এ খুব বেশী দিনের কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখার তারিখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, ১২৭৯ সাল। জাতীয় জীবনের হিসাবে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতি স্বল্পকাল, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভাবান্তর ঘটেছে, বাংলা ভাষার প্রতি অভক্তি স্পষ্টত অতিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের মধ্যে বাংলা লেখার প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে যে কতটা অদম্য হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় আমাদের মাসিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যে দেশে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একখানি মাসিক পত্র বার করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ লেখকেরও জবাবদিহি ছিল, সেই দেশে আজকের দিনে নিত্য নূতন মাসিক পত্রের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে, অথচ তার জন্য আমাদের সাধারণ লেখকদেরও কারও কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই কলিকাতা সহর থেকে মাসে মাসে কত কাগজের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তারই সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য, কেননা এ ক্ষেত্রে জন্মমৃত্যুর কোনও সঠিক রেজিষ্টারি রাখা হয় না। যদিচ এখন কাগজের আকাল পড়েছে—তথাপি বাজারে নূতন কাগজের কোনও

অভাব নেই। তারপর বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের নানা নগরী ও উপনগরী থেকে, নানা আকারের নানা বর্ণের নানা পত্র পরস্পর রেষারেষি করে' শূন্যমার্গে উড্ডীন হয়ে সাহিত্য-গগনের শোভা বৃদ্ধি করছে। বঙ্গসরস্বতীকে ঢাকা দান করেছে "প্রতিভা", মৈমনসিং "সৌরভ", বহরমপুর "উপাসনা", এবং কুচবেহার "পরিচারিকা"। এক কথায়, এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাংলা-দেশের কোন অঞ্চলেই দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নব-বঙ্গসাহিত্য বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেও স্বীয় প্রসার লাভ ও প্রভাব বিস্তার করছে। তা ছাড়া এমন কথাও শুনতে পাই যে, গুজরাটী মারাঠী হিন্দী প্রভৃতি হাল সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে বাংলা বইয়ের অনুবাদ।

(৩

এক হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, কেননা এ যুগে এদেশে ইংরাজির চর্চ্চা কমা দূরে থাক্, এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, ইংরাজি-ভাষাকে এখন বাঙ্গালীর দ্বি-মাতৃভাষা বলা যেতে পারে, যদি না বৈয়াকরণিকেরা মাতৃ-শব্দের ঐরূপ দ্বিত্বে আপত্তি করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগে, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী হাতে গোণা যেত, আর আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যার সন্ধান নিতে হলে, সরকার বাহাদুরের আদমসুমারির খাতার অনেক পাতা ওল্টাতে হয়। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যাকে বলে "ইংরাজি-বাচক", তাই ছিলেন কিনা জানি নে, কিন্তু এ কথা আমরা সবাই জানি যে,

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে এক নব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না,—এমন কি ঘরেও নয়। সেই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমন কি প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্য্যন্ত করতে পিছ-পাও হন না, তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আপনাদের অন্যত্র যেতে হবে না। আমার এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘটবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে এ সব অবশ্য খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের দেহপুষ্টির এই সব প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখে যদি কেউ মনে করেন যে, "বাংলা বনাম ইংরাজি" এই ভাষার মামলায় বাদীর পক্ষে পুরোপূরি জয়লাভ হয়েছে—তাহলে তিনি নিতান্তই ভুল করবেন; যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম্ ডিক্রী। ওদিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাজদরবার রাজনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সবই অদ্যাবধি ইংরাজির পুরো দখলে রয়েছে; শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ গণ্যমান্য লোকেরা এ সকল ক্ষেত্রে ইংরাজির দখল বজায় রাখাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য মনে করেন। বাংলা ইংরাজির হাত থেকে সেইটুকু মাত্র ছাড়া পেয়েছে, যেটুকু তার পক্ষে কেঁদে বাঁচবার জন্য দরকার।

এইই যথেষ্ট প্রমাণ যে, বঙ্গ-সাহিত্যের যে বড়দিন এসেছে, সে দিনে বাংলা ভাষা শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞার পাত্র না হলেও, শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে নি। পূর্ব্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে যথেষ্ট

অবজ্ঞা করতেন তার প্রমাণ, তাঁরা অনেকেই বাংলা লিখতেন না; আর আজ যে সেই সম্প্রদায় সে ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন না তার প্রমাণ, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা লেখেন। "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা”—এ শাস্ত্র-বচন যে লেখা সম্বন্ধেও খাটে, এ জ্ঞান সকলের থাকলে, অনেকে বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন না। আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এঁদের অনেকের গান ও গল্প পড়ে আমার মনে হয়, বাংলা লেখাটা এঁদের পক্ষে একটা সখ মাত্র, অবসরবিনোদনের একটি বিশিষ্ট উপায়—ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ আমোদ। কিন্তু সকলেরি মনে রাখা উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জনী, তা কাব্য নয়—এবং যা অবসরচিন্তা, তা দর্শন নয়। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চ্চা করা হয় না। লক্ষ্মীর সেবার অবসরে সরস্বতীর সেবা করা যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই,—তবে প্রশ্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিটি কি? আমার মতে বেশীর ভাগ কাজের লোকেরা নিজে না লিখে, পরের লেখা পড়েই ছুটির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পারেন। জ্ঞানকর্ম্মের বিভাগটা উপেক্ষা করলে, কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুরই গুণবৃদ্ধি হয় না। মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের ঘর বাঁধে, সে খেলার ঘর নয়, মনের বাসগৃহ। তাসের ঘর কিণ্ডার-গার্টেনেই শোভা পায়, সাবালক সমাজে নয়। সুতরাং যাঁরা মাতৃভাষার যথার্থ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে সে ভাষাকে সাহিত্যের রাজপাটে বসাবার জন্য এখনও বহুদিন ধরে বহু চিন্তা বহুচেষ্টা করতে হবে। বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ নয়; তাতে ভক্তির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মের নয়। অতএব জীবনের সকল ক্ষেত্রে

বাংলা-ভাষার স্বত্বস্বামিত্ব সাব্যস্ত করবার জন্য, প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমাদের পদে পদে তর্ক কর্‌তে হবে, বিচার কর্‌তে হবে, এবং প্রয়োজন হলে বিবাদ বিসম্বাদ করতেও প্রস্তুত হতে হবে। এক কথায় বঙ্গ-সরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে।

(৪)

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনই কারণ নেই। লোকভাষা যে, কোন দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে, ইউরোপের কোন নব ভাষাই একদিনে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী-ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম কর্‌তে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই :—প্রথমত কোনও মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোনও বিদেশী ভাষার, এবং তৃতীয়ত কোনও কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রায় হাজার বৎসর কাল ল্যাটিন যে ইউরোপের সাহিত্যের ভাষা ছিল, এ সত্য অবশ্য আপনাদের সকলের নিকটই সুবিদিত। এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সকল একমাত্র ল্যাটিন ভাষাতেই লিখিত হত। অপণ্ডিত লোকে অবশ্য ইউরোপের এই মধ্যযুগেও কথা ও কাহিনী, ছড়া ও

পাঁচালি প্রভৃতি নিজ নিজ ভাষাতেই রচনা করত, কিন্তু সেই লোক-সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে সেকালে সাহিত্য বলে গণ্য হয় নি—সুতরাং সে সাহিত্য সেকালে যে কোনরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ল্যাটিনের হাত থেকে ইউরোপীয় সাহিত্য বেশী দিন মুক্তিলাভ করে নি—তার প্রমাণ, Bacon তাঁর Novum Organum; Spinoza তাঁর Ethics, এমন কি Newtonও তাঁর Principia ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। ইউরোপের কোনও কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষায় Thesis লেখবার পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, বর্ত্তমান যুগের দিগ্বিজয়ী দার্শনিক Bergson, তাঁর যুগপ্রবর্ত্তক Time and Freewill নামক গ্রন্থ, আদিতে ল্যাটিন ভাষাতেই রচনা করেন। এ ব্যাপার যথার্থই বিস্ময়কর, কেননা ইউরোপের দার্শনিক সমাজে লিপি-চাতুর্য্যে বার্গ্‌সঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই;—তাঁর হাতের কলম যথার্থই সোণার কাঠি, যার স্পর্শে মনোজগতের শুষ্কতরুও পত্রে পুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—দর্শনও কাব্য হয়ে ওঠে। লোকভাষার উপর মৃত-ভাষার প্রভাবও প্রভুত্ব যে কতটা দুরপণেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম। জর্ম্মান দেশে আজও এমন সব পণ্ডিত আছেন, যাঁদের পাণ্ডিত্য ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়,—কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র। শুনতে পাই সে জাতির কোনও কোনও পণ্ডিত স্বভাষায় লিখ্‌লে, সে লেখা এত জড়ানো হয় যে, তাঁরা নিজের লেখা নিজেই পড়্‌তে পারেন না,—অন্যে পরে কা কথা। কাজেই তাঁদের ল্যাটিনের শরণাপন্ন হতে হয়, কেননা সেই ভাষার প্রসাদে তাঁদের মনের ময়লা কেটে যায়। সে যাই হোক, আসল ঘটনা এই যে, ইউরোপের লোকভাষাসকল যেদিন

ল্যাটিন ভাষার প্রভুত্ব হতে 'মুক্তিলাভ করে' নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে, সেই দিন ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগের সূত্রপাত হল ;—এক কথায়, ইউরোপীয়দের মতে সেই শুভ দিনে ইউরোপের মনের রাত কেটে গিয়ে সেখানে দিনের আলো দেখা দিলে।

(৫)

মৃতভাষার অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করবামাত্র দেশী ভাষা সব সময়ে একেবারে আত্মবশ হয়ে উঠতে পারে না ; অনেক ক্ষেত্রে তা আবার একটি বিদেশী ভাষার শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কোনও দেশের উপর বিদেশীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, সেই দেশীয় ভাষার উপর বিদেশীয় ভাষার প্রভুত্বের একটি স্পষ্ট ও প্রধান কারণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের উপর জয়লাভ করতে পারে না। গ্রীস, রোমের অধীন হয়েও পুরাকালে ভাষায় ও সাহিত্যে তার স্বরাজ্য সম্পূর্ণ রক্ষা করেছিল। ফারসিও এদেশে বহুকাল সরকারি ভাষা ছিল—কিন্তু আমাদের ভাষার উপর ফারসি ভাষার এবং আমাদের সাহিত্যের উপর ফারসি সাহিত্যের প্রভাব একরকম নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরপক্ষে এমনও দেখা যায় যে, একটি বিদেশী ভাষা রাজভাষা না হয়েও অপর ভাষার উপর একাধিপত্য করেছে। বিজিত গ্রীসের সাহিত্যের হাতের নীচেই রোমের ল্যাটিন সাহিত্য গড়ে ওঠে। এ কালের ইউরোপেও এ সত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

কিছুদিনের জন্য ফরাসি ভাষা ইউরোপে দিগ্বিজয়ী ভাষা হয়ে উঠেছিল— ইউরোপের প্রায় সকল প্রদেশের সাহিত্যই একযুগে না একযুগে ফরাসি সাহিত্যের প্রতাপে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ইউরোপের সাহিত্যের ইভলিউসানে, ইতালির reversion যথার্থই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যাঁরা জীবজগতের ইভলিউসান-তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবের ক্রমোন্নতির ধারা এক-রোখাও নয়, একটানাও নয়। ইভলিউসানের সঙ্গে সঙ্গে reversion, উন্নতির পিঠ পিঠ অবনতিও দেখা দেয়। কিছুদূর এগিয়ে তারপর পিছুহটা বোধহয় মানব সভ্যতারও নৈসর্গিক ধর্ম্ম, নচেৎ যে ভাষায় দান্তে, পেট্রার্কা, বোক্কাচ্চিয়ো, মাকিয়াভেল্লি প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখকেরা কাব্যে ও ইতিহাসে সাহিত্যের অক্ষয়কীর্ত্তিসকল রেখে গিয়েছেন, সেই ভাষা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার আনুগত্য স্বেচ্ছায় বরণ করে নিত না। ইতালির নবযুগের আদি কবি Alfieri তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর স্বকালের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই নাটক রচনা করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান জন্মাল যে, সে-সকল নাটক কাব্য নয়—শ্রীহীন শক্তিহীন প্রাণহীন কাঠের পুতুল মাত্র। এ কথা শুনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা মনে পড়ে। এর পরেই ইতালীয় ভাষা আবার তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। ইতালির সাহিত্যের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; তার কারণ, ইতালি আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের এ পারের দেশ, অর্থাৎ আমাদের এদিকের দেশ। আমাদের বিশ্বাস একালের ইতালীয়েরা পারে শুধু রাস্তায় রাস্তায় অর্গান বাজাতে, আর রঙ-বেরঙের মিষ্টান্ন তৈরি করতে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে কাব্যের অর্গানও

যে চমৎকার বাজে, এবং দর্শনের মিষ্টান্নও যে সুন্দর তৈরি হয়, তার প্রমাণ D'Annunzio এবং Benedetto Croce-র দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তি।

যে মার্টিন লুথারের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমান চর্চ্চ ও ল্যাটিন ভাষার সর্ব্বজনীন প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ল, সেই মার্টিন লুথারের স্বদেশ জর্ম্মাণীর সাহিত্যও আবার পাল্‌টে ফরাসি সাহিত্যের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দী ছিল ফরাসি সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সাহিত্যের প্রভাব জর্ম্মাণীর শিক্ষিত মনকে প্রায় একশ' বৎসরের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়ামুগ্ধ করে রেখেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ফরাসি সাহিত্যের অনুকরণে জর্ম্মাণীতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তার কোনরূপ মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই। এই ফরাসি সাহিত্যের গুণে ফরাসি ভাষাও জর্ম্মাণদের কাছে একটি নব Classic হয়ে ওঠে। নব জর্ম্মাণীর আদিকর্ত্তা Frederick the Great নিজের রসনা ও লেখনীকে সক্লেশে ফরাসি ভাষাতেই বল্‌তে ও লিখ্‌তে শিখিয়েছিলেন,—অর্থাৎ যিনি ইউরোপে জর্ম্মাণ জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, স্বয়ং তিনিই বাহোসে বাহাল-তবিয়তে এবং খোসমেজাজে ফরাসি সাহিত্য ও ফরাসি ভাষার সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য শিরোধার্য্য করে নিয়েছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণ দার্শনিক Leibnitz এই যুগে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসকল ফরাসি ভাষাতেই রচনা করেন—সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, তাঁর মাতৃভাষা দর্শন

রচনার পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিশ্বাস যে কতদূর অমূলক তার প্রমাণ, তাঁর পরবর্ত্তী এবং ইউরোপের নবযুগের অদ্বিতীয় দার্শনিক কাণ্টের গ্রন্থসকল। সে-সকল গ্রন্থ যে এ যুগের দর্শনশাস্ত্রের Classic হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়,—কাণ্টের রচনার প্রসাদে ইউরোপের মনে এমন একটি ধারণা জন্মে গেছে যে, জর্ম্মাণ ভাষাই হচ্ছে দর্শন রচনা কর্‌বার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা। অতএব দেখা গেল, মার্টিন লুথার যেমন প্রথমে ল্যাটিনের হাত থেকে উদ্ধার করে জর্ম্মাণ ভাষাকে পায়ের উপর দাঁড় করান, কাণ্ট তেমনি পরে স্বভাষাকে ফরাসির অধীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে ভাষাকে নিজের পায়ে চল্‌তে শেখান। স্বভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার স্বাধীনতা লাভ করে জর্ম্মাণ সাহিত্য যে কতদূর ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে, সে কথা বলা নিস্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—এই একশত বৎসর হচ্ছে জর্ম্মাণ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ যুগের সাহিত্যরথীদের নামের ফর্দ্দ দিতে হ'লে পুঁথি অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, এবং সে ফর্দ্দ দেবারও কোন দরকার নেই। কাব্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে জর্ম্মাণ মহারথীদের নাম শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? জর্ম্মাণ প্রতিভার এই আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব্ব বিকাশের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, জর্ম্মাণ ভাষা এবং সেই সঙ্গে জর্ম্মাণ আত্মা তার স্বরাজ্য লাভ করেছে।

(৬)

অপরপক্ষে, যে গুণে ফরাসি ভাষা রুষীয় জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার উপর প্রভুত্ব করেছে, সেই গুণেই তা এ যাবৎ স্বীয় সুনীতি ও সুরুচি

রক্ষা করে এসেছে। ফরাসি হচ্ছে বড় ঘরের সন্তান, প্রাচীন ল্যাটিনের বংশধর; সুতরাং এ ভাষা তার আত্মজ্ঞান কখনই হারায় নি, তার আভিজাত্যের অহঙ্কারই তার আত্মরক্ষার কারণ হয়েছে। ফরাসি প্রভৃতি ল্যাটিন জাতিরা বহুকাল যাবৎ জর্ম্মাণদের বর্ব্বর বলেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এসেছিল। বর্ব্বর শব্দের মৌলিক অর্থ হচ্ছে—সেই জাতি যার ভাষা বোঝা যায় না। সুতরাং এ জাতি যে কস্মিনকালেও অজ্ঞাত-কুলশীল জর্ম্মাণ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করে নি, তা বলা বাহুল্য।

এমন কি, যে জর্ম্মাণ দর্শন গত শতাব্দীতে পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের মনের উপর একছত্র এবং অখণ্ড রাজত্ব করেছে—সে দর্শনও ফরাস মনকে বেশীদিন আত্মবশে রাখতে পারে নি। প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক Taine গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মত প্রকাশ করেন যে, জর্ম্মাণী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একশ'বৎসর যা চিন্তা করেছে—তৎপরবর্ত্তী একশ বৎসর সমগ্র ইউরোপকে সেই চিন্তার পুনর্চিন্তা কর্‌তে হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে খেটেছে, তার প্রমাণ আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পাই। এ যুগের যে ইংরাজি দর্শন আমরা চর্চ্চা করি—তা যে গত যুগের জর্ম্মাণ দর্শনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার পরিচয় নব-কান্‌টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান প্রভৃতি নামেই পাওয়া যায়। আমরা দূর এসিয়াবাসী হয়েও, জর্ম্মাণ দর্শনকে দূরে রাখতে পারি নি; বরং সত্য কথা বল্‌তে হলে, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরাও শুধু জর্ম্মাণীর তৈরি বৈজ্ঞানিক খাদ্য উদরস্থ কর্‌ছি আর তার জাবর কাট্‌ছি। মনোজগতে যে, ল্যাটিন নামক একটি প্রদেশ আছে যা কুয়াশায় ঢাকা নয়—এ কথা আমরা নিজেরা আলোর দেশের লোক হয়েও, একরকম

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক বর্ণ জর্ম্মাণ না জেনেও Nietsche-র বই আমরা অনেকেই পড়েছি এবং তাঁর কথার দুকুল-ভাসানো বন্যায় হাবুডুবুও খেয়েছি, কিন্তু ফরাসি দার্শনিক Guyot-র নাম আমরা অনেকেই শুনি নি, যদিচ উভয়েই মনোরাজ্যে একই পথের পথিক; দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, যে পথে ফরাসি Guyot ধীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথে জর্ম্মাণ Nietsche তাণ্ডব-নৃত্য করেছেন। নকুলীশ-পাশুপত দর্শনে দেখতে পাই যে, পাশুপত সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে, উপহারসংজ্ঞক ছয়প্রকার ক্রিয়া ছিল। তার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে, হা হা করে' হাস্য করা, গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রানুসারে গীত গাওয়া, নাট্যশাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা, এবং হুড্ডুকার করা—অর্থাৎ পুঙ্গবের ন্যায় চীৎকার করা। Nietsche-র লেখা পড়ে আমার মনে হয় যে, নকুলীশ-পাশুপত দর্শন ভারতবর্ষে তার ভব-লীলা সম্বরণ করে জর্ম্মাণীতে আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গেটে এবং কাণ্ট সাহিত্যের জগদ্গুরু হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বিশ্ব-মানবের মনের উপর আধুনিক জর্ম্মাণ মনের প্রভাব যেমন অকারণ তেমনি মারাত্মক, কেননা জর্ম্মাণ দর্শন অপর জাতির মনের আকাশ ঘুলিয়ে দেয়। জর্ম্মাণ আত্মার অশেষ গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা সৃষ্টি করবার শক্তি, এবং সে কুয়াশার গতিরোধ করাও যেমন কঠিন, তার প্রকোপে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তেমনি কঠিন। এ সত্য ফরাসি জাতিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করে। যে সময়ে জর্ম্মাণ আত্মা আমাদের ঘাড়ে চড়্‌তে সুরু করে—ঠিক সেই সময়ে তা ফরাসিদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে সুরু করে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে Taine-এর একটি ধনুর্দ্ধর শিষ্য Maurice Barrés, ল্যাটিনমনের

উপর জর্ম্মাণ মনের এই বিজাতীয় উপদ্রবের উচ্ছেদকল্পে লেখনী ধারণ করেন। যে পুস্তকে তিনি মনোজগতে জর্ম্মাণ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন—সে পুস্তকের নাম Under the Eyes of the Barbarians। জর্ম্মাণ জাতির আদিম বর্ব্বরতা যে এ যুগে বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আকার ধারণ করেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে তা ফরাসি-মনীষীদের কাছে ধরা পড়ে, এবং তাও এক হিসেবে ভাষাসূত্রে। জর্ম্মাণ সাহিত্যের ফরাসি পাঠকেরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, জর্ম্মাণ অভিধানে এমন একটি কথা আছে, যা ফরাসি অভিধানে নেই—এবং সে হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। অপরপক্ষে জর্ম্মাণ অভিধানে humanity শব্দের সাক্ষাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্যেও লাভ করা যায় না। মাতৃ-ভাষা জাতির পৈতৃক প্রাণরক্ষার পক্ষে যে কতদূর সহায়, তারই প্রমাণ-স্বরূপ,—ঈষৎ অবান্তর হলেও,—এ ব্যাপারের উল্লেখ করলুম।

(৭)

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে লোকভাষা, মৃতভাষা এবং বিদেশী-ভাষার অধীনতাপাশ মোচন করতে পারলেও, অক্লেশে সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে পারে না। মৌখিক ভাষার স্বরাজ্যলাভের তৃতীয় পরিপন্থী হচ্ছে পুঁথিগত কৃত্রিমভাষা—অর্থাৎ সাধুভাষা। এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আমি বেশী বাক্যব্যয় করতে চাই নে; কেননা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি বহু বক্তৃতা করেছি; সে সব কথার পুনরুক্তি করা এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে প্রেয়ও নয়, শ্রেয়ও নয়; তবে কথাটা একেবারে ছেঁটে দিলে এ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, এই কারণে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমার মত বিবৃত করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষে মৃতভাষা ত্যাগ করে যখন প্রথমে লোকভাষা অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে—তখন সেই মৃতভাষার রচনা-পদ্ধতির আদর্শেই রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এর উদাহরণও ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়;—পদে ও বাক্যে Latinism-এর আমদানি ইংরাজির আদি গদ্য-লেখকেরাও যথেষ্ট করেছিলেন। সুতরাং আমরাও যে তা কর্‌ব, সে ত নিতান্ত স্বাভাবিক। বাংলা গদ্যের বয়েস সবে একশ বছর হলেও, তা এক যুগ পিছনে ফেলে এখন দ্বিতীয় যুগে চল্‌ছে। প্রথম যুগে, সংস্কৃত গদ্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে বাংলা গদ্য লেখা হত। যে যুগ চল্‌ছে, তাতে বাংলা গদ্য গঠিত হয়েছে ইংরাজি বাক্যের অনুকরণে এবং সংস্কৃত শব্দের উপকরণে। আমার বিশ্বাস, এখন আমরা তার তৃতীয় যুগের—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যুগের—মুখে এসে পৌঁচেছি। আমার এ বিশ্বাস ভুল হতে পারে, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, পরভাষার অনুকরণে এবং উপকরণে যে লিখিত ভাষা গঠিত হয়, সেই পুঁথিগত ভাষা অনেক অংশে কৃত্রিম। তারপর আর একটি কথা আছে। যার জীবন আছে, তার নিত্যনূতন বদল হয়। জীবন হচ্ছে একটি ধারা-বাহিক পরিবর্ত্তনের স্রোত মাত্র; সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রম-পরিবর্ত্তনশীল, এবং যুগে যুগে তা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; অপরপক্ষে লিখিত ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষয় হয়ে বসে থাকে। নৈসর্গিক কারণেই, লিখিত ভাষার কাছ থেকে কথিত ভাষা কালবশে এতটা দূরে সরে যায় যে, সে দুই ভাষা প্রায় দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে ওঠে। তখন মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার সেই প্রাচীন বিবাদ আবার নূতন আকারে দেখা দেয়; কেননা পূর্ব্বযুগের লিখিত ভাষা পরযুগের

কাছে সম্পূর্ণ মৃত না হলেও, অর্দ্ধমৃত ত বটেই। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার বিরোধের চাইতে সাধুভাষার সঙ্গে চল্‌তি ভাষার বিরোধের কলরবটা কিছু বেশী, কেননা এ হচ্ছে জ্ঞাতি-শত্রুতা। তা ছাড়া লিখিত ভাষাই হচ্ছে সাহিত্য-জগতে মৌখিক ভাষার যথার্থ শিক্ষাগুরু। সুতরাং মৌখিক ভাষার পক্ষে সাহিত্যরাজ্য অধিকার করবার প্রয়াসটা সত্য সত্যই শিষ্যের পক্ষে গুরুকে ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা। এ অবস্থায় সাহিত্যের দ্রোণাচার্য্যেরা যে সাহিত্যের একলব্য-দের অঙ্গুলিচ্ছেদের আদেশ দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?—এতে অবশ্য ভয় পেলে স্বভাষাকে স্বরাট করে তোলা যাবে না। এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জ্জন করা যায় না। Plato, Aristotle-এর যুগ থেকে সুরু করে অদ্যাবধি, সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়। মৃতভাষার সঙ্গে জীবন্ত ভাষার, বিদেশী ভাষার সঙ্গে স্বদেশী ভাষার লড়াইও ত ঐ বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার জীবন-সংগ্রাম বই আর কিছুই নয়।

(৮)

ইউরোপ হতে সংগৃহীত এই ইতিহাসের আলোক বঙ্গভাষার উপর ফেলে দেখা যাক্, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থাটা কি ? বঙ্গ-ভাষার পরাভব আমরা আজও পুরো জানি নে; কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের

ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এ ইতিহাসের দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অধ্যায় আছে। আমাদের সাহিত্যের যে যুগ গত হয়েছে সেটিকে নবাবী যুগ, এবং যে যুগ আগত হয়েছে সেটিকে ইংরাজি যুগ বলা যায়।

নবাবী যুগের সাহিত্যে, ছড়া পাঁচালি পদাবলী ও সংস্কৃত কাব্যের প্রাকৃত অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না; এক কথায় এ সাহিত্য হচ্ছে পদ্যে লেখা গান ও গল্পের সাহিত্য। কিন্তু নবাবী আমলে বাঙ্গালী যে একমাত্র উদরান্ন ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে নি, এ কথা সত্য নয়। সে যুগে এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। জনরব যে, মনুসংহিতার মন্বর্থ-মুক্তাবলীর রচয়িতা কুল্লুকভট্ট তাহিরপুরের রাজবংশের, এবং কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকুলের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ সত্য বলে গ্রাহ্য করে' নেবার দিকে আমার মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে, কেননা আমি জাতিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও, প্রমাণের অসদ্ভাবহেতু এ কিম্বদন্তিতে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর হাতে যে একটি নব্যন্যায় এবং একটি নব্য স্মৃতি গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশজাত এ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রের মুল্য যে কি, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার জনৈক দ্রাবিড় বন্ধু বলেন যে, বাঙ্গলার নব্যন্যায় যে নব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা ন্যায় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে! অষ্টাদশতত্ত্ব রচনা করে রঘুনন্দন বাঙ্গালী জাতির উপকার কি অপকার করেছেন, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদের অবসর আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থই

প্রমাণ যে—নবাবী আমলেও বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এবং বাঙ্গালী সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিচার করতে কখনই ক্ষান্ত হয় নি। কিন্তু সে যুগে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, যেমন মধ্যযুগে ইউরোপের ছিল ল্যাটিন। সে কালে বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবার লোকভাষার কোনই অধিকার ছিল না। সুতরাং এদেশে ইংরাজ আসার পূর্ব্বে বাংলা ছিল, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলত একটি vulgar tongue-অর্থাৎ ইতর ভাষা।

ইংরাজি আমলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু আমাদের দর্শন বিজ্ঞানের বাহন আজ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজি হয়েছে। কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণ স্বরূপ দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রভৃতি দেশপূজ্য মনীষীগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ইংরাজি ভাষাতেই রচনা করেন। অর্থাৎ Leibnitz-এর যুগে জর্ম্মাণ ভাষার যে অবস্থা ছিল—আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে,—সাহিত্যের স্কুলে আজও তা প্রমোসন পায় নি, তার ইতরতার কলঙ্ক আজও ঘোচে নি।

(৯)

বলা বাহুল্য বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডীর ভিতর আটক থাকবে—ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের

মুকুটমণি হলেও, সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তনসংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও রসতত্ত্ব-বিচারের বেজায় ধূম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ থাকত না, যদি সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার একটা সম্ভাবনা না এসে পড়্‌ত। কদলী বৃক্ষের অন্তরে সার নেই—আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গ সাহিত্যে সেই সুগোল নিটোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলী ভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে, আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,—ভাষার উৎপত্তি কর্ম্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত মানুষের চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনও উপায় নেই। অপরপক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরাজরা emotion,—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে—যথা, স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু শিৎকার চীৎকার প্রভৃতি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে। কাব্য সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, কেননা একমাত্র কাব্যেই, জ্ঞানের ভাষা কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা,

এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়। তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য, যাঁর হৃদয়রসের সঙ্গে বহুলপরিমাণে জ্ঞানের সার, যাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে অনেকখানি মনের ধাতু অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। সত্য ও সুন্দর যে কারও কারও হাতে একই বস্তু হয়ে ওঠে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কালিদাস সেক্‌স্‌পিয়ার দান্তে মিলটন গেটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাকবিদের কাব্য।

সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অজ্ঞান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন—এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা। অতএব কি অবস্থায় এবং কি কারণে লোকভাষা পরবশ হয়ে পড়ে, আর কি ব্যবস্থায় এবং কি উপায়ে তা আত্মবশ হয়ে ওঠে, তারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। অবস্থা বুঝলে তার ব্যবস্থা করা সহজ। মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সম্বরণ করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" আর "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"।

(১০)

জীবন্ত ভাষার উপর মৃত ভাষার প্রভুত্বের কারণ নির্ণয় করবার জন্য, ল্যাটিনের উদাহরণ নেওয়া যাক্। পুরাকালে ল্যাটিন যে ইউরোপের পশ্চিমভাগের উপর একাধিপত্য করেছিল তার কারণ, সেকালে ল্যাটিন ছিল সে ভূভাগের রাজভাষা। গ্রীকভাষা সে যুগে রোমানদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হলেও, সে ভাষা রাজভাষা নয় বলে

রোমের অধীনস্থ অপর দেশসকলে তা অপরিচিত ছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংশের পরও ল্যাটিন যে আর এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করে—তার কারণ রোম তার রাজত্ব হারিয়ে স্বর্গত্ব লাভ করলে;—যে রোম ছিল প্রাচীন যুগের কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্র, সেই রোম হয়ে উঠল মধ্যযুগের ধর্ম্মরাজ্যের Eternal City, অর্থাৎ অমরাপুরী। এক কথায়, রোমানরা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার পর ল্যাটিন হল দেবভাষা। কোনও বিশেষ ধর্ম্মের ভাষা, অর্থাৎ যজনযাজন ধ্যানধারণা উপাসনা আরাধনা মন্ত্রতন্ত্র স্তবস্তোত্রের ভাষা যে, সেই ধর্ম্মাবলম্বী লৌকিক মনের অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে,—বিশেষত সে ভাষার অর্থ যদি জনগণের জানা না থাকে,—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত। ল্যাটিনের প্রতাপ ইউরোপে আজও অক্ষুণ্ণ থাকৃত, যদি না Renaissance এবং Reformation ইউরোপের মনকে রোমান-চর্চ্চের একান্ত বশ্যতা থেকে মুক্ত করত। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীক সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীনচিন্তা ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করলে। এর ফলে, রোমের ধর্ম্ম-মন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হ'ল, এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষারও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হল। গ্রীক ভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণসত্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ল। এই গ্রীক সাহিত্যের চর্চ্চায় সে যুগের মনীষীগণ নূতন দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত দর্শন বিজ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও, বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। এক ধর্ম্মমতের স্থান

অধিকার করতে পারে শুধু আরেক ধর্ম্মমত। তাই লুথারের প্রবর্ত্তিত Reformationই জর্ম্মাণিক ভাষাসমূহকে ল্যাটিনের অধীনতা থেকে যথার্থ মুক্তি দান করলে।

(১১)

লুথার যেদিন জর্ম্মাণীর লোকভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, সেই দিনই জর্ম্মাণ সাহিত্যের পাকা বুনিয়াদের পত্তন হল। ভাষার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও, নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্ম্মমত ভাষান্তরিত হলে, রূপান্তরিত হতে বাধ্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করবার অব্যবহিত কাল পরেই সে দেশে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক খৃষ্ট সংঘের সৃষ্টি হল,—একটি রোমে আর একটি কনষ্টাণ্টিনোপলে। রোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের মুখে যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, খৃষ্টধর্ম্ম তার অভ্যুত্থানের মুখে ঠিক সেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর মূল কারণ যে ভাষার পার্থক্য, তার পরিচয় এ দুটি সংঘের নামেই পাওয়া যায়;—একটির নাম গ্রীক চর্চ্চ, অপরটির রোমান। New Testament যদি গ্রীক অর্থাৎ ইউরোপের ভাষায় লেখা না হ'ত, তাহলে এসিয়ার ধর্ম্ম ইউরোপে গ্রাহ্য হ'ত কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ভাষার শক্তিতে আমি এতটাই বিশ্বাস করি। এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মও যে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মূলেও ছিল ঐ ভাষার পার্থক্য। মহাযানের ভাষা সংস্কৃত, এবং হীনযানের পালি।

অপরপক্ষে পৃথিবীতে যখন কোন নূতন ধর্ম্মমত জন্মলাভ করে, তখন তার বাহন হয় একটি নূতন ভাষা। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল পালিতে, এবং জৈনধর্ম্ম মাগধী প্রাকৃতে।—সুতরাং লুথার যখন খৃষ্টধর্ম্মের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁকে ল্যাটিন ত্যাগ করে জর্ম্মাণ ভাষারই আশ্রয় নিতে হল। তিনি এ উপায় অবলম্বন না করলে Protestantism ইউরোপে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম হিসেবে কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। তার প্রমাণ, ল্যাটিনের অপভ্রংশ যাদের মাতৃভাষা, ইউরোপের সেই সকল জাতি আজিও রোমান ক্যাথলিক; রোমান্স ভাষাই রোমান চর্চ্চের সঙ্গে তাদের মনের প্রধান যোগসূত্র। অপরপক্ষে যে-সকল জাতির ভাষা জর্ম্মাণিক, সেই সকল জাতিই প্রটেষ্টাণ্ট। একই কারণে বাংলা সংস্কৃতের প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হযেছে। মহাপ্রভু যেদিন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, জ্ঞান ও কর্ম্মের উপরে ভক্তির প্রাধান্য প্রচার করতে উদ্যত হলেন, সেদিন তাঁকে সংস্কৃত ত্যাগ করে বাংলার আশ্রয় নিতে হল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সংস্কারকে বাংলাদেশের Reformation বলা অসঙ্গত নয়। তারপর এসেছে আমাদের Renaissance;—ইউরোপ একদিন যেমন গ্রীক সাহিত্য আবিষ্কার করে ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে, আমরাও তেমনি ইংরাজি সাহিত্য আবিষ্কার করে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য হতে মুক্তি লাভ করেছি,—এবং সে একই কারণে। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীক, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল;—আমাদের কাছেও ইংরাজি তেমনি, ধর্ম্মের নয়, বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে।

ল্যাটিন অবশ্য তাই বলে ইউরোপে বাতিল হয়ে যায় নি ;—সে ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা আজও সে দেশে সজোরে চল্‌ছে—কিন্তু সে বিদ্যা-শিক্ষার ভাষা হিসাবে। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক-জাতির কাছে সে ভাষা আজও কতকপরিমাণে ধর্ম্মের ভাষা বলে মান্য, কিন্তু প্রধানতঃ বিদ্যাশিক্ষার ভাষা বলেই গণ্য। আমাদের বাঙ্গালীদের কাছে সংস্কৃত আজকের দিনে ঐ হিসাবেই গণ্য ও মান্য।

(১২)

অতএব দেখা গেল যে পরভাষা, তা মৃতই হোক আর বিদেশীই হোক, লোকভাষার উপর প্রভুত্ব করে এই গুণে যে, তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা, এক কথায় বিদ্যাশিক্ষার ভাষা ; বলা বাহুল্য ধর্ম্মের ভাষাও আসলে বিদ্যার ভাষা। অপর বিদ্যার সঙ্গে এ বিদ্যার প্রভেদ এই যে, তা অপরা বিদ্যা নয়—তা হচ্ছে theology, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুণেই ইংরাজি আজ বাংলার উপর প্রভুত্ব করছে। এ প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা, অধ্যয়ন অধ্যাপনার ভাষা, এক কথায় বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলা। আমাদের উচ্চ আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাংলা উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে ; শুধু বাল্য বিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ভাষা পাবে প্রথম আসন, এবং ইংরাজি দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করবে। যতদিন বাংলা, হয় বিদ্যা-লয়ের বহির্ভূত হয়ে থাক্‌বে, নয় ইংরাজির অনুচর কিম্বা পার্শ্বচর হিসাবে সেখানে স্থান পাবে,—ততদিন বাংলা সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব-শক্তিশালী হয়ে উঠবে না, এবং বাঙ্গালীর প্রতিভাও ততদিন পূর্ণ বিকাশ

লাভ করবার পূর্ণ সুযোগ পাবে না। সাহিত্যেই জাতীয় মনের প্রকাশ, অতএব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যেই জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভাষা ও মন একই বস্তুর এ পিঠ আর ওপিঠ। বাংলা ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষা করে তোলবার পথে কত এবং কি গুরুতর বাধা আছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, তৎসত্ত্বেও আমি বলি, সে-সকল বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে—নচেৎ বাঙ্গালীর মন চিরকাল অর্দ্ধপক্ক অবস্থাতেই থেকে যাবে। বঙ্গ সাহিত্যের গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধনিবন্ধাদি পাঠ করলেই দেখা যায় যে, সে সকল রচনা কোনও অংশে পাকা আর কোনও অংশে কাঁচা। এ সব লেখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। পঠিত পুস্তকের স্মৃতি লেখকদের যেখানে অক্ষুণ্ণ, সেখানে লেখা পাকা, আর যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানে কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মনের পরিচয় পেয়ে ইউরোপ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই পক্ককষায় মন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একান্ত দুর্লভ। এর কারণ, আমাদের মনকে দিবারাত্র পরভাষার জাগ দিয়ে অকালপক্ক করে তোলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের ভাষা না হলে আমাদের ভাষা যে তার পূর্ণশ্রী পূর্ণশক্তি লাভ করবে না, এ কথাও যেমন সত্য;—অপরপক্ষে আমাদের সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য না হলেও যে তা বিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হবে না, এ কথাও তেমনি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় লিখেছেন—

"এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "মহাশয় আপান বাঙ্গালি, বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন"? তিনি উত্তর করেন "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর

করিব ? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি"। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এ কথার উত্তর নাই"।

আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি আমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তাহলে আমাদেরও মুক্তকণ্ঠে না হোক্ রুদ্ধকণ্ঠে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। তবে আমাদের এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ;—বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সে জন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম কর্‌তে হবে। ইতি-মধ্যেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতৃভাষাতেই ইতিহাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল রচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছেন ; কিন্তু সে সাহিত্যের যে তেমন কিছু গৌরব কিম্বা সৌরভ নেই তার কারণ, একদিকে ইংরেজি ভাবের আর একদিকে সংস্কৃত ভাষার চাপের মধ্যে পড়ে, আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভাবতেও পারি নে, মুক্তহস্তে লিখতেও পারি নে।

(১৩)

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃতভাষা ও পরভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত কর্‌তে চাই বলে, এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরাজির পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা কর্‌লে বঙ্গ সাহিত্যে ইভলিউসান হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবত ভীষণ reversion এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ কর্‌ব, যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে।

বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল ভাষাই গ্রীক ল্যাটিনের অধীনতা হতে মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাই বলে সে দেশে গ্রীক ল্যাটিনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ হয় নি। বরং সাহিত্য-রাজ্যে ইউরোপের এই স্বদেশী যুগে উপরোক্ত দুটি ক্ল্যাসিকের চর্চ্চা যত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, ক্ল্যাসিক শাসিত যুগে তার সিকির সিকিও হয় নি।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে. ক্লাসিক চর্চ্চা করবার সার্থকতা কি? তাহলে সে দেশের কাব্যরসের রসিক উত্তর দেবেন যে, ঐ দুটী প্রাচীন ভাষায় যে কাব্যামৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রসাস্বাদ না করলে মানব জনম বিফল হয়; দার্শনিক বলবেন, মনের উদারতা ও হৃদয়ের গভীরতা লাভ করবার জন্য অতীতের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে উদ্যত হবেন যে. অতীতের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যথার্থ প্রকৃতি ও মতিগতির পরিচয় পাব না, কেননা বর্ত্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে; এবং আর্টিষ্ট দেখিয়ে দেবেন যে, ক্লাসিক সাহিত্যের এমন একটী গুণ আছে, যা বর্ত্তমান সাহিত্যে পাওয়া দুর্ঘট—এবং সে গুণের নাম হচ্ছে আভিজাত্য। এ সকল উক্তিই সত্য; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা আমাদের চিরদিনই করতে হবে। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার মধ্যে, গ্রীক ল্যাটিন ও সংস্কৃত, এই তিনটী আর্য্য ভাষাই ক্লাসিক—অপর কোনোটীই নয়। এ স্থানে একটী কথার উল্লেখ করা দরকার। অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে, ইউরোপে গ্রীক ল্যাটিনের বাণী সেকালে ছিল প্রভুসম্মিত, একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত,—অর্থাৎ আগে যা ছিল বেদবাক্য, এখন তা হয়েছে

ন্যায়কথা। আশা করি কালে সংস্কৃতসরস্বতীর বাণীও আমাদের কাছে তার প্রভুসম্মিত চরিত্র হারিয়ে সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে। তা যে দূর ভবিষ্যতেও কান্তাবাণী হয়ে উঠবে, সে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। এই তিনটী ক্লাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটীই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়;—সে সাহিত্যে আধ আধ ভাষ, কিম্বা গদগদ ভাষের স্থান নেই, সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্ব্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোনও ভাষাই অপর কোনও ভাষার আওতায় পড়ে নেই,—সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান; অথচ সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশী ভাষা ব্যতীত আরও অন্তত দুটি তিনটি বিদেশী ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি?—এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চা ছেড়ে দিলে, মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়,—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত, ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার

করবার জো নেই যে, যে-জাতি মনে যতই বড় হোক্ না কেন, তার মনের একটা বিশেষরকম সঙ্কীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশীমনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে—এবং এই সূত্রে; জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে; তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে, অপর জাতির লোকরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে,—আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ কর্‌তে হলে, আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনও দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগ-বাটোয়ারা করি,—সত্যের আলোকে এ সব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করি বলে, আমার মতে, আমাদের পক্ষে শুধু ইংরাজি নয়, সেই সঙ্গে ফরাসি এবং জর্ম্মাণও শেখা দরকার। ইংরাজি ভাষা অবশ্য সমগ্র ইউরোপের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা আমাদের মনের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু অনুবাদের মারফৎ সাহিত্য পড়া গ্রামোফোনের মারফৎ গান শোনার মত; অর্থাৎ ও উপায়ে মানুষের প্রাণের কথা আমাদের কাণে যন্ত্রধ্বনি আকারে এসে পৌঁছয়। সে যাই হোক্, আজকের দিনে ইংরাজির চর্চ্চা ত্যাগ কর্‌লে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ের প্রবেশ-দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান

ভাষা হলে ইংরাজি-বাণী আর প্রভুসম্মিত থাক্‌বে না, সুহৃদ্‌সম্মিত হয়ে উঠবে—প্রভু তখন যথার্থ সখা হয়ে উঠবে। আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব।

(১৪)

আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে "স্বরাজ" ছাড়া অপর কোনও কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজহাতে গড়ে তুলতে হয়। তারপর দেশের স্বরাজ্য ইংরাজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও, মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেননা এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে, তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।

এক জাতের বুদ্ধিমান লোক আছেন যাঁরা বলেন যে, আমাদের পক্ষে একটা বড় সাহিত্য গড়ে তোলবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বৃথা। তাঁদের মতে সাহিত্যের অভ্যুদয় জাতীয় অভ্যুদয়কে অনুসরণ করে। এবং নিজের মতের স্বপক্ষে তাঁরা Pericles-এর Athens, Augustus-এর রোম, Elizabeth-এর ইংলণ্ড এবং Louis xiv-এর ফ্রান্সের নজির দেখান। এ মত গ্রাহ্য করার অর্থ, আত্মার উপর বাহ্যবস্তুর শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করা। কিন্তু অদৃষ্টবাদ মানুষের পুরুষকারকে খর্ব্ব করে, অতএব বিজ্ঞানসম্মত হলেও তা অগ্রাহ্য। সুখের বিষয় এ মত মেনে নেবার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। যদি সাহিত্যের

অভ্যুদয় একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করত, তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মাণীতে অমন অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হত না, কারণ সে যুগে জর্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয়শক্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান যেদিন সমবেত জর্ম্মাণ জাতিকে পদদলিত করে Jena নগরে প্রবেশ করেন, সেদিন সে নগরে গেটে ও হেগেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্ভবত এঁদের একজন কাব্যের, আর একজন দর্শনের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; কেননা বিজয়ী ফরাসিদের তোপের গর্জ্জন যে এঁদের যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ করেছিল—এ কথা ইতিহাসে লেখে না। আর এ যুগে জর্ম্মাণ জাতি সাংসারিক হিসেবে অপূর্ব্ব অভ্যুদয় লাভ করেছে, কিন্তু জর্ম্মাণ সাহিত্য সে অভ্যুদয়ের অনুসরণ করে নি। বরং সত্য কথা এই যে, সে দেশে লক্ষ্মীর আস্ফালনে সরস্বতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছেন।

আসল ঘটনা এই যে, যুগবিশেষে দেশবিশেষের জাতীয় আত্মা যখন সজ্ঞান ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন কি সাহিত্য কি সমাজ সবই এক নূতন শক্তি লাভ করে, এক নূতন মুর্ত্তি ধারণ করে। তখন জাতির আত্মশক্তি নানা দিকে নানা ক্ষেত্রে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। Pericles-এর Athens প্রভৃতি এই সত্যের নিদর্শন। কিন্তু এমন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, জাতীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও অবস্থার গুণে বা দোষে তা বিশেষ একটা দিকেই মাথা তুলতে পারে,—হয় সাহিত্যের দিকে, নয় শিল্পবাণিজ্যের দিকে। সুতরাং জাতি হিসাবে আমরা শক্তিশালী নই বলে, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা যে বিড়ম্বনা, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রধান কাজই যখন জাতীয় আত্মাকে প্রবুদ্ধ করা—তখন তার অবসর চিরকালই

আছে। আমার শেষ কথা এই যে, বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গলীর ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাংলার বেখাপ বর্ণমালা।

——ঃ০ঃ——

হরিকে সে কেন অরি বলে, এক চাষার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে উত্তর করে—"কইতে কই অরি কিন্তু লিক্‌তে লিকি অরি!" আমরা, বাঙালীরা, কইতে কই বাংলা, কিন্তু লিখ্‌তে লিখি সংস্কৃত—অন্তত, লেখবার বেলা সংস্কৃত-গোচের একটা সাধু-ভাষার চর্চ্চা ক'রে আসা গেছে; যাতে ক'রে অনেক সময়, দ্বিজু রায়ের গানের গ্রন্থকারের রচনার মত, "দিনের মত বিষয় হত রাতের মত অন্ধকার, জলের মত বিষয় হত ইঁটের মত শক্ত!"

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, এ সহজ তত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র করলে কিছুদিন আগে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার বেধে যেত। ক্রমে, কি ভাগ্যি, সত্যি কথাগুল আমাদের দেশের লোকের গা-সওয়া হয়ে আস্‌ছে। বাঙালীর বুকের পাটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাটাও ক্রমশ নিজমূর্ত্তি ধ'রে সেবকদের কাছে দেখা দিচ্ছে।

সংস্কৃত-ছাঁদে চলবার চেষ্টা ক'রে বাংলা ভাষার যে দুর্গতি হয়েছে তার খবর আমরা মাঝে মাঝে সবুজ পত্রের পাতায় সম্পাদক মশায়ের কলম থেকে পেয়ে থাকি। সম্প্রতি, যে গবেষণার ফলে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন, তার এক অংশ দেখার সুযোগ ঘটায়, খাঁটি বাংলায় যত রকমের শব্দ শোনা যায় তার লিপি হিসেবে সংস্কৃতের নকল-করা বর্ণমালা কতটা খাপ-ছাড়া, তা বুঝতে আর বাকি নেই।

পাঁচ ভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চায় সুনীতি বাবু যে অধ্যবসায় দেখিয়েছেন, সূক্ষ্ম আওয়াজ কানে ধরবার, মিশল আওয়াজ ছাড়িয়ে দেখবার তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ভরসা হয় যে এত দিন পরে একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ জুটবে। গ্রন্থটা শেষ হতে দেরী লাগবে, বর্ণমালা সম্বন্ধে যেটুকু হয়েছে তাও প্রকাশ হয় নি। সুতরাং তা থেকে দু-চারটি কৌতুকের কথা তুলে নিয়ে আমার এ প্রবন্ধের কাজে লাগিয়ে নিলে দোষ কি?

পণ্ডিতী ভাষায় লিখতে থাকলে পণ্ডিতী বর্ণমালার ত্রুটি বড় ধরা পড়ে না। মুখের কথার শব্দ*গুলি লেখায় ঠিকমত আনবার চেষ্টা করলে তবেই ফ্যাসাদে পড়তে হয়। তখন টের পাওয়া যায় যে ছেলে-বেলার মুখস্থ বর্ণমালা গোড়ায় বাংলা ভাষার জন্যে তৈরী হয় নি। সাহেবের সামনে বার করবার জন্যে শিশু বাংলা ভাষাকে সস্তায় পাওয়া ready-made পোষাকে সাজ'তে গিয়ে তার চেহারাও খোল্‌তাই হয় নি, তার অবাধে চলা-ফেরাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

প্রথমত, বাংলা কথা কইতে যত রকমের যতগুলি আওয়াজ মুখ দিয়ে বার হয়, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা দিয়ে তা ত লিখে দেখাবার উপায় নেই। আবার এই বর্ণমালায় কোন কোন শব্দের একের বেশী অক্ষর থাকায়, কোন্‌টি কোথায় খাটে তা বুদ্ধি খাটিয়ে জানবার যো নেই; হয় সকলে মিলে, চোখ বুজে, একই বদভ্যাস বজায় রাখা, নয় নানা মুনির নানা মত ফলান, এ দুই দোষের মধ্যে একটা এসে পড়ে। তার উপর এমন অক্ষরও সব আছে যারা

---

* এ প্রবন্ধে শব্দ কথাটা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না। পাঠকরা অনুগ্রহ ক'রে ওর বাংলা মানে "আওয়াজ" যেন ধ'রে নেন।

বেকার ব'সে থেকে জায়গা জুড়ে আছে মাত্র। লাভের মধ্যে, বানান শিখতে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়, ছাপাখানার ঝঞ্ঝাট ও খরচ বাড়ে, আর বাংলা typewriter অভ্যুদয়ের পথে কাঁটা পড়ে।

বর্ণপরিচয়ের হাল সংস্করণে অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ফর্দ্দে ৪০টি অক্ষর দেখা যায়। পাঁচ বর্গের পাঁচটি ক'রে ২৫; য থেকে হ পর্য্যন্ত ৮; আর হ-র পর ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ এই ৭টি। সাধে বলি পণ্ডিতী-বর্ণমালা! যতক্ষণ সংস্কৃতের নকল চল্‌ছিল ততক্ষণ এক রকম ছিল। কিন্তু হসন্ত ত-কে খণ্ড-ত নাম দেওয়াই বা কি, আর তাকে বর্ণমালায় আলাদা স্থান দেওয়াই বা কি, কার সহজ বুদ্ধিতে আসৃত? হাতের লেখার আমলে স্বধু ত-য়ে হসন্তের চিহ্ন কেন, হ-য়ে উকার, ভ-য়ে রফলা, ট-য়ে ট-য়ে, প্রভৃতি, হাতের টানে অক্ষরে-চিহ্নে জড়িয়ে, কত নতুন রকমের চেহারা দাঁড়াত—সবগুলি যে আলাদা অক্ষর ব'লে বর্ণমালায় ঢুকে পড়ে নি, এই ভাগ্যি! ছেলেবেলায় ক্ষ ও জ্ঞ-কে এ রকম অনধিকার প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছিল, আজকাল তারা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ছেড়ে যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রে বাঁচিয়েছে।

সে যা হোক্, সংস্কৃত আদর্শের মায়া কাটিয়ে, ছেলেবেলার মুখস্থ ভুলে, একমাত্র বাংলা উচ্চারণের হিসেবে যদি একটি বর্ণমালা বা শব্দ-মালা খাড়া করা যায়, তাহলে যা দরকার নেই তা বাদ দিলে, যা অভাব আছে তা যুগিয়েও ঐ ৪০ অক্ষরের কমেই কাজ চলে। আলোচনার সুবিধের জন্যে বাংলার শব্দসকল আমার পছন্দমত ৯টি বর্গে ভাগ ক'রে সাজান যাক্। আমার এ ফর্দ্দ থেকে ফাজিল অক্ষর সব বাদ দিয়ে, নাজাই অক্ষরের কাজ চলিত অক্ষরে ফুট্‌কি প্রভৃতি চিহ্ন যোগে সেরে নেওয়া যাচ্ছে।

১।	ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ।	...	...	৪
২।	চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ।	...	...	৪
৩।	ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ।	...	...	৪
৪।	ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ।	(ৎ=হসন্ত ত মাত্র)		৪
৫।	প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ।	...	...	৪
৬।	ঁ-বর্গ—ঁ, ন, ম, ঙ।	(ং=হসন্ত ঙ মাত্র)		৪
৭।	য়-বর্গ—য়, র, ল, ড়, ঢ়, ব (w)।		...	৬
৮।	শ-বর্গ—শ, স, চ় (ts), জ় (z)।		...	৪
৯।	হ-বর্গ—হ, guttural খ় ফ় (f), ভ় (v)। (ঃ=হসন্ত হ)		...	৪
			মোট—	৩৮

আমার এই বর্গগুলির মধ্যে প্রথম ৫টি মামুলী, তাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। চলিত বর্ণমালার অক্ষরগুলি এ স্থলে ঠিকমত কাজই দিচ্ছে—প্রত্যেক শব্দের একটি ক'রে অক্ষর, প্রত্যেক অক্ষরের একমাত্র শব্দ। কিন্তু বাদবাকি বর্গগুলিতে কিছু বা পুরোণ বিদায়, কিছু বা নতুন আমদানী হয়েছে, সে সব কথা খুঁটিনাটি ক'রে বলা দরকার।

ঁ বর্গ

চন্দ্রবিন্দু বে-ভেজাল খাঁটি নাকিসুরের চিহ্ন, তাই ওকে বর্গের মাথায় বসিয়ে ওর নামে বর্গের নাম দেওয়া গেল। তবে চন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ব্যঞ্জন-শব্দের একটি গুণ নেই, অর্থাৎ ওর সঙ্গে অপর ব্যঞ্জন শব্দের দ্বিত্ব না হয়েই যোগ হয়। দাঁতে জীভ চেপে নাকি আওয়াজ করলে ন্ (n) বেরয়, ঠোঁট চেপে করলে ম্ (m)। ঞ ও ণ-র বাংলায়

আলাদা শব্দ কিছু নেই, ওদের কাজ অপর অক্ষর যোগে চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই ফর্দ্দ থেকে এ দুটি বাদ পড়্‌ল।

অপর ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাক্‌লে ঞ-র শব্দ ঠিক দন্ত্যন-র মত। মঞ্চ = মন্‌চ, গঞ্জ = গন্‌জ, ঝঞ্ঝন্ = ঝন্‌ঝন্। ঞ একলা পড়লে য়ঁ ছাড়া আর কিছু নয়—ডেঞে = ডেয়েঁ। যাচ্ঞা কথায় ঞ ঙ-র মত হয়ে যায় (যাচিঙ্গা)। ঞ র খাঁটি আওয়াজ হিস্পানী Soñor প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষার কথায় আজও পাওয়া যায়, রাঢ়দেশের স্থানে স্থানে যাইঞা খাইঞার মধ্যে ঞ-শব্দ অস্থানে র'য়ে গেছে, কিন্তু কলকাতাই বাংলায় তা মোটেই নেই।

ণ-র "আনো" * নাম থেকে অনুমান হয় যে ওর মূর্দ্ধন্য উচ্চারণের সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ মূর্দ্ধা থেকে উচ্চারণ হয় এবং সেখানে বর্ণমালা আওড়াবার সময় ওকে "অণ" ব'লে পড়া হয়। টাকরার উপর দিকে জীভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব্দ বার হবার আগে একটা অ শব্দ আপনি এসে পড়ে। কিন্তু বাংলায়, এখনকার মত মূর্দ্ধন্য ণ-কে আবকল দন্ত্যন-র মত উচ্চারণ করতে হলে, ওকে "আনো" নাম দেবার কোন কারণ বা মানে থাকে না। যা হোক্ একালে খাঁটি মূর্দ্ধন্য ণ শব্দ বাংলা থেকে এমনি লোপ পেয়েছে যে ইচ্ছে করলেও তা বাঙালীর মুখ দিয়ে বার হওয়া ভার।

বাংলার ঙ শব্দ ন-য়ে গ-য়ে মোলায়েম মিলনের ফল। বাংলা কথায় যে-কোন দুই ব্যঞ্জন বর্ণের যোগ হলে একটি ঝোঁক এসে পড়ে,

---

* ছেলেদের পাখী-আঁকার ছড়া—

এক ছিল আনো
তার পিঠে চেপেছে দানো। ইত্যাদি।

যার ফলে যুক্তশব্দের একটির (প্রায়ই দ্বিতীয়টির) † দ্বিত্ব হয়। কর্জ্জা দুই জ দিয়েই লিখি, আর এক জ দিয়ে কর্জা লিখি, উচ্চারণের বেলা জ-টি ডবল না হয়ে যায় না। কিন্তু ঙ শব্দে গ-র দ্বিত্ব না হয়েই ন-য়ে গ-য়ে যোগ হয়েছে, তাই বর্ণমালার অপর অক্ষর যোগে এ আওয়াজটুকু পাবার যো নেই। গ-র দ্বিত্ব নিয়েই ঙ-য় ঙ্গ-য় প্রভেদ এবং সেই কারণেই কলকাতাই উচ্চারণে যাঁদের কান তৈরী তাঁরা আজকাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা না লিখে বাঙালী ও বাংলা লিখতে বাধ্য হন।

য়-বর্গ

যে অক্ষরটাকে অন্তস্থ য বলা হয় (সে যখন কথার আদ্যন্তমধ্যে সমভাবে বিরাজ করে তখন তার অন্তস্থ নাম ঘুচিয়ে দিলে মন্দ হয় না) তার আওয়াজ বর্গীয় জ থেকে কোন অংশে ভিন্ন নয়, কাজেই এ অক্ষর আমার শব্দমালায় স্থান পেতে পারে না। অন্তস্থ-য বাদ দিয়েও, এই তরল য়-বর্গে অপর সকল বর্গের চেয়ে শব্দসংখ্যা বেশী। বিদেশের লোকে যে বাংলা কথাকে শুনতে মিষ্টি বলে, সেটা হয়ত এই তরল শব্দের প্রাচুর্য্যে।

বাংলা য় ইংরেজী y-র কাজ করা সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর মনে কেমন যেন একটু কিন্তু র'য়ে গেছে যার তাৎপর্য্য আম ঠিক ধর্‌তে পারি নি। পূর্ব্বে য় (yaw) অক্ষরকে অন্তস্থ-অ বলা হত, এবং হয়ত তার উচ্চারণ অ-র মতই ছিল। কিন্তু আজকাল ছায়া বায়ুর ত কথাই নেই, কেয়ুর, ময়ূরকেও বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকে কেউর, মউর না ব'লে keyur,

† য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা যোগ হলে ফলাদি-লোপ বা লুপ্তপ্রায় হয়ে যুক্তবর্ণের প্রথমটির দ্বিত্ব হয়—যেমন প্রাপ্য (প্রাপ্প), অশ্ব (অশ্‌শ), পদ্ম (পদ্দ)। র-ফলা অবশ্য লোপ হয় না—যেমন অপ্রিয় (অপ্‌প্রিয়)।

mayur বলবে। সুতরাং য়ুরোপ (Europe) কে ঘুরিয়ে ইউরোপ লেখার কোনই আবশ্যক নেই। Y-শব্দের সঙ্গে বাংলার কোন বিরোধ দূরে থাক্, এটা বাঙালীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ব'লেই ত মনে হয়। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে এ শব্দটা মীড়ের মত বাংলা গানের কথার কাঁটা খোঁচা মেরে দেবার কাজে লাগে। আমাদের সঙ্গীতে যেমন এক স্বর থেকে আর স্বরে মীড়ের টানে বেমালুম যাতায়াৎ করা হয়, বাংলা গানের কথা সুরে গাইতেও তেমনি, এক স্বরবর্ণের পিঠ-পিঠ অপর স্বর উচ্চারণ করতে হলে য়-মীড় দিয়ে আওয়াজটা নরম করে নেওয়া হয়। মা-আমার গাইতে মা-য়-আমার বেরিয়ে যায়; কে-আসে কে-য়-আসে হয়ে পড়ে।*

দেবনাগরী ব-র বা ইংরেজী w-র শব্দ (বাংলা অক্ষরে যা পেট-কাটা ব দিয়ে লেখা যেতে পারে) কম হলেও আছে। ফার্সী থেকে নেওয়া (newa) কথায় এ শব্দ বেশীর ভাগ পাওয়া (pawa) যায়—যেমন হাওয়া (hawa), খাওয়া (khawa)। ও আর য় মিলিয়ে w শব্দটাকে জবড়জং ক'রে না লিখে, ব দিয়ে লিখলেই ত বেশ পরিষ্কার হয়—যেমন মারবাড়ী, কাবুলিবালা। তবে বিনা আমাদের দেশে ভাল ব'লে স্বীকার আর কাজে করার মধ্যে অন্তরায়টা কিছু ভীষণ গোচের।

শ-বর্গ

মূর্দ্ধন্য ষ-শব্দ ণ-শব্দেরই মত বাংলা থেকে লোপ পেয়েছে। এখন ওটা বাঙালীর পক্ষে ইচ্ছে করলেও উচ্চারণ করা কঠিন।

---

* তা ছাড়া, য়-শব্দের যোলায়েম অমায়িকতার গুণে বাংলা ভাষায় "য়ে" কথাটা কি না করতে পারে? কড়া কথাকে মিঠে করা, মণীজের খাটনি বাঁচিয়ে জীভ-চালাবার সুখ ভোগের ব্যবস্থা করা, বক্তার যুক্তির অভাব শ্রোতাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করা, প্রভৃতি ওর অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নেই।

দন্ত্য-স (ইং s) শব্দটা বাংলায় এক পক্ষে কম বটে, কিন্তু অপর পক্ষে যেটুকু আছে তা নিজস্ব অক্ষর ছাড়িয়ে তালব্য শ ও মূর্দ্ধণ্য ষ এদেরও এলাকার অংশ জবর-দখল করেছে—যেমন শ্রী (sri), শ্রম (srom), ষ্ট্যাম্প (stamp), ষ্টেশন (station)। ইংরেজী কথা বাংলায় লিখতে যখন বানানটা ইচ্ছেমত করার বাধা নেই, তখন স্ট্যাম্প, স্টেশন লিখে s-শব্দটাকে ওর আসল দন্ত্য-স চিহ্ন দিতে আপত্তি কি? এ শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে ছ দিয়ে লেখা হয়—যেমন ছোলেনামা (solenama); কিন্তু ছোলে লিখলে কলকাতায় solay না প'ড়ে chholay পড়বে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, দন্ত্যস-র স্ব-শব্দ একেবারে উড়িয়ে দিলে বাংলা লিপিকে মিছিমিছি কানা ক'রে রাখা হয়।

দন্ত্যস-র জায়গাটুকু বাদ দিলে বাংলায় বাকি সব তালব্য শ-র রাজত্ব, তাই এর নামেই বর্গের নামকরণ করা গেল। সবিশেষ কথাটার তিন শ-র উচ্চারণে কোন তফাৎ নেই। এই তিন শ কথাটা শুন্‌লে মারাঠিভাষী হাস্‌বে, কারণ তার কাছে শ একটি মাত্র, অপর দুটার একটি sa, অন্যটি বাঙালীর অনুচ্চারণীয় মূর্দ্ধণ্য ষ,—হিন্দি ভাষায় খ দিয়ে যার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে (হিন্দি : মানুখ্ = মানুষ)।

চ় (ts) শব্দ মোলায়েম ভাবে ৎ ও স যোগের ফল। মারাঠি "চাংলা" কথাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই এর খাঁটি রূপ জেনেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের চাল, চিঁড়ে, প্রভৃতির উচ্চারণেও এই চ় (ts) পাওয়া যায়। কলকাতাই ভাষায় যে সকল সাধু কথার ছ মুখের কথার চ হয়—যেমন "চলিয়াছি" থেকে "চলেচি"—সেই চ-র উচ্চারণ চ় (ts) হয়, তবে মারাঠি ভাষার মত অতটা স্পষ্ট নয়—চলেচি = choletsi। ব্যঞ্জ

করেও সময় সময় চ-কে চ্‌-শব্দ দেওয়া হয়—যেমন চমৎকার (tsomot-kar) আর কি !

জ্‌ (z) শব্দ কলকাতাই উচ্চারণে চলিত নেই ব'লে হঠাৎ মনে হতে পারে, কিন্তু সাজতে (shazte), বুঝতে (buzte), মেজ্‌দা (mezda) নমুনাগুলি পেলে আর সন্দেহ থাকে না।

হ-বর্গ

প্রশ্বাসের নানা শব্দে হ বর্গের উৎপত্তি। অবাধে শ্বাস ছাড়লে শুদ্ধ হ জন্মায়। শ্বাস গলায় বাধা পেলে আর্বী ফার্সী ধরণের guttural খ্‌, এবং ঠোঁটে বাধা পেলে ঠোঁটের ভঙ্গী ভেদে ফ্‌ (f) ও ভ্‌ (v) শব্দের উৎপত্তি হয়।

বাংলায় খ্‌-র guttural (ঘড়্‌ঘড়ে) শব্দ শুনতে হলে চাঁটগাঁয় যেতে হয়। কলকাতাই উচ্চারণে এ শব্দ দৈবাৎ শোনা যায় মাত্র—যেমন বিরক্তির আঃ (আখ্‌)।

ফ্‌ (f) আওয়াজটা বাংলা কথার স্বাভাবিক ধ্বনির সঙ্গে তেমন মিশ খায় না। তবে ফার্সীর ছোঁয়াচে এটা বাংলায় ঢুকে রয়ে গেছে—যেমন সাফ্‌ (saf), তফাৎ (tafat)। কেও কেও ফুলে ফলেও এ শব্দ আন্‌তে চান (ful, fal) কিন্তু সে ফেশনের বে'কুফীকে তারিফ্‌ করা যায় না !

ভ্‌ (v) বাংলার একটী বিবাদী আওয়াজ। এর ন্যায্য ব্যবহার একমাত্র হ-য়ে ব-য়ের (হ্ব) উচ্চারণে পাওয়া যায়। মারাঠি ভাষায়ও সম্ভবত তাই ; কেননা মারাঠিতে Victoria-কে হ্বিক্টোরিয়া লেখে। বাঙালীর মুখে হ্ব যুক্তাক্ষরটি যথা লিখিতং তথা কথিতং হয় না।

কারও কারও মুখে ওটা ব-য়ে ভ-য়ের মত উচ্চারণ হয়—যেমন বিভ্‌ল (বিহ্বল)। কিন্তু আজকাল কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কায়দা হচ্ছে হ ও ব-র জায়গা অদল-বদল ক'রে হ-কে শেষে ফেলা, তারপর ব-কে ভ্‌ (v) উচ্চারণ করা। তবে সে ভ্‌ (v) উচ্চারণের মধ্যে একটু রকমারি আছে। যুক্তাক্ষরের বাংলা রীতি অনুসারে ঐ ভ্‌ (v) টার হ-র যোগে শাদা ভাবে দ্বিত্ব না হয়ে ওটা uv বা ov হয়ে যায়—যেমন, জিহ্বা= jiuvha, গহ্বর=gaovhar। সুনীতি বাবু আশঙ্কা করেন যে ভ্‌ (v) শব্দ সভ্য উচ্চারণকেও আক্রমণ করবার যোগাড়ে আছে। তা যদি হয় তবে আশা করি অবস্থা এখনও voyonkar হয়ে ওঠে নি—sovvo উচ্চারণের বর্ব্বরতা ভদ্রসমাজে voolay'ও চলবে না!*

বাংলার বিসর্গ বেশীর ভাগ হসন্ত হ মাত্র। সময় বিশেষে হ-বর্গের অপর হসন্ত বর্ণেরও কাজ করে—যেমন, উঃ (uf), আঃ (german ach!)। বাংলা কথার শেষে বিসর্গটার আওয়াজ লোপ পেয়েছে সুতরাং সেখানে ওর ফাঁকা চেহারা দেখিয়ে লাভ কি? বিদ্যাসাগরের আমলে শ্রেয়ঃ স্রোতঃ প্রভৃতি বিসর্গ দিয়ে বানান করা হত, এখন

---

* বাংলা ভাষায় v শব্দের অনধিকার চর্চ্চার মূল সম্বন্ধে আমার Theory এই—

ইংরেজ আমলের আগে এ শব্দ বাঙালীর মুখে আনাও দরকার হত না, জানাও ছিল না। কাজেই রাজভাষার v যখন দায়ে ঠেকে বার করবার চেষ্টা করতে হল, তখন প্রথম প্রথম বাংলা ভ দিয়েই তার কাজ চালিয়ে দিয়ে, Victoria কোনমৎ প্রকারে ভিক্টোরিয়া ব'লে উচ্চারিত হল। ক্রমে, ইংরেজী উচ্চারণ সড়গড় হতে, যখন মুখ দিয়ে খাঁটি v কাড়া সম্ভব হ'ল, তখন নতুন বিদ্যের আহ্লাদে দরকারে-বেদরকারে যেখানেই ভ দেখা, সেখানেই v বলার লোভ সামলান মুস্কিল হয়ে পড়ল। তাই বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইলের নাটকের বিজ্ঞাপনে Vramar! Vramar! ক'রে ক্ষেপিয়ে তোলে। রোগের উৎপত্তি ঠিক করতে পারলে চিকিৎসার বিলম্ব হবে না এই আশায় Theoryটি ব'লে রাখা গেল।

সাবালক ব্যাঙাচীর মত স্রোত বিনা ল্যাজে বেশ চলেছে। তবে আর কেন? আপাতত ক্রমশ প্রভৃতির বিসর্গগুলিকেও কালের স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়াই শ্রেয়।

স্বরবর্ণ

বাংলা শব্দের লিপি হিসেবে পণ্ডিতী ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণের গণ্ডগোল আরও বেশী। বর্ণপরিচয়ে আজকাল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই দশটি স্বরবর্ণ দেখান হয়। এ ফর্দ্দটি অসংযুক্ত স্বরে যুক্তস্বরে, কেজো অক্ষরে বাজে অক্ষরে, এবং তদুপরি আবশ্যক অক্ষরের অভাবে, একটি আলোনা খিচুড়ি বিশেষ।

যুক্তস্বরের মধ্যে শুধু ওই (ঐ), ওউ (ঔ) কেন; আই, উই এই আছে; আউ, ইউ, এউ আছে; আও, উও, এও আছে; একহারা স্বরগুলির উল্টে পাল্টে যত রকম permutation-combination হতে পারে প্রায় তত রকমই আছে। বাকিগুলির জন্যে যখন ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের দরকার হয় নি, তখন ঐ, ঔ, দুটিমাত্র রেখে বাংলা বর্ণমালা ভারী না করলেও চলত।

ঋ ঌ অক্ষর থাকলে কি হবে, বাংলার মধ্যে ওরকম স্বর-শব্দ কোথাও নেই। এ দুটির আওয়াজ র-য়ে ইকার (রি) ল-য়ে ইকার (লি) হয়ে রয়েছে। তার জন্যে আলাদা অক্ষর কেন? * এ দুটি স্বর-শব্দ আসলে কি (সংস্কৃত ভাষায় যা থাকায় স্বতন্ত্র অক্ষর

* বিকৃতি(bikriti)তে বিক্রিতি(bikkriti)তে ক-র দ্বিত্ব ঘটিত উচ্চারণের যে তফাৎ আছে, দুঃখের বিষয় সেটা পড়বার সময় কেও কেও মেনে চলেন না; যখন র-ফলার মত পূর্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন-শব্দের দ্বিত্ব ঘটাতে না পারায় ঋকারের যা একটু স্বত্ব বাংলারও রয়ে গেছে।

আবশ্যক হয়েছিল) তাই বা ক'জন বাঙালী খবর রাখে ? ঋ হচ্ছে র-র রম্ব অর্থাৎ জীভ কাঁপার মর্ম্মর রব। আর ঌ হচ্ছে ল-র লম্ব অর্থাৎ জীভের ধারে ধারে লালা-কল্লোল কলধ্বনি। ইংরেজী little কথার শেষে ঌ-র আওয়াজ পাওয়া যায়। ফরাসী chambre (উচ্চারণ শাঁব্র্) কথার শেষে ঋ। সংস্কৃত আমলে লিট্ঌ ও শাঁব্ঋ লিখ্‌লে এই ইংরেজী ও ফরাসী কথা দুটি ঠিকমত উচ্চারণ হতে পারত, কিন্তু ও ভাবে বানান করলে বাঙালীর দ্বারা তা হবে না।* মোট কথা বাংলার চলিত কোন স্বর শব্দ লিখতে ঋ বা ঌ অক্ষরের কোন প্রয়োজন হয় না।

বাংলার অ সংস্কৃত অ-র মত, হ্রস্ব আ (আ) নয়। আমাদের অ একেবারে আলাদা স্বরশব্দের চিহ্ন যার আওয়াজ ইংরেজী aw দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

ইকার ও উকারের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে তেমনি বাংলার অপর সকল স্বরশব্দেরই হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, কিন্তু সে সবের জন্যে স্বতন্ত্র অক্ষরের অভাবেও কাজ বেশ চ'লে যাচ্ছে। তাতে বোঝা যায় যে দীর্ঘ ঈ ও ঊ অক্ষর বাহুল্য। এমন কি, ইকার উকারের আলাদা হ্রস্ব দীর্ঘ চিহ্ন না থাক্‌লেই ভাল হত, কারণ বাংলার বানান্ চলে একদিকে উচ্চারণ বলে অপর দিকে, তাতে ক'রে বাংলা ছাত্রের মাথা খারাপ করা ছাড়া এই ফাজিল চিহ্নগুলি আর কোন কাজে লাগে না।

* দাক্ষিণাত্যে ঋ, ঌ-কে বাংলা হিন্দির মত রি, লি উচ্চারণ না ক'রে, রু, লু বলে। দাক্ষিণাত্যের বেশীর ভাগ সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলার চেয়ে বিশুদ্ধ ব'লে বাঙালীরা অনেক সময় মনে করেন যে এই রু, লু-ই বুঝি খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ। কিন্তু উপরে দেখান গেছে যে তা নয়। সুনীতি বাবু দেখেছেন যে কোন প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ঌ-র আসল উচ্চারণ বজায় রাখা হয় নি।

আমরা লিখি তিন, বলি তীন (ইকারের হ্রস্বত্ব ইং tin শব্দে খাঁটি পাওয়া যায়) ; লিখি সতী, বলি সতি ; লিখি কুল, বলি কূল (হ্রস্ব উকার কাকে বলে তা হিন্দী কুল্ শব্দে পরিষ্কার শোনা যায়) ; লিখি মুহূর্ত্ত, বলি মুহুর্ত্ত।

যাহোক্, যত রকম স্বরশব্দ আছে, আর এক এক স্বরের যত রকমের মাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি) পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত সমেত তার ফর্দ্দ ধ'রে দিলেই আসল অবস্থাটা ত বোঝা যাবে। তবে, কোন কালে সংস্কৃত বর্ণমালার হাতথেকে রেহাই পেয়ে, বাংলার অবস্থার মত ব্যবস্থা হয়ে উঠ্‌বে কি না তা' কে বল্‌তে পারে ?

যে স্বর-শব্দমালা নীচে সাজিয়ে দেওয়া যাচ্ছে সেটা পড়বার সময় মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য দুরকমে হয়—১। টানে ২। ঝোঁকে। যেমন বাক্য কথাটার আকার ঝোঁকে দীর্ঘ, বাক্ কথাটার আকার টানে দীর্ঘ। রাধার রা ঝোঁকে দীর্ঘ, রাধার ধা ঝোঁক টান দুয়েরই অভাবে হ্রস্ব। ইং hat, mat, cat সবই হ্রস্ব ; এক (অ্যাক) টানে দীর্ঘ ; act ঝোঁকে দীর্ঘ।

হ্রস্ব—ইং doll (ডল্), কত, কথা, অকপট।

অ দীর্ঘ—ইং ball (বল্), ছল, দল।

চাপা—ইং cut (কট্), বস্, আপনি, আমরা।

লুপ্ত অকারের চিহ্নটা সংস্কৃত কথা অবিকল লিখতে ছাড়া বাংলায় কোন কাজে আসে না।

হ্রস্ব—আমি, রোগা, রাধার ধা।

আ দীর্ঘ—রাধার রা, গাছ, বাড়ী।

ই
হ্রস্ব—চিঠি, পাই, সতী, চাষী।
দীর্ঘ—তিন, দীন, বীর, স্থবির।
অস্ফুট—পূর্ব্ববঙ্গের কাইল (কালি), বাইক (বাক্য) প্রভৃতি।
কলকাতাই উচ্চারণে এই ই-শব্দটা অস্ফুট ভাবেও নেই, অর্থাৎ অস্ফুট ই-টা লোপ পেয়েছে।*

উ
হ্রস্ব—সাধু, তূলা, ধূলা।
দীর্ঘ—চুল, কুল, কূপ, রূপ।

ও
হ্রস্ব—লোহা, বোঝা, গতি (গোতি) মন্দ (মোন্দো)।
দীর্ঘ—রোগ, শোক, শ্রম (srom) যম (জোম)।

এ
হ্রস্ব—একটু, বেদানা, সময়ে, ব্যক্তি (বেক্তি)।
দীর্ঘ—বেদ, উদ্দেশ, ক্লেশ।

অ্যা
হ্রস্ব—ব্যস্ত (ব্যাস্ত) ত্যজ্য (ত্যাজ্য), সমস্যা।
দীর্ঘ—এক (অ্যাক), ত্যাগ, ব্যাকুল।

হ্রস্ব-দীর্ঘের আলাদা চিহ্ন দরকার নেই তা ত দেখা গেল। কিন্তু বাহুল্য নিয়ে যদিবা চালান যায়, তবু অভাব নিয়ে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলে না। বাংলা এখন আর কুনো অবস্থায় নেই—বিদেশী কথা

* কলকাতাই উচ্চারণে সাধু ভাষায় ই যেখানে যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে কিন্তু সে তার প্রভাব রেখে গেছে। অন্যান্য গুণের মধ্যে ইকার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ ওকারের মত ক'রে দেয়। আমরা সাধু "করিয়া" স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের মত "কইর‍্যা" বলি নে বটে, কিন্তু "কোরে" বলি। মুখের ভাষা লিখতে হলে সমাপিকা করে (kawre) ও অসমাপিকা করে (kore) এ দুইয়ের প্রভেদ বাঁচিয়ে বানান করা উচিত, নইলে পাঠকের পড়তে গোল লাগবে। কেও কেও ক-য়ে ওকার দিয়ে অসমাপিকা "কোরে" লেখবার পক্ষপাতী, কিন্তু তার চেয়ে লুপ্ত ইকারের চিহ্ন দিয়ে "ক'রে" লেখা ভাল, এ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের সঙ্গে মতের মিল হবে, কারণ তাহলে বানানের মধ্যে উৎপত্তির ইতিহাসটুকু থেকে যায়।

নিয়ে কারবার করতে হচ্ছে, বিদেশীর কাছে নিজেকে জাহির করতে হচ্ছে, কাজেই একছুটে থাকলে আর ভাল দেখায় না। মারাঠিতে খোলা অ (all), চাপা অ (us) ও অ্যা শব্দের অক্ষর ছিল না। তারা অকারে চিহ্ন দিয়ে চাপা অ, আকারে চিহ্ন দিয়ে খোলা অ, একারে চিহ্ন দিয়ে অ্যা, ক'রে নিয়েছে—যেমন অাঁল (all), অঁস্ (us) আমি বলি •মাথায় • দিয়ে চাপা অ, আর মাথায় ✓ দিয়ে খোলা এ (অ্যা) বাংলায় বেশ চিহ্নিত হতে পারে। যেমন cut=কঁট্, cat=কেঁট। এ ছাড়া আবশ্যক মত য়ুরোপীয় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাধারণ চিহ্ন ব্যবহার করলে আর বাংলার স্বরলিপিকে কোন শব্দ লিখনে পিছপাও থাকতে হয় না। ওদিকে ত ব্যঞ্জন লিপিতে ব-র পেট কেটে, আর জ, ফ, ভ-তে বিন্দু দিয়ে, সকল চলিত ব্যঞ্জন-শব্দের অক্ষর পূরণ ক'রে নেওয়া গেছে।

চিহ্নের কথা বলতে মনে হ'ল যে বাংলা হাতের লেখা থেকে ছাপার অক্ষর তৈরী সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ভাল ক'রে মাথা খাটান হয় নি। চীনে ভাষার কম্পোজিটারদের মত ঘরের এক পাশ থেকে আর এক পাশ দৌড়-দৌড়ীর আবশ্যক না হলেও অক্ষর ও চিহ্নের বাহুল্যের কারণে বাংলা ছাপাখানার অনেক অনর্থক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। রেল-গাড়ি মোটর-গাড়ি সবই প্রথম প্রথম ঘোড়া গাড়ির গড়নে তৈরী হয়েছিল, ক্রমে স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুসারে তাদের চেহারা বদ্‌লে এসেছে। বাংলার ছাপার অক্ষরেরও এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করবার সময় হয়েছে। কিন্তু এ আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'পঙ্ক'।

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।"

চৈত্র মাস। প্রচণ্ড রোদ। তমালতালীর কাঁধে কাঁধে কোমলাঙ্গী লতিকারা সব শুকিয়ে উঠেছে। কাকেরা পর্য্যন্ত ডাক্‌ছে না। তারা সব নিবিড় বনে নিবিড়তম ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মার্ত্তণ্ডদেব যেন সহস্রমুখ হয়ে চারিদিকে আগুণ ঢেলে দিচ্ছেন। রাজার পথে পশ্চিমে হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ছে সাংঘাতিক। 'কিন্তু সে হাওয়া সে ধূলি অচলায়তনের দেয়াল পর্য্যন্ত এসে থেমে যাচ্ছে। তাদের প্রবেশ এখানে নেই। বাহিরের সুখ বাহিরের দুঃখ, বাহিরের হাসি বাহিরের অশ্রু—বাহিরের আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস আনন্দ—সে-সবের প্রবেশ এখানে জন্ম-জন্মান্তর থেকে নিষিদ্ধ। এখানে সে হচ্ছে অচলায়তন। যেখানে হাজার হাজার বছরের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা নিয়মে বাঁধা জীবনের ভিতর দিয়ে পাকা মানুষ তৈরী হ'য়ে উঠছে। এখানে একটু কারও ভুল করবার আশঙ্কা নেই—একটু কারও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে মানুষের সুপ্তির স্থান—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

রাজার পথে মত্ত হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ুক—কিন্তু এখানকার গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ছে না। কি জানি যদি সে নড়াতে একটু

কিছু ঘুলিয়ে যায়। কি জানি যদি সে নড়া দেখে কারও মনে প্রশ্ন ওঠে যে গাছের পাতাগুলো নড়ে কোন্ নিয়মে। আর সেটার উত্তর বের কর্‌তে গেলে হয়ত অচলায়তনের প্রাচীরগুলো পর্য্যন্ত পাগল হ'য়ে একদিন উঠে হাঁট্‌তে লেগে যাবে। তাই এখানের গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। এখানকার পাখীগুলো পর্য্যন্ত ডাকে শাস্ত্রানুসারে—তাদের ডাক বনের পাখীর ডাকের মত তেমন অকেজো একেবারেই নয়। তাদের প্রত্যেক ডাকের একটা ভীষণ রকম মর্ম্ম আছে। কোনটায় বা দিনশুদ্ধি হচ্ছে—কোনটায় বা রাত্রিশঙ্কা হরণ করছে—কোনটায় পিশাচ-ভয়ভঞ্জন ঘট্‌ছে—কোনটায় বা সর্পভয়নিস্তারণ আস্‌ছে। চারিদিকে সাংঘাতিক শান্তি নিদ্রার চাইতেও আবেশময়—মৃত্যুর চাইতেও মৌন—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির।

সেই চৈত্রমাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করে' অচলায়তনে যে যার যার মতো আপন আপন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে—সেই বিরাট শান্তি উপভোগ করবার জন্যে। কিন্তু বেচারা পঞ্চকের আর শান্তি নেই। তার উপর আজ কড়াক্কড় হুকুম হয়েছে যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাকে অজতন্ত্র থেকে শৃঙ্গীশাপ মোচনের স্বস্ত্যয়নটা মুখস্ত কর্‌তেই হবে। নইলে তার জলস্পর্শ নিষিদ্ধ। পঞ্চক বৃহৎ অজতন্ত্রখানা কোন রকমে টেনে তার আপনার কক্ষে এনে শৃঙ্গীশাপ-মোচনটা বার বার করে' আবৃত্তি কর্‌ছিল আর পূর্ব্বজন্মে তার মাথার ওপরে দুটো শৃঙ্গ থাকার কতটা সম্ভাবনা ছিল এবং পরজন্মে তার মাথায় শৃঙ্গ গজাবার কতটা সম্ভাবনা জমা হয়ে উঠছে তাই এক এক বার ভাবছিল। পঞ্চক যত বেশী করে' তার মন সেখানে লাগাতে

যাচ্ছিল অজতন্ত্রখানা যেন তত বেশী দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছিল। যত বেশীবার সে পড়ছিল তত বেশী তার মন লাগছিল না। এই রকম যখন পঞ্চকের সঙ্গে আর অজতন্ত্রের সঙ্গে একটা বিরাট সংগ্রাম চল্‌ছিল তখন কোথা থেকে কোন্ পথ দিয়ে কোন রন্ধ্র খুঁজে হঠাৎ—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে,—

পঞ্চকের হৃদয়টা যেন চক্ষের পলকে মুখের মধ্যে লাফিয়ে এলো—তার মর্ম্মতলের কোথায় কোন্ নিভৃতে একটী বহুদিনের ভুলে-যাওয়া মর্‌চে-ধরা তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—অজতন্ত্রের অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সারের মতো যেন ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল—প্রকাণ্ড পুঁথি-খানা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—পঞ্চক তার কান মন প্রাণ—তার সমস্ত অস্তিত্বটা দিয়ে শুন্‌লে সেই ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনঃ—

আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে

ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে যায়! এই সহস্র সহস্র বৎসর খাড়া হয়ে আছে যে অচলায়তন—যেখানে ভাবনা নেই চিন্তা নেই—আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই—দুঃখ নেই সুখ নেই—যেখানে আছে শুধু অভ্যাস আর সোয়াস্তি—যেখানে আছে শুধু শান্তি আর সংযম—সেখানে ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু এসে কার কথা শুনিয়ে যায়। ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে গেল। হায় পঞ্চক!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! কোন্ শক্তি তার ক্ষুদ্র দুটী পাখাতে জড়িয়ে সে এ জগতে এসেছে! কোন শক্তি? তার সে-শক্তিতে যে আজ অচলায়তনের চব্বিশ হাত উঁচু সাত হাত পুরু দেয়াল কেঁপে উঠ্‌ল—তার সে গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনে যে বড় বড় সমাসের ঢাকের বাদ্য, বড় বড় অলঙ্কারের করতালের ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি সব বেখাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! তার আলাপে যে আজ শাস্ত্রের নিষেধ-গুলোকে প্রলাপের মতো মনে হচ্ছে! আজ যে ঐ রত্তিটুকু ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে বেরিয়ে পড়বার জন্যে অন্তর-দেবতার আসন থেকে তাগিদ্ আস্‌ছে—ঐ গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে—দীপ্ত আকাশের তলে তলে—মুক্ত বাতাসের সুরে সুরে—বুঝি—বুঝি—সেই কথা আমাকে শুনিয়ে যায়—হায় আজ

কেমনে রহি ঘরে
মন যে কেমন করে
কেমনে কাটে গো দিন দিন গুণিয়ে।

না, দিন আর কাটে না। পঞ্চকের দিন আর কাট্‌বে না এখানে—এই অচলায়তনে। কোন্ মায়া বিস্তার করে' আজ ক্ষুদ্র পতঙ্গ পঞ্চকের রুদ্ধ অন্তরের দ্বার খুলে সেখানে কার আহ্বান, কার সংবাদ রেখে গেল। ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চকের হৃদয়-বীণার কোন্ পরদার কোন্ তারটী সৃষ্টির আদি থেকে বাঁধা ছিল যে আজ তার গুঞ্জন পঞ্চকের কান দিয়ে পশে' সেই তারটায় আঘাত কর্‌লে—সে-তার যে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—পঞ্চককে পাগল করে' দিয়ে গেল। সে-সুরের স্পর্শে কোন্ পুরুষ জেগে উঠ্‌ল পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে—কোন পুরুষ—যে এতদিন কোন কথা কয় নি, কোন সাড়া দেয় নি—পঞ্চাশ হাজার বছর সে এমনি করে' লুকিয়ে ছিল। কে জান্‌ত যে এমন কেউ আছে পঞ্চকের অন্তরে যে এই অচলায়তনের দেড় হাত জায়গায় আঁট্‌বে না। যদি জান্‌ত তবে বুঝি ঐ অচলায়তনের বিরাট প্রাচীর অমন সগর্ব্বে আকাশে মাথা

উঁচু করে' দাঁড়াতেই পার্‌ত না। যখন একবার দাঁড়িয়েছে—যখন পঞ্চকের অন্তরে সেই বিরাট পুরুষ জেগেছে তখন সেই প্রাচীরের উদ্ধত মস্তক নীচু কর্‌তেই হবে—নইলে যে পাথরগুলো দিয়ে ও প্রাচীর তৈরী হয়েছে, সে পাথরগুলোকে তুচ্ছ বালিরাশির মতো ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে' ধসে' পড়তে হবে—অন্য উপায় নেই। ঐ প্রাচীর খাড়া করে' রাখ্‌তে হ'লে পঞ্চককে মর্‌তে হবে। পঞ্চক মর্‌বে! অসম্ভব—পঞ্চকের মর্‌বার উপায় নেই—পঞ্চককে যে বাঁচতেই হবে।

পঞ্চককে বাঁচতেই হবে—ভগবানের আদেশ। ভগবানের আদেশেরও উপরে যারা আদেশ চালাতে চাইবে তাদের এই বিশ্ব-মানবের মহা মেলায় অপমান হবে পদে পদে, পলে পলে। যারা পঞ্চককে ঘিরে রাখতে চাইবে তারা ভগবানকেই বন্দী কর্‌বে—আর ভগবানকে বন্দী কর্‌লে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মানুষের অকল্যাণ ও অমঙ্গল হবে—আর তার পরিমাণ হবে হিমাদ্রির চাইতেও উঁচু, সিন্ধুর চাইতেও গভীর।

সমস্ত জগৎ জুড়ে যে আনন্দের সুর নিশিদিন বাজ্‌ছে সেই আনন্দের সুর যারা কান পেতে হৃদয়ের তলে তলে শুন্‌তে পায় নি—যে আনন্দের আলোক সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে আছে সে-আলোক যারা মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে আঁখি মেলে দেখতে চায় নি তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে আপনার চারপাশে গণ্ডি টেনে দিয়ে এ জগতকে দেখা দুঃখময় করে', অমঙ্গলময় করে', অশুচি করে' অপবিত্র করে'—তাদের পক্ষেই মানা সম্ভব হয়েছে এ জগতটা সয়তানের সৃষ্টি—এ জগৎ সয়তানের ইশারায় চল্‌ছে। কোথায় গো তোমার ভগবান যদি তিনি ঐ মুক্ত উদার নীল আকাশের মাঝে নেই—যদি তিনি ঐ বর্ষার কালো

মেঘের ঝিলিক্-হানা গুর্ গুর্ ডাকের মধ্যে নেই—যদি তিনি প্রথম আষাঢ়ের ঝর্ ঝর্ ধারায় ভেজা চষা-মাটির গন্ধে নেই—ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমর-টুকুর পক্ষগুঞ্জনে নেই—মানুষের হৃদয়তলের মুক্তির সঙ্গীতে নেই। কোথায় আছেন তিনি—কোথায় তাঁকে বন্দী করে' ক্ষুদ্র করে' অক্ষম করে' লুকিয়ে রেখেছ? কোথায় তাকে অশুচি করে' ভীত শঙ্কিত করে', মিথ্যা করে', অপমানিত করে', অপরাধের সীমা বাড়াচ্ছ? হায়! অচলায়তনের কারও চোখে পড়ে নি যে ভগবানকে বাঁধতে গিয়ে তারা নিজেরাই বাঁধা পড়েছে—ভগবান যেমন তেমনি আছেন—তাঁর সৃষ্টি যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌ছে।

পঞ্চকের আর এ অচলায়তনে থাকা চল্‌বে না—কিছুতেই না। আজ যে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরটুকুর মৃদু-গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত জগতের আনন্দের প্রতিনিধি হ'য়ে এসে পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে আগুন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। ওগো—জাগো—জাগো—শতাব্দী শতাব্দী ধরে' নিজের চারদিক অন্ধকারে জড়িয়ে যে আলোকের সন্ধান করছিলে প্রাণে আনন্দ নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সে-আলোক ঐ মুক্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে—সে আলোক বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলেছে—সে আলো প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে নাচছে—সে-আলো হৃদয়-বীণার সুরে সুরে বাজছে—ঐ যে সে "আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি"—ঐ যে সে "আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল মেতে মল্লিকা মালতী"—সে আলোক মানুষের কর্ম্মে আশায় আকাঙ্ক্ষায় প্রেমে ভক্তিতে প্রীতিতে শ্রদ্ধায় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আছে। না, পঞ্চকের আর এখানে থাকা চল্‌বে না। পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে যে আজ সেই আনন্দ-আলোকের স্রোত ছুটেছে—সে-স্রোতে যে সব

ভেসে গেল—যত অপমান অপরাধ, শতাব্দীর বন্ধন—শত সহস্র স্রোতের ভারী ভারী শৃঙ্খল আজ সব তুচ্ছ তৃণের মত পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল—পঞ্চককে আজ কে ধরে' রাখবে—কার সাধ্য—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।

ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।

বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

ছুট্‌বে—আজ পঞ্চক ছুট্‌বে—ছুট্‌বে আজ সে চন্দ্র গ্রহ তারায় আপনার প্রাণের সঙ্গীত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে—ছুট্‌বে আজ সে এই বিস্তৃত পৃথিবীর বক্ষে মরু গিরি কান্তারে, নগর নগরী পল্লীতে আপনার চরণ-চিহ্ন এঁকে এঁকে—ছুট্‌বে আজ সে ঐ প্রভঞ্জন-পাগলি

সফেন-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ অশান্ত সিন্ধুর বক্ষ দলিত মথিত করে'! ছুটবে আজ সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার ভিতর দিয়ে দিয়ে—অগ্নি জল বায়ুর মধ্য দিয়ে দিয়ে—ঐ বিশ্বমানবের মহা কোলাহলের, মহা সংগ্রামের মাঝ দিয়ে দিয়ে আপনার প্রাণের আনন্দের আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে—তাতে যদি পঞ্চকের অপঘাত মৃত্যুও হয় ক্ষতি নেই--অন্ততঃ তাতে কিছু সার্থকতা আছে। অচলায়তনে ঐ শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মরার চাইতে সে-মৃত্যু অনেক গুণে শ্রেয় ও প্রেয়।

(২)

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।"

ঐ যে শোণপাংশু-পল্লীর বুক চিরে টিয়ে পাখীর চাইতেও সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে মাটীর পথটা বহুদূর চলে গিয়ে কুয়াশার মত গাছ পালার ভিতরে লুকিয়ে গেছে—সে-পথ গেছে কোন্‌খানে—তা কে জানে? ঐ পথটা বেয়ে বেয়ে সৃষ্টির আদি থেকে কত নর নারী কত দেশ জাতি কত গান কত সুর—কত হাসি কত অশ্রু আপনার আপনার গান গেয়ে গেয়ে চলে গেছে—কোথায়? তা কে জানে তা কে জানে! কোন্ পাহাড়ের পারে নিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ঐ পথ—কোন্ সাগরের ধারে নিয়ে গেছে তাদের ঐ রাস্তা—এ পথ বেয়ে কোন্ দুরাশার সন্ধানে তারা যাত্রা করেছিল—তাদের অশ্রু শেষ হয়েছিল কোথায়—তা কে জানে? বুঝি কেউ জানে না।

তা না জানুক্ তবুও ঐ পথ বেয়েই চল্‌তে হবে। এই চলাতেই যে আনন্দ। যারা প্রত্যেক পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আপনার লাভ ক্ষতির হিসেব করে' করে' চলে তারা মানুষের অন্তরের জীবন-দেবতার আনন্দ-মন্ত্রের সংবাদ পায় নি—বুঝি কোন দিন পাবেও না। এ সৃষ্টিটা যে সমস্ত অহৈতুক—এখানকার লাভটাই যে খুব লাভ নয়, ক্ষতিটাই যে খুব ক্ষতি নয়—তা তারা বুঝবে না কোন দিন। ঐ যে আনন্দ-মন্ত্র—যে মন্ত্রে উষার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে লক্ষ ফুল গাল-ভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—তারা কি খোঁজ করে এতে তাদের লাভ কি? তারা যে না ফুটে পারে না—সৌরভ না ছড়িয়ে যে তারা বাঁচে না। সেটাই যে তাদের সত্য। ফোটাতেই তাদের সার্থকতা—সৌরভ ছড়ানতেই তাদের গৌরব। যখন মানুষ ঐ আনন্দ-মন্ত্রে সঞ্জিবীত হ'য়ে উঠ্‌বে—ঐ আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হবে তখন "এ পথ গেছে কোন্‌খানে" এ প্রশ্ন মনে জাগ্‌লেও কোন সন্দেহ, কোন শঙ্কা তার প্রাণে বাজ্‌বে না। সে যে তখন থেমে থাক্‌তে পারবেই না। তার চলাতেই যে তখন আনন্দ। প্রত্যেক পাদক্ষেপে যে তখন তার সুর বেজে উঠ্‌বে। প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন থেকে তার তখন সৌন্দর্য্য ঝরে পড়্‌বে। সে তখন বুঝ্‌বে যে সমস্তের সার্থকতা তার আপনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সে যে—

"খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাস্‌বারই আনন্দে রে!

সে যে—

"জ্বালিয়ে আগুণ ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দ রে!"

সে যে—

"ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।"

সে যে—

"লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।"

এ কবি-কল্পনাও নয়—পাগলের প্রলাপও নয়। এ ভগবানের সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় সত্যটুকু। তাই পঞ্চক চল্‌বে—ঐ পথ ধরেই সে চল্‌বে—এই চলাই যে তার সত্য—এই চলাতেই রয়েছে তার অমৃত।

(৩)

আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করে' বসে' আছি কবে ভগবানের ইঙ্গিতে বাঙ্গালার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঞ্চকের জন্ম হবে। কবে পঞ্চকের প্রাণের অদম্য বেগের মুখে যত আলস্য যত জড়তা সব ভেসে যাবে—যত জীর্ণতা যত মিথ্যা সব খসে যাবে—যত শঙ্কা যত অধর্ম্ম সব চক্ষের পলকে অদৃশ্য হবে। সে দিন "সনাতন জড়তার" দেয়াল ভেঙে সত্যের পথ মুক্ত হবে। সত্য যে দিন আপনার পথ পাবে—যে দিন আমরা আর সত্যকে ঠেলে রাখ্‌ব না—দাবিয়ে রাখ্‌ব না সেই দিন এই বাঙ্গালার মরা গাঙে বান আস্‌বে—বাঙ্গালীর মরা প্রাণে স্রোত খুল্‌বে। মানুষ যখন সত্য হয়ে উঠ্‌বে তখন সুন্দর ও মঙ্গল তার কাছ থেকে কিছুতেই দূরে থাক্‌তে পারবে না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৌষ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

পাত্র ও পাত্রী।

ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে—কাঁচাঘুমে চমক্ লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আস্‌তে চায় না—আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন আমি কৌমার্য্যের লাস্‌ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এণ্টেন্স পরীক্ষায় বয়স বিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক্ আর অখাদ্যই হোক্, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখ্‌লেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশী এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড় ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐ রকম কোনো একটা জায়গায়। গোড়াতেই বলে' রাখা ভাল, দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাক্‌বে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশী তাঁদের ঠক্‌তে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কি-একটা ব্রত, দক্ষিণা এবং ভোজন ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এই রকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিত মশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দান দক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্ম্মটা এই—আমার ত কলকাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি একটি শিশুবধু মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ করে যত্ন করে তাঁর দিন কাট্‌তে পারে। পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ সে শিশুও বটে সুশীলাও বটে—আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায় মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্ত্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিত মশায় বল্লেন, তাঁর "পরিবার" কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি

হল না; কেননা রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বল্লেন, মেয়েটি সুলক্ষণা, অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠ্‌ল। যে-পণ্ডিত মশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেচি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মত হঠাৎ সুবন্ত প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বল্লেন, "সনু, পণ্ডিত মশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেচে, খেয়ে দেখ্।" মা জান্‌তেন আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেচে, কিন্তু মনে আছে রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া—আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট; সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়চে রং শাম্‌লা, ভুরু জোড়া খুব ঘন, এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মত, বিনা সঙ্কোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েচে। আর যাই হোক্ তাকে দেখ্‌তে নেহাৎ ভালমানুষের মত।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠ্‌ল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙ্‌তা-জড়ানো-বেণীওয়ালা জ্যাকেট্‌-মোড়া সামগ্রীটি ষোল আনা আমার,—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয় কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্চেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আস্‌চি, স্ত্রী বল্‌তে কি বোঝায় তা আমার ঐ-সূত্রে জানা ছিল। দেখেচি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রী ব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালবাস্‌তেন তা জানি কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন কিসে তাঁর বিরক্তি হবে এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ, কিন্তু মানুষের না কি ওটা অবৈধ পাওনা এই জন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সে দিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠ্‌ল। সে দিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম—এমন কি, সগর্ব্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখ্‌লুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণ কালটা অনুশোচনায় গেল।

সে দিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্‌ শ্রেণীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জান্‌তে পেরেছিল। তার পরে যখনি তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা

পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড় মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে বা কোনো-একটা-কিছু করে সেটা বড় অপূর্ব্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ একমুহূর্ত্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ করে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগ্‌ল। বাবা যে রকম মাকে কর্ত্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল করে তুলেচেন, আমিও মনে মনে তারি ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগ্‌লুম। বাবার অভিপ্রেত কোনো একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে রকম সাবধানে নানা প্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখ্‌লুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্কনোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্য্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে বসে তার খাওয়াই হল না এবং জান্‌লার ধারে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুচচে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বল্‌তে পারি নে। ছোট ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশী সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড় চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-

চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠ্‌ল তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখচি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রকম ঘটনাই পূর্ব্বে একদিন ঘটেছিল—এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই,—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়চি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বল্লুম, "দেখ, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে সেইটে নিয়ে এসত।" কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বল্লুম, "আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।" এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আন্‌লে—সেটা আমি ধপাস্‌ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌ল। আমি গিয়ে দেখ্‌লুম তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বল্লুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগ্‌ল এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেচে এই অপরাধ কিছুতেই ভুল্‌তে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করচেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এদিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা একমুহূর্ত্তে

কর্ত্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময়ে ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারী রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ বলে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চল্‌চে, একথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন কি বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেচেন। শুভকর্ম্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েচে। বাবার আদালতের উকীলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এণ্ট্রেন্সস্কুলের সেক্রেটারী বীরেশ্বর বাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেচে। সেক্রেটারি বাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েচেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েচেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেচে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুন্‌তে পেলেন। তারপরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাঁড়ির সকলের

ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্‌মিস্‌ এবং প্রচণ্ডতেজে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙ্‌তা-জড়ানো বেণীসহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্দ্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্ব্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্ব্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মত চুপ্‌সে গেল—আকাশে আকাশে হাওয়ার উপরে তার লাফাল্যাফি একেবারে বন্ধ হল।

(২)

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেচে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিনে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্ব্বেই আমি পূরা দমে এম্‌ এ, পরীক্ষা পাস করে চোখে চষমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা' দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেচি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো একটা জায়গায়। এতদিন ত শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল এবার অর্থসাগর মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড় বড় পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর সব চেয়ে বড় সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন্‌ নিয়ে বিলেতে, যিনি আরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদ্‌লি হয়েছেন, আর যিনি বাংলা দেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায়

আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিলনা, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন এবং পেন্‌সন থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মত চল্‌ত। এখন দিন খারাপ তাই বাবা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ভাব্‌ছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিসে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড় দিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমরা অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য ডেপুটির এম্‌-এ পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব "প্রাংশুলভ্য ফল"। এইজন্যে কন্‌ট্রাক্টর বাবু আমার প্রতি "উদ্বাহু" হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধূলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েচি—অন্তত সে বাহু ডেপুটি বাবুর হৃদয় পর্য্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু আমার হৃদয়টা তখন আরো অনেক উপরে ছিল।

কারণ আমার বয়স তখন কুড়ি পেরয়-পেরয়, তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয় তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারদিকেই সঙ্কুচিত, মনন-সাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে

ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোট মাপে কৃশ করে আনা এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই, সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝঙ্কার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে এমন দুগ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে' বিদ্রূপ করে, কলেজ থেকে টাট্‌কা বেরিয়ে আমি সেই রকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সাম্‌নে এসে পড়লুম। বাবা বল্লেন "শুভস্য শীঘ্রং।" আমি চুপ করে রইলুম, মনে মনে ভাবলুম একটু দেখে শুনে বুঝে পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম—কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মত ছোট এবং সুন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েচে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট করে' তার ভুরুটি এঁকে তাকে হাতে করে গড়ে তুলেচে। সে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসল-

মান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড় চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালং বাসন-কোসনকে শোধন এবং মার্জ্জন করা। তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্ব্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেচেন যে তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সঙ্গত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভাল কাপড় পরে না পাছে সক্‌ড়ি হয়, সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেচে। সে যেমন পাল্কীর ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারো মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেশী শ্রদ্ধা যে আর কারো থাক্‌বে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বল্লুম, "মা, এ মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই"—তিনি হেসে বল্লেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!" আমি বল্লুম, "তাহলে আম বিদায় নিই!" মা বল্লেন, "সে কি সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে ত দেখতে ভাল।" আমি বল্লুম, "মা, স্ত্রী ত কেবল চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই!" মা বল্লেন, "শোন একবার! এরি মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কি পেলি!" আমি বল্লুম, "বুদ্ধি থাক্‌লে মানুষ দিনরাত এই সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়!"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েচেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাক্‌তে পারে। বস্তুত বাবা যদি অত্যন্ত বেশী রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তাহলে হয় ত কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাক্‌ত তাহলে তিনি সময় নিয়ে অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত করে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলি তর্জ্জন গর্জ্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বল্লুম—"ছেলে-বেলা থেকে খেতে শুতে চল্‌তে ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভর উপদেশ দিয়েচেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চল্‌বে না?" কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেচে এ আমি দেখি নি। সঙ্গত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মত কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেচেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েচেন বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে পণ্ডিত-মশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয় পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল—তাহলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্ম যে ঢের ভাল,

তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌মটাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেচি কিন্তু মনকে ত চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, এ সব যদি আপনি মানেন তবে পাল্‌বার বেলায় মুর্‌গি পালেন কেন? আরো একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্ব্বণ বিধিনিষেধ দান দক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেচেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে', অবলা জাতি স্বভাবতই অবুঝ বলে', মাথা হেঁট করে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েচেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সঙ্গতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়-শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে,—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে' তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা ত থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পাকেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বল্লেন,

"যাও তুমি আত্মনির্ভর করগে!" আমি প্রণাম করে বল্লুম, "যে আজ্ঞে!" মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে মানি-অর্ডরের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চল্‌তে গেল। তারই জোরে ব্যবসা সুরু করে ছিলুম। ঠিক উনআশি, টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাট্‌চে তা ঈর্ষা-কাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগ্‌ল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বল্লুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিষ্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটারের জিরো-পয়েণ্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয় লাঞ্চ্ খেয়েচি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্ খেলেচি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাষ্ মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্ত্তা শুনেচি। আমার মুস্কিল এই যে, র‍্যাসেলস্, ডেজার্টেড্ ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ ষ্টীল্ পড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েচি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরতেই

চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়জোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা করতে পারি কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলা ভাষার যে রকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমী সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠক্‌তে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক্, এই সব বিলিতি গিল্টি করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে-মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুল্‌ল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়-বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গ গুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্চে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত এরাও তেম্‌নি এক্‌সেণ্টের একটু খুঁৎ কিম্বা কাঁটা চাম্‌চের অল্প বিপর্য্যয় দেখ্‌লে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল। মনের গতি-বেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল, আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান আচমন উপবাসের অকর্ম্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কি করে। বইয়ে পড়েচি একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে কিন্তু মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্দ্ধিত

সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েচেন!

এদিকে বয়স যত বাড়তে চল্‌ল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠ্‌ল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বে-পরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেল্‌বে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেচি ভালবাসা অন্ধ কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর ত কোন ভার নেই। সংসার-বুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরো বেশী চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কি দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু সে গুলো ত ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক-চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে-খর্ব্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেচে জানি কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক্ যখন দেখি কোন সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিসেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্প-মাত্র আপত্তি করে না তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তাহলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহঙ্কার ধূলিসাৎ হতে থাকৃত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাইহীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেচে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। একটা

কথা ভুলে ছিলুম বয়সও বাড়চে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটনাগপুরের এক সহরে গিয়ে দেখি পণ্ডিত-মশায় সেখানে শাল বনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শাল-বনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বল্লেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠ্‌ব এ তিনি পূর্ব্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্য্য রকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি ত তা বল্‌তে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র অবস্থায় ষত্বণত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুর বাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠ্‌লুম। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েচে—কিন্তু তিনি নাৎনীতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্দ্ধক্যের অপরাহ্ণকে নানা রঙে রঙীন করে তুলেছেন। তাঁর অমরু শতক আর্য্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চারদিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মত এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে। আমি হেসে বল্লুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপার খানা কি!" তিনি বল্লেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন, এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমি একা। বুঝতে পারলুম আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত

হয়ে পড়েচি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে, তাঁর বয়স হয়েচে, কিন্তু আমার যে হয়েচে সে আমি স্পষ্ট জান্‌লুম। বয়স হয়েচে বল্‌তে এইটে বোঝায়, নিজের চারিদিককে ছাড়িয়ে এসেচি— চারপাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেচে। সে-ফাঁক টাকা দিয়ে খ্যাতি দিয়ে বোজান যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্চি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ করচি এর ব্যর্থকতা অভ্যাস বশত ভুলে থাকা যায় কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাক্‌লে আমরা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাৎ। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগরেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্দ্ধক্যে নাৎনী, নাৎবৌ। এমনি করে মেয়েদের মধ্যদিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্ম্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সাম্‌নে আমার ভাবী বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠ্‌ল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে ত চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির

ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্চে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথাটা একটুখানি ভেবে দেখা যাক্। কিন্তু জীবনের যে-অংশে মুলতুবি পড়েচে সে-অংশে আর ত ফিরে যাওয়া চল্‌বে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক সহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি বাবু ধনী বাঙালী মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁসিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। এক দিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবচি এ'কে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না, এমন কি, চাকরকে আমার জিনিস-পত্র প্যাক করতে বলে দিয়েচি হেনকালে বিশ্বপতি বাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বল্লেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক রকম লোকের আলাপ আছে আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই—নন্দকৃষ্ণ বাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালী-ইংরাজি স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভাল। সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে এতদূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কি কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভাল কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না। সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন কি তার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বল্লেন, হাঁ, জাতে ছোট বটে কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কি করে? যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণ বাবু তাকে বল্লেন, আপনি ত

শালগ্রাম সাক্ষী করে' পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেচেন এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েচেন। শালগ্রামের কথা বল্‌তে পারিনে কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশী কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইনে।" যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথা গুলি বল্লেন তিনি খুসি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্ত্তমান সহরে এসে ওকালতি সুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুতে ছিলেন,—উপবাসী থাক্‌লেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক্ শেষকালে উন্নতি হতে লাগ্‌ল। কেননা হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে' একটু জমিয়ে বসেচেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ বল্লেন, "সাধুলোক পাই কোথায় ?" তিনি বল্লেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।" তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছ তলায় মারা যান। ডাক্তার বল্লে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েচে।

গল্পের এতটা পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মত লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেচে,—না রেখেচে নাম, না রেখেচে টাকা,—তারাই ভগবানের

সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে”—এইটুকু মাত্র বল্‌তেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মত, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চষমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, “হিয়ার্ হিয়ার্!”

যাক্ গে। শোনা গেল নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন, দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেচেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়—কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বল্লেন, “যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন ত সেটা একটা পুণ্যকর্ম্ম হবে।”

আমি বিশ্বপতিকে শুক্‌নো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুঁতে দেখা গেছে তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েচে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত-স্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বল্লুম, “পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।”

"কিন্তু মেয়ে না-দেখেই ত আর"—

"না-দেখেই হবে।

"কিন্তু পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড় বেশী নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়ীখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে সে জন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি"—

"সে এখন বলব না, তাহলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে ত তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মত দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশী নেই যে, ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশী নেই যে, লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতি বাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিষ্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল! তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন অন্য সব বিষয়ে যাই হোক এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে? যে-মেয়ের বড় রকমের

আশা আছে তারি আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মত মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্য্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বেলে বিলিতি কাগজ পড়চি এমন সময় খবর এল একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বল্লুম। সে বল্লে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— শাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কি বলি ভাবচি এমন সময়ে সে বল্লে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক্ দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "জানা অজানা কোন পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না।"

সে বল্লে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশী— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে ইংরেজি বানানের চেয়ে কঠিন তবু

কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হল না। আমি বল্লুম "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বল্লে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করিনে, কিন্তু আমি বিবাহ করবনা।"

আমি বল্লুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বল্‌বেন না।"

"আচ্ছা বল্‌ব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোন কাজে লাগ্‌তে পারি নে?"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তাহলে ভারি উপকার হয়।"

বল্লুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে ইস্কুলের খবর আমি কি জানি! কিন্তু মেয়ে ইস্কুল স্থাপন করতে ত দোষ নেই।

দীপালি বল্লে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে একথার আলোচনা করে দেখ্‌বেন?"

আমি বল্লুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বস্‌লুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনচ?

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে

শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম্ম এই ঃ—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড় দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনি গৃহে লালিত, দীপালির মতে সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চল্‌চে কিছুতে তার মীমাংসা হচ্চে না। ঠিক এই সঙ্কটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর একটা পাত্রকে খাড়া করে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফ্‌শিটের কাটা অংশের মত বেরিয়ে যেতে বল্‌চে।

আমি বল্লুম, যখন এসে পড়েচি তখন বেরচ্চিনে। আর যদি বেরই তাহলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।

বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্র পরিবর্ত্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেচি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েচে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানিনে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মত বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বল্‌ল। ভেবেছিলুম সময়-মত বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে। কিন্তু দেখলুম উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো একটা ক্লাস ডিঙিয়েও

প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনীতে ভরে গেছে উপরন্তু একটি নাতিও জুটেচে। কিন্তু বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে—কারণ তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভদ্রতা।

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যোচিত যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়; নচেৎ বাকি থাকে শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব,—কিম্বা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ খণ্ড তো সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতিপরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোকব্যবহার তত সদ্ভাব ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি

সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতি-মাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ রীতি ক্রিয়াকর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিম্বা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপুর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিম্বা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে!

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশে সুষমা বিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায় ব্যবহার-কেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সৌসাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকৃত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হত, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে' বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিম্বা মনুষ্যসম্বন্ধের 'লসাগু',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই

পরিমাণ সদ্ভাবপ্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই দ্বিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে-কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে, বা যেতে বসেছে।

তার এক কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময় সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইনযোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হলে বোধহয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিম্বা সকলের কুশলপ্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হতে পারে যে, একালে গুরুলঘু সম্পর্কের দূরত্বকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপখুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না,—তাঁরাও যখন কলিকালে পূর্ব্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি-খাজনা এবং উপরি-পাওনার লোভ সম্বরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নাবতে হবে, ও কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জ্জনা করে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের, এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কমবেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি করে, তুমিই বা জানাবে কি করে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহদ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণহীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তচক্ষে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত •

এই চিহ্নতন্ত্রের লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজবিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত সংযত করে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তি জ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে। সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা' একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এই জন্যই বল্‌ছিলুম যে আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজ-কাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূলভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকালভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তর্প্রকৃতিবিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদীসম্মত।

(২)

প্রথমতঃ ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফুল সংযম। উপস্থিত মত পরের যা'তে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতঃই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের

আপাত-সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমার যে-সময় বিশেষ জরুরী কাজ আছে, সে-সময় হয়ত একজন সামান্য আলাপিনী (বা অপরিচিতা) দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। যতক্ষণ তাঁর উঠতে ইচ্ছা না হয়, আমার হাজার অসুবিধা হলেও বল্‌বার জো নেই—"সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা, একি আর ভাল লাগে.!" আমাদের দেশে দেখাসাক্ষাতের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নেই বলে' এ বিষয় আরও ভুগতে হয়। কিম্বা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন; আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে—"ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ"; কিম্বা আর একজনকে—"তুমি দু'দিন আগেই যে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে;" কিম্বা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে এটি ঘটেছে;" কিম্বা আর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ভাল হয় না?"

নাঃ—একালেও এদেশে ভদ্রতা বড় কড়া মনিব,—বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। চড়া গলায় কড়া কথা বল্‌বে না, চেঁচিয়ে হাসবে না, লোভীর মত খাবে না, গালমন্দ দেবে না, মুখে মুখে জবাব করবে না, অতিরিক্ত চাঞ্চল্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে না;—ইত্যাদি নানাপ্রকার নেতিমূলক বিধান তারা বড় হলে মেনে চলতে বাধ্য। এক কথায়, তাদের শরীরকে যেমন লজ্জাবস্ত্রে আবৃত রাখতে হয়, ব্যবহারকেও তেমনি সম্ভ্রমের সূক্ষ্মবর্ম্মে সুসম্বৃত রাখা চাই। ছেলে সম্বন্ধে কড়াক্কড়ির মাত্রা কিছু কম, কারণ তাদের জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সভ্যসমাজে তাদেরই বা শাসন মন্দ কি?—পাশ্চাত্য দেশে,

যেখানে সমাজক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশা প্রচলিত, সেখানে উভয়পক্ষকেই সামাজিক নিয়মাধীন হয়ে চলতে হয়। আমাদের দেশে সে প্রথা না থাক্‌লেও, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতারক্ষার নিয়ম যথেষ্ট ছিল। এখন যদি সে বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে থাকে ত অন্ততঃ একটা কোন কালোচিত আদর্শ যা'তে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এসব বিষয়ে ছেলেবেলার অভ্যাসই প্রবল। দুর্ম্মুখ হওয়াই কিছু তেজস্বিতার পরিচয় নয়, দুর্ব্যবহার করাই কিছু চরিত্রবলের প্রমাণ নয়। বদরাগী ও রাশভারি, এ উভয়প্রকার লোকের মধ্যে সমাজে প্রতিপত্তি কার বেশী ?—সভ্যমেব জয়তে, নেতরং।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে' থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে ? অবশ্য সাহিত্য-চর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে, তা যে কেবল লীলাকমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি,—অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই! কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক আর যে-কোনপ্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এ স্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি ?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" বলে' আরম্ভ করে' তাঁরা

মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টি‍ঁকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করে ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরী বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে; একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হতে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না, চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না; তেমনি বোধহয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না বলেই ভগবান দয়া করে অজ্ঞানের আড়াল রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়; কিম্বা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রু সাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

(৩)

কিন্তু অল্পমাত্রায় যা' উপকারী, বেশিমাত্রায় তা'তেই হিতেবিপরীত হতে পারে,—যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ! পরের মন-লাগানো কথা বল্‌ব না বলেই যে পরের মন-যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন

মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না বলে' নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে বলে'ত আমার বিশ্বাস।—ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা করে'ও পরের সুবিধা করে' দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সরল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশো, কুটিল ও কুৎসিৎ। স্বীকার করি, বড়লোক দেখ্‌লে মানুষের মুখের ভাব আপনাহতেই একটু মোলায়েম হয়ে আসে, গলার স্বর অজ্ঞাতসারে অতিকোমল সুরে নাবে; এবং বিলাসপুরের মহারাণী তোমার আমার বাড়ী পায়ের ধুলো দিলে তাঁর সমাদরের জন্য তুমি আমি যত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ব, ও-পাড়ার পাঁচিধোবানী বেড়াতে এলে মোটেই সেরকম হব না! কিন্তু বহুকালের অভ্যস্ত সামাজিক স্তরভেদঘটিত ব্যবহারতারতম্যের সঙ্গে স্বার্থমূলক বাড়াবাড়ির যে তফাৎ, আশা করি চোখে আঙুল দিয়ে তা' দেখানো অনাবশ্যক। গায়ে পড়ব না মনে করলেই কি দশ হাত দূরে থেকে মানুষকে নখী দন্তী শৃঙ্গীর দলে ফেলতে হবে?—দুঃখের বিষয়, যতদিন বড়লোকমাত্রই প্রায় খোসামোদের বশ থাকবেন, এবং যতদিন পৃথিবীতে বড়ছোটর মধ্যে অবস্থা ও ক্ষমতার এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকবে,—ততদিন খোসামোদকে সমাজ থেকে তাড়ানো মুস্কিল। ভদ্রতাকে এইরকম অনেকে ছদ্মবেশরূপে ব্যবহার করে বলে' অতিভদ্রতাকে লোকে যেন সন্দেহের চক্ষে দেখে; কারণ তারা ঠেকে শিখেছে যে অতিনম্র বিনীত ব্যবহারই দুরভিসন্ধির স্বাভাবিক অস্ত্র! ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরও এই দোষে দূষিত। সংসারে জহর দুর্লভ

হলেও তত ক্ষতি ছিল না, যদি জহুরী ততোধিক দুর্লভ না হত! একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কিরকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি করে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত (বা অতিভক্ত!),—যেখানে অক্ষমতা, সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে?—তবে তাদের সবই সুন্দর!

আর একটি জিনিস আছে, যা' ভদ্রতার বেনামী চলে,' অথচ বেশি পরিমাণে যা ক্ষতিকর;—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগমুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে' আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে (বেশ একটু উৎসাহ সহকারেই!) তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা করে' দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢেঁকি গিল্‌লেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়! আবার যদি করব বলে' না করি, তাহলে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তুমি সজোরে একটা মত ব্যক্ত করছ, সেটা হয়ত আমার মোটেই মনঃপূত নয়; অথচ আমি চক্ষুলজ্জার খাতিরে হয় চুপ করে' থেকে জানাই যে মৌনং অসম্মতিলক্ষণং,—সেটা বরং ভাল; আর নয় ত আম্‌তা-আম্‌তা করে' তোমার মতে সায় দিয়ে যাই, তা'তে অনেক সময় আমার নিতান্ত অনভিপ্রেত এমন কি অন্যায়

কার্য্যে পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে অন্তরাত্মার অবমাননা করা হয়। কেন এ বিড়ম্বনা ?—তার চেয়ে গোড়ায় স্পষ্ট অথচ ভদ্রভাবে 'না' বলতে বা প্রতিবাদ করতে পারলে দু'পক্ষেরই ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা বেঁচে যায়, এবং মতান্তর থেকে মনান্তর পর্য্যন্ত গড়ায় না। 'ভালমানুষ'কে যেমন আমরা 'গো-বেচারা'র দলে ফেলেছি, তেমনি ভদ্রলোক বল্‌তেও যেন দাঁড়িয়েছে এই যে, তাকে যে-সে মনে করলেই ফাঁকি দিতে ও ঠকিয়ে নিতে পারে ;—'বৈকুণ্ঠের খাতা' দ্রষ্টব্য। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সম্মিশ্রণ কেন এদেশে এত দুর্লভ ? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হতেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম ?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হলে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধ-কারীও মাত্রা বুঝে পেড়াপিড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব, —নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ !

এইটেই ভদ্রতার প্রধান অসুবিধা,—যে অন্য লোকে শেষ পর্য্যন্ত তার সুবিধাটি আদায় করে' নিতে পারে, তার প্রতি অন্যায় দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না,—কারণ ভদ্রলোক বেচারা কপালে হুণ্ডির ছাপ মেরে বসে' আছে। ভদ্র এবং অভদ্রের সংঘর্ষে প্রথমোক্তকেই অনেক সময় হার মানতে হয়, কেননা পূর্ব্বেই বলেছি কতকগুলি অস্ত্রপ্রয়োগ তার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; অভদ্রের ত সে বালাই নেই। গল্প শুনেছি যে বিলাতে বড়লোকেরা রাস্তাঘাটে পারৎপক্ষে ছোটলোকদের অপ-মানসূচক টিট্‌কারীর প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না,—বিশেষতঃ যদি কোন ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকেন।

(৪)

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থসামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা, আকর্ষণবিকর্ষণ যার যেমনই থাকুক না কেন,—কম হলেও তা'কে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হলেও তার পায়ের তলায় পড়ে' থাকবার দরকার নেই। যা'কে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলি ও কর' না, যা'কে মন্দ লাগে তাকে গালাগালি ও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার কর',—এই হচ্ছে তার বিধান। এই সামঞ্জস্যজ্ঞান থেকে একটু নির্লিপ্ত ভাব আসতে পারে,—অবশ্য প্রকাশ্যে। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিৎরা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। (কিন্তু অনুরাগ কমে না বাড়ে?)—পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের আড়ালটুকু রাখ্‌তে চাইনে,—অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য,—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরোয়, এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে' পড়ে।

সেই জন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরাক্তর উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। আমার মনে আছে ছেলেবেলায় কোন একটি পূজনীয়া আত্মীয়া যখন আমাদের 'তুই' না বলে' 'তুমি' সম্বোধন করতেন, তখনই বুঝতুম যে তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন! ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকের মধ্যে

মনান্তরস্থলে এরূপ কপট ভদ্রতারীতির দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। সেকেলে গৃহিণী যেখানে গয়না খুলে উপোষ করে' চুল এলিয়ে গোসা-ঘরের মেঝেয় লুটতেন, এবং যথাসময়ে সরল মামুলী-ভাবে মান ভাঙ্গিয়ে নিতেন; আজকালকার গৃহিণী সে স্থলে দৈনিক কর্ত্তব্যপালনের তিলমাত্র ত্রুটি না করে'ও মৌখিক ভদ্রতারক্ষার অন্তরালে যে দুর্জ্জয় অভিমান পোষণ করতে পারেন, তা'কে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার! সেকালের সমতল যুদ্ধক্ষেত্র এবং একালের গুহাগহ্বরমণ্ডিত কণ্টকজালখণ্ডিত ক্ষেত্রে যা' তফাৎ,—এও তাই আর কি!—অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্কস্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। এমনও লোক আছেন, যাঁরা বাইরে অতি বিনীত, কিন্তু ঘরে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে' থাকেন! যেন ভদ্রতা একটা পোষাকী বেশ মাত্র, যা ঘরে এসে খুলে না ফেল্‌লে ময়লা হয়ে যেতে পারে! অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা যাদের একসঙ্গে থাক্‌তে হয়, তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার নিয়ম শিথিল না করে' দিলে চলে না, ও সাতখুন মাফ করতেই হয়। তবে আজকালকার যেরকম মতিগতি, তাতে রাশ ঢিলে না দিয়ে টানাই দরকার। এই কথাটাই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, একসঙ্গে থাক্‌তে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য্যভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোকে বুঝতে পারবেন যে,—সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার,

অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা' মুছে ফেলা যায় না; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়িকলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকা-ঠুকি হয়, সে কথা সত্য; কিন্তু একটু ঘন করে' প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেঁকেও বেশিদিন! বাঙ্গালী জাত পরিবার-গতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে' তোলবার কোন উপকরণই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

কিন্তু আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এতরকম বাধ্য-বাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনা-জড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছ-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছনো যায়—যদি কপালে থাকে! এক এক সময় আমার মনে হয় যে হয়ত এতে অনেক সময় নষ্ট হয়; হয়ত দুর্লভ মনুষ্যজন্মে কত দুর্লভতর বন্ধুত্ববিকাশ হতে পারত, যদি এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে না হ'ত। যদি সামাজিক ব্যবধান এত

দুর্ভেদ্য না হত, যদি সামাজিক বিধান এত দুশ্ছেদ্য না হত, যদি প্রত্যেক পরিবার এক একটি দ্বীপের মত স্বতন্ত্র না হত,—তাহলে হয়ত জীবনের অনাবিল সঙ্গসুখের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু বলা যায় না;—সংসারে যদি সজ্জন অপেক্ষা দুর্জ্জনের সংখ্যাই বেশী হয় ত চলিত নিয়মই ভাল। অনেক প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে ছেঁকে এলে তবেই হয়ত স্বচ্ছ জিনিসটি পাওয়া যায়। তা' ছাড়া দুর্লভেরই মূল্য বেশী, তা'ত নিত্যই দেখ্‌তে পাই। একটু দূরতা, একটু দুর্গমতা, একটু রহস্য ভেদ করতে না হলে, একটু কৌতূহলের অবসর না দিলে, মেলামেশার তত আগ্রহ বা আস্বাদ থাকে না। "পড়া পুঁথি সম" আত্মীয়সভার মাঝে একটি বাইরের লোক দৈবাৎ এসে পড়লে সকলে কিরকম তাজা হয়ে ওঠে, ও কথোপকথনের মরাগাঙ্গে কি রকম জোয়ার আসে, তা' অনেকেই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। সেই জন্যই ত নূতনের এত মাহাত্ম্য, অজানার এত আকর্ষণ। (আর সেই জন্যই কি ভগবান নিজেকে রহস্যের জালে আবৃত রেখেছেন?)—অন্ততঃ এই জন্যেও মেয়েদের শিক্ষা বেশী পুরুষালী করবার পক্ষপাতী আমি নই;—তা'তে তাদের বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তাদের স্বকীয় মর্য্যাদা খর্ব্ব করে' নিকৃষ্ট নকলে পরিণত করা হয়।

(৫)

অনেক প্রাসঙ্গিক এবং অপ্র্যাসঙ্গিক আলোচনার ফলে অবশেষে এইটুকু পাওয়া গেল যে, ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা

ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত করে' সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। 'পঞ্চ্' নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:—এক 'Things that had better been left unsaid'; আর এক, 'Things that ought to have been expressed otherwise!' অর্থাৎ যা না বল্লে ভাল হত, এবং যা অন্যরকমে বলা উচিত ছিল। বাচনিক নিষেধও অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয় "সত্যং ব্রূয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এইরকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানিনে; তবে ইংরাজীতে যাকে ব্যবহারের 'golden rule' (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এ স্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা; ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা। আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক নামক আর দুই মূল শ্রেণীতে ভদ্রতাকে ভাগ করেছি, ও বলেছি যে আজকাল প্রথমোক্তের প্রতিই লোকের বেশী ঝোঁক; এবং সংযম ও সাম্যভাব তার দুই প্রধান সর্ব্বজনীন উপাদান। সংযম যে শুধু পরকে

কষ্ট না দেওয়ার বেলায়ই ব্যবহার্য্য তা নয়, কিন্তু যেখানেই সুরুচির ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা, সেইখানেই প্রযুজ্য। সুরুচি পদার্থটি এত সূক্ষ্ম যে, তাকে কোন কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে ধরাবাঁধা যায় না, এবং সমাজের স্তরভেদ অনুসারে তার আকারও বিভিন্ন হয়। কথায়ই বলে লোকের ভিন্ন রুচি। তবে সকল দেশের ভদ্রলোককেই মোটামুটি এক সমাজভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। লোকসমাজে অযথা পরনিন্দা বা আত্মশ্লাঘা, পরের উপকার করে' নিজের মুখে দশবার বলা বা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া, পরের আর্থিক অবস্থা বা অপর গোপনীয় পারিবারিক কথা সম্বন্ধে খুঁচিয়ে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা, অনাহূত পরকে পরামর্শ দান, নিজের টাকার গল্প করা প্রভৃতি যে বাচনিক ক্ষেত্রে মোটেই সুরুচিসঙ্গত নয়,—তা এঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে স্পষ্ট অভদ্রতা,—যথা পরকে মুখের সামনে অপমান, বা মারধোর চেঁচামেচি করা ইত্যাদি আজকাল সভ্যসমাজে বিরল। কিন্তু আমাদের ভদ্রতম সমাজেও সুরুচির ব্যতিক্রম তেমন বিরল নয় দেখে দুঃখিত হতে হয়; ও সেই জন্যই এত কথা বলা। যে ভারতভূমি শিষ্টতার আকর বলে' খ্যাত ছিল, অন্যান্য অবনতির সঙ্গে যাতে এই পৈতৃক সম্বলটুকুও তার নষ্ট না হয়, অন্ততঃ আমরা মেয়েরা বোধহয় সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলে কৃতকার্য্য হতে পারি। আনুষ্ঠানিক ভদ্রতাকে অপেক্ষাকৃত নীচু আসন দিয়েছি বলে' যেন কেউ এ ভুল বিশ্বাস না করেন যে তাকে একেবারে গৃহ এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় মেয়েরা স্বভাবতঃই কিছু অনুষ্ঠানপ্রিয় বা বাহ্যনিদর্শন-ভক্ত। জানি তুমি ভালবাস, বা তুমি ভক্তি কর, বা তুমি স্নেহ কর,—

তবু মাঝে মাঝে সে কথা বল', কাজে দেখিও, ভাবে জানিও,—"মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো",—এই হচ্ছে তাদের ভাবখানা। বেশী সূক্ষ্ম তারা ধরতে পারে না, বেশী ব্যাপক বুঝতে পারে না;—তারা চোখে দেখতে চায়, হাতে পেতে চায়, প্রকাশ চায়, প্রমাণ চায়। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের শ্রীটুকুও তারা ভালবাসে। কলমের এক আঁচড়ে বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-আচারের চিত্রবৈচিত্র্য ভিন্ন মেয়েদের মন ওঠে না। সেইজন্য পুরুষরা যখন সমাজ-সংস্কারের অছিলায় (এবং হয়ত আসলে খরচ কমাবার অভিপ্রায়ে!) বিবাহের নিমন্ত্রণ-ফর্দ্দ বা ভোজের বাহুল্য ছেঁটে দিতে চান, তখন বাড়ীর মেয়েরা কিছুতেই রাজি হন না। সামাজিক ভদ্রতার অনুষ্ঠান গুলি,—যথা, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের চিঠিপত্র লেখা, অসুখ-বিসুখে খোঁজখবর নেওয়া, ক্রিয়াকর্ম্মে যোগদান, তত্ত্বতল্লাস, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি প্রায়শঃ মেয়েরাই রক্ষা করে' থাকেন, এবং না করতে পারলে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু পুরুষেরা ত দেখেছি পরমাত্মীয় সম্বন্ধেও 'ভাল আছে' এইটুকু দূর থেকে জানতে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত মনে থাকেন; যদিও তাঁরা অনেকেই আত্মীয়ের বিপদে আপদে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এবং স্বজনবৎসল নন তাও বলতে পারি নে। তার এক কারণ বোধহয় এই যে, গৃহ এবং তারই আঙিনারূপ যে সমাজ, তা মেয়েদের জীবনসর্ব্বস্ব, কিন্তু পুরুষদের জীবনের ভগ্নাংশমাত্র। জীবনের আনন্দযজ্ঞে তাঁরা কেবল হোতা, মেয়েরাই যজ্ঞকর্ত্রী। এই সকল কারণে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিদেন মেয়েদের খাতিরে দেশকালপাত্রোপযোগী আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি রক্ষা করে' চলাই ভাল। আত্মীয় বা

অনাত্মীয় অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে সময়োচিত দুটো শিষ্ট কথা না বলা বড়ই দৃষ্টিকটূ—তা অন্যমনস্কতাবশতঃই হোক, সঙ্কোচবশতঃই হোক, আর অপ্রবৃত্তিবশতঃই হোক্। ভদ্রব্যবহার এমন যন্ত্রবৎ অভ্যস্ত হওয়া উচিত যে এরূপ অনবধান বা ত্রুটি কোনমতেই সম্ভব না হয়। আমাদের নব্য-সমাজ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এখনো সেকাল ও একালের মধ্যে দোদুল্যমান বলে' এ সব বিষয় একটা দু'তরফা ডিক্রী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোন একটি উচ্চপদস্থা স্বদেশিনী একবার আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-নীতি বিধি-বদ্ধ করে ফেলা উচিত। কিন্তু সে বিধান গড়বেই বা কে, আর মানবেই বা কে? সামাজিক আইন জারি করবার জন্য যখন কোন উপর-আদালত নেই, তখন এ সকল নিয়ম আবশ্যকের চাকে এবং সুরুচির হাতে আপনি গড়ে উঠতে দেওয়াই ভাল। তবে মেয়েদেরই প্রধানতঃ এ কাজে হাত লাগাতে হবে। কারণ অন্যত্র যাই হোক্, সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরই বিধান শিরোধার্য্য।

(৬)

আত্মীয়ের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মের অভাব আমাদের নেই, কিন্তু সে গণ্ডির বাইরে গেলেই যেন জলে পড়তে হয়, কারণ মেয়েদের তার বাইরে যাবার হুকুম সেকালে ছিল না। একালে যখন তা' হয়েছে, এ ং সখ ও আবশ্যকমত পরিচিত অপরিচিত, স্বদেশী বিদেশী সকল রকম সমাজেই আমাদের মেয়েদের অল্পবিস্তর মিশতে হচ্ছে, তখন লোকব্যবহারের কতকগুলি অলিখিত নিয়ম মেনে চলা নিতান্তই দরকার। সেগুলি দেশব্যাপী হওয়া, বা সকল সমাজে গ্রাহ্য হওয়া

যদিও এখনি আশা না করা যায়, তবুও স্বসমাজে, অন্ততঃপক্ষে স্বপরিবারে চালাবার চেষ্টা করা যেতে পাবে, এবং অনেকস্থলে করা হয়েও থাকে। যথা—কারো কারো মতে যে-পরিবারের মেয়েরা বেরোন না, সে পরিবারের পুরুষদের সামনে অন্য পরিবারের মেয়েদের বেরোনো উচিত নয়। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, এবং আছে; কিন্তু যাঁরা এই মত অনুসারে চলেন, তাঁরা ভেবেচিন্তে নিদেন একটা কোন সঙ্গত সামাজিক নিয়ম বের করেছেন, এটা মানতেই হবে। নিয়ম থাকাও চাই, অথচ এতটুকু নমনীয় হওয়া চাই যাতে অবস্থাভেদে ভেঙ্গে. গড়া যেতে পারে,—উন্নতিশীল সমাজের এই লক্ষণ। যদিও নতুন নিয়ম গড়া নয়, পরন্তু গঠিত নিয়ম মেনে চলাই হিসেবমত ভদ্রতার কাজ। কারণ ভদ্রতার একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে সহজ ভাব। কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা এসে পড়লেই যেন তার স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এবং এই সহজ ভাবটি একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই লভ্য। বস্তুতঃ সহজ হওয়া যে কত শক্ত, তা' সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-শিক্ষারই অগ্রবর্ত্তী উত্তরাধিকারী। এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' মেয়েদের অকাল-স্বাধীনতা দেওয়ার কোন সুফল আমি ত দেখতে পাই নে। অনভ্যাসের সঙ্কোচে যে ন-যযৌ-ন-তস্থৌ ভাব হয়, সেটা বড়ই অশোভন। নিয়মের অভাবে শিক্ষিত মেয়েদেরই অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বোধ হয় ত অন্যে পরে কা কথা। যদি বিয়ের আগে পর্য্যন্ত আমার মেয়েকে ঘরে বন্ধ করেই রাখলুম, তাহলে স্বগৃহের গৃহিণী হওয়ামাত্র হঠাৎ কি করে' সে ব্যাপকতর সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করে' চলবে? সহজ মেলামেশবার ক্ষমতা আয়ত্ত করাবার প্রশস্ত উপায় ছেলেবেলা থেকে

মেলামেশার অভ্যাস করানো। ইংরাজরা ছেলেদের আদবকায়দা বিষয়ে খুব সচেষ্ট ও সজাগ। আমরা তা নই বলে আমাদের অধিকাংশ ছেলে বাইরের লোক সম্বন্ধে হয় বেশী বাচাল ও বেচাল কিম্বা বেশী সঙ্কুচিত ও ভীত হয়। বড়রাও যে সে দোষমুক্ত, তা' নয়। এ সব কেবল অনভ্যাসের ফল,—এবং তার প্রতিবিধান বাপমায়েরই হাতে। লোকসমাজে স্বীয় সন্তানগণ যাতে সহজ, সদয়, সুরুচিপূর্ণ সংযত ও স্বদেশীভাবানুমোদিত ব্যবহার করতে শেখে, এই পঞ্চ 'স'কারের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে 'lady' ও 'gentleman' শব্দে ভদ্রব্যবহারের যে উচ্চ আদর্শ সূচিত করে, তা' রক্ষা করে' চলতে পারলে নৈতিক উপদেষ্টার আর বড় কিছু বল্‌বার বাকি থাকে না।

আমাদের দেশে রাজদরবার ছিল না বলে', কিম্বা যে কারণেই হোক্,—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কি একটু অভাব লক্ষিত হয়?—উচ্চনীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতের সঙ্গে দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নেই; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিম্বা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। এ সকল অভাবমোচন বা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা একালের মেয়েদের একটি কর্ত্তব্য কাজ। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি আমরা দায়ে পড়ে' ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে,—মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে বসে' একটা

মন-গড়া নিয়ম মানলেই ত যথেষ্ট হ'ল না। দশজনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা' রয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হয়। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে বসে' বসে' তা'কে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে—এখনো যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যা'তে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। যথা:— ব্রাহ্মণের প্রাপ্য অভিবাদন সব জাতেই যেন সমানভাবে পায়, 'শ্রীমতী' ও 'দেবী' প্রভৃতি সম্মানার্থক সম্বোধনই যা'তে সমাজে প্রচলিত হয়, ইত্যাদি।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করা গেল, তেমনি সেই বাইরের সমাজে আবার কথোপ-কথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ ক্ষণিক মেলা-মেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতেকলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোট-খাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তাও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশি তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপ-কথনস্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা' সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে দোষবর্জ্জিত নন। প্রথমতঃ, আমরা প্রায় সকলেই বেশি চেঁচিয়ে কথা কই; দ্বিতীয়তঃ, তর্ক-স্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ, আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি—(হিত অথচ

মনোহারী ব্যক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমঝদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয় ?) ; চতুর্থতঃ, আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা বলে' যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হতে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিই নে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, আমাদের গল্পগোষ্ঠী হয় একটা গোলে-হরিবোলে পরিণত হয়, যেখানে সকলেই একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শোনে না ;—কিম্বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'one-man-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। যদিও সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা বা সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সুফল। পঞ্চমতঃ, আমরা জেনেশুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা' উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর, অথবা এমন করে কথা বলি যা'তে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যা'কে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"। —দরকার কি ? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি-উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও ; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না করেও বোধহয়. একজনকে বোঝানো য়ায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে ; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। কবিতা যদি "কি-যেন-কি"র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ত সমাজকে মনে কর "যেন"র উপর প্রতিষ্ঠিত ; মনে মনে যার যাই থাক্, লোকসমাজে এমন ভাবে চল যেন সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঠিক আছে, যেন তোমাকে দেখে আমি ভারি

খুসি হয়েছি, যেন তোমার জন্যে এ কাজটুকু করে দিতে পারায় তোমার নয়, আমারই লাভ। আর ভেবে দেখতে গেলে সেটা এমনই বা শক্ত কি? কেনই বা শুধু মৌখিক হবে? আত্মীয়তাস্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যেও ভূষিত হওয়া ত সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরাজ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষজ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হলেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও তা' ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যেও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহলে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা' মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে সহজে ভাঙ্গে না!—এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম করে' এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যা'তে একটু শ্রীসম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায়

লিপ্ত আছেন যা'তে সমাজের ছোটখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয় ;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। বড় কাজ কিছু শুধু ভদ্রতার দ্বারা হবে না সত্য, কিন্তু ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ, ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

লাভালাভ।

——:০:——

কবিরা যে আহাম্মক, তারা যে নিজেদের মঙ্গল নিজেরাই বোঝে না, তারা যে সকল কাজের মধ্যেই কেবল অবিবেচনার পরিচয় দেয় এমনিতর অনেক কথা বুদ্ধিমান লোকেদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় কবিরা নিজেরাই অনেক সময় এমন এক একটা কথা বলে বসেন যা থেকে এইটেই কেবল মনে হয় যে তাদের কোন কাজের মধ্যেই যুক্তি বা বিবেচনার লেশমাত্র নেই; যেমন রবিবাবু এক জায়গায় বলেছেন, "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাই জানে।" উক্ত বুদ্ধিমান লোকেরা একথা শুনে বলে উঠবেন, "যে-সাগরের কুল পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসাতে কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে, যার কুলই পাওয়া যাবে না তাতে তরী ভাসিয়ে লাভ কি? এই "লাভ কি"র উপরেই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

উদ্দেশ্য হিসাবে মানুষের লাভালাভ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। চাকুরে বাবু যখন ছুটি পেয়ে দেশে যাবার জন্যে ট্রেণে ওঠেন তখন তিনি ক্রমাগতক এই কথাটাই ভাবতে থাকেন যে কতক্ষণে পথ ফুরবে যে তিনি বাড়ী গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন। এখানে পথটা তাঁর উদ্দেশ্য নয় এটা কেবল তাঁর ঈপ্সিত বস্তুর কাছে নিয়ে যাবার উপায় মাত্র, কাজেই সেটার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, সেটাকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতে পারেন না; কিন্তু যাঁরা ট্রেণে চড়েন বেড়াবার জন্যে,

দুধারের ধানের ক্ষেত আর সবুজ গাছপালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে তাঁরা ভাবেন পথ না ফুরুলেই বাঁচি। ট্রেণ যতক্ষণ চলে ততক্ষণই যে তাঁদের লাভ। এখানে পথটাকে উপভোগ করাই যে তাঁদের উদ্দেশ্য কাজেই পথ যত না ফুরোয় ততই তাঁদের লাভ। এইখানেই কবি আর সাংসারিক লোকের তফাত। সাংসারিক লোকদের উদ্দেশ্য বাড়ী পৌঁছান, কাজেই পথ যত শীঘ্র কেটে যায় ততই ভাল আর কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওপারে যাবার পথটাকে উপভোগ করা কাজেই পথটাকে ফুরুতে দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছে নয় কাজেই কবি ত সেই সাগরেই তরী ভাসাবে "যার কুল সে নাহি জানে।"

পথ হাঁটাটাই যে কবির সুখ। সেই অজানার পিছনে পিছনে ছোটাটাই, সেই অকুলের কুল পানে তরী ভাসানটাই যে তার আনন্দ; যদি কুলই পায় তা হলে তরী ভাসান যে তার বন্ধ হয়ে যাবে তাই সে "তরী সেই সাগরে ভাসায় ও যার কুল সে নাহি জানে।" সে যে চিরকাল এমন সাগরে তরী ভাসিয়ে এসেছে যার কুল-কিনারা পাবার সম্ভাবনা নেই এবং সে যে এমনি অকুলের মধ্যেই তরী ভাসাবে। যদি কুলই সে পায় তবে কুলের জিনিস, কুলের গাছপালা, কুলের আকাশ সবই যে কুহেলিমুক্ত, পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে সে যে স্বপ্ন-রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়বে। যা পাই, যা পাওয়ার মধ্যে বাধা নেই সে ত কবির জিনিস নয়; যা পাই তার মধ্যে যে মাদকতা নেই, তা নিয়ে যে বিভোর হওয়া যায় না। যা না পাই সে যে ঐ না-পাওয়ার ভিতর দিয়ে অনেক পাওয়াকে পাইয়ে দেয়। যে-টাকে ইচ্ছে করলেই পেতে পারি তাকে নিয়ে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে? এটা পাগলামীর কথা নয়, এটা খুব সত্য কথা। এ ভাবটা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর ভাবে আছেই আছে। কোন্ ব্যক্তি না, পুরাতন কোন সহর বা পুরাতন কোন নগরের ভগ্নাবশেষ দেখতে ভালবাসেন ? কেন ভালবাসেন এ প্রশ্ন যদি তাঁরা নিজেদের মনকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন তা হলে মনের খুব অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বলবেই বলবে যে, "ওহে! সেখানে গেলে কল্পনা যে নিজের কাজ পায়। সেখানে যে অনেক এমন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে গোপনতা আছে তার মধ্যে "কি যেন আছে, কি যেন নাই" এমনি একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। নূতন সহর দেখলুম, সে তার সমস্ত অন্তরখানাকে বার করে রেখেছে, মেলিয়ে রেখেছে ; আমরা দেখলুম, চলে এলুম, ফুরিয়ে গেল ; আসবার সময় বলে এলুম, "এই ত।" কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে "এই ত" বলে হাঁফ ছাড়বার জো নেই ; সে যে অর্দ্ধেকটা লুকিয়ে রেখে দিয়ে বল্‌ছে, "ওহে দর্শক সবটা তোমাকে দেখাব কেন, যেটুকু দেখলে তাই থেকে ভেবে নাও আমি কি ছিলুম।" মানুষের ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে তারা সেইটার মধ্যেই মাদকতা পায় যেখানে তাদের মন খাটবার মতন খানিকটা অবসর পায়।

কবি আবছায়াকেই চায়, সে অকূলের মাঝখানে তরী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, চারিদিকে চেয়ে দেখবে, সুমুখে কূল নেই, পিছনে কূল নেই, আশে পাশে ও তাই ; সবই ধোঁয়ায় ঢাকা, তবে ত তার আনন্দ। তবে ত সে ওপারের জন্য পাগল হয়ে উঠবে, তবে ত সে ওপারের পাড়ির বন্দোবস্ত করবে। ওপারে কি আছে তা না জানতে পারাটাই যে তাকে ক্রমাগতক ডাকছে, "আয় আয়"। ঐ অজানার মধ্যেই যে তার ঈপ্সিতের বাসভূমি, ঐ অজানার মধ্যেই যে তার অপরিচিতের আহ্বান।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

"ঘরে-বাইরে"।

আমি রবিবাবুর উপর্য্যুক্ত নামধেয় পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে বসি নাই, সর্ব্বাগ্রেই এই কথা বলিয়া লইয়া, আমার যাহা বলিবার তাহা বলিব।

হইতে পারে কারও কারও কাছে বইখানি খুব মন্দ, আবার এমন লোকও থাকিতে পারেন, যাঁহার কাছে উহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অবশ্য একথাও বলা যায়, যে যাহা অপূর্ব্ব তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য নয়, এবং উৎকৃষ্ট জিনিস চাই কি অপূর্ব্ব নাও হইতে পারে!

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষটা নিতান্ত কুনো। ভারতবর্ষের লোক নিতান্ত গৃহবদ্ধ, নিতান্ত আত্মসর্ব্বস্ব! ঘরের বাহিরে আর কোনও ভাল জিনিস আছে কি না, এ খোঁজ লওয়া যাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাঁহারা "আপভালা" হইতে পারেন, "জগৎ" তাহাদের কাছে ভাল

আর সেই যে "আপভালা" তাহাও নিজের কাছে এবং নিতান্ত গায়ের জোরে। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভারতকেও চেনেন না, জগৎকেও চেনেন না। একটা বাঁধিগৎ আওড়ান মাত্র।

বাঁধিগৎ আওড়ানো বিষয়ে ভারতবর্ষের লোক ঠিক টিয়াপাখী। ভারতবর্ষটা কতকগুলো টিয়াপাখীর একটা বৃহৎ খাঁচা ছাড়া আর কি? এই টিয়াপাখীগুলির নিজেদের খাঁচার বাহিরে যাওয়ার ভ

ক্ষমতা নাই-ই, অন্য কাহাকেও যাইতে দেখিলেও অমনি বাঁধিগৎ-শাস্ত্রের দোহাই! সমুদ্রযাত্রা নাকি শাস্ত্রনিষিদ্ধ। হাঁচি টিক্‌টিকির মত এই শাস্ত্রবাক্য আমাদের পদে পদে বাধা।

কিন্তু আমরা বাহিরের সংবাদ পাইয়াছি—আমরা বাহিরে যাইতে চাই! গৃহবদ্ধ শিশু রবীন্দ্রের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাতির প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে—আমরা বাহিরের বাঁশী শুনিয়াছি—আমরা আকুল হইয়াছি! আকাশের নিলীমা, বাতাসের গন্ধ, প্রান্তরের শ্যাম-শোভা, গগনের আলো আমাদিগকে ডাকিতেছে—দরজা খুলিয়া দাও আমরা বাহির হইব। কেন এ বন্দীত্ব, কেন এ প্রাণান্তকারী অবরোধ।

ধরিয়া লওয়া যাউক এ ঘর খুব ভাল; কিন্তু বাহিরের জন্য যে ক্ষুধা সে ক্ষুধা ত আমার ঘরে মিটিবে না! বাহিরে বিপদ থাকিতে পারে ঘরেও ত কম নাই। বাহির হইলে মরিব কিন্তু ঘরে বসিয়া চিরায়ু হইব এ গ্যারাণ্টি কেহ দিতে পারে? অনেক দিন তো বাঁচিয়া আছি, বাহিরে গিয়া না হয় একটু মরিয়াই দেখি, বাহিরে কি কেবল শ্মশান? কেবল শ্মশানই যদি হয়, ওরে নাস্তিক, শ্মশানের পর কি আর কিছু নাই?

কিন্তু বাহিরটা তো শ্মশান নয়, ওখানে ও অনেকে জন্মিয়াছে, ওখানে ও অনেকে বাঁচিয়া আছে। ঘরেও তোমার সেক্সপিয়ার হেগেলের মত লোক ভূরি ভূরি জন্মে নাই! বাহিরেও কবির অভাব নাই, রাজনীতিকের অভাব নাই, জ্যোতির্ব্বিদ-গণিৎবিদের অভাব নাই, দার্শনিকের অভাব নাই, জ্ঞানের অভাব নাই, তত্ত্বের অভাব নাই, বৈরাগ্যের অভাব নাই, ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের অভাব নাই, কৃষ্ণের অভাব নাই, রামের অভাব নাই। আর তোমার ঘরের সবই যে পরের

সবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; বাহিরের সঙ্গে তুলনা না করিয়া কেমন ক রয়া বুঝিব। তোমার নিষেধ বাক্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে?

ঘরের বিমলা যদি বাহিরের সন্দীপের প্রাত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, দাও তাকে আকৃষ্ট হইতে! সন্দীপ যদি নিতান্তই মন্দ হয়, তোমার ঘরের বিমলাকে কি তুমি এতটুকু শিক্ষাও দেও নাই যাহাতে সে ফিরিয়া আসিতে পারে? যদি না ফিরিয়া আসে? এতটুকু ভরসা যার উপরে তুমি রাখ নাই, তাহাকে লইয়া ঘর করিবে কেমন করিয়া? নিষেধে? শাসনে? গঞ্জনায়? এইরূপে একটি জাতিকে ঠিক রাখিবে? সম্ভব হয় রাখ। শাসন করিয়া, নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাইয়া কে কাহাকে বশে রাখিতে পারে? একটা জাতিকে? পাগল! যে জাতি উন্মুক্ত উদার বাহিরের স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে? চেষ্টা কর।

কিন্তু ঠিক জানিও, বিমলার স্বামী নিখিলেশ হইলেই তবে বিমলা ঘরে ফেরে, নহিলে বিমলা ফিরিলেও পাততা হয়! অমন বিমলাও! আর মনে রাখিও, যদি দেশের উন্নতি সম্ভবপর হয়, তুমি সমাজ, বিলাত-ফেরৎ বলিয়া যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহাদের দ্বারাই হইবে। তোমার তাম্রকূটধ্বংশপরায়ণ চণ্ডীমণ্ডপাধিষ্ঠিত আর্য্যবংশ-ধরদিগের দ্বারা নয়! আর বাহিরকে অগ্রাহ্য কর তুমি, যাহার দৌলতে তুমি বাঁচিয়া আছ, যাহার বস্ত্রে তুমি লজ্জা নিবারণ কর, যাহার আলোয় তোমার দীপ জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথ কবি,—তাঁহাকে ঋষি না বল তোমার ঋষিরা শাস্ত্র লইয়া বাঁচিয়া থাকুন—তিনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি; বঙ্গদেশকে বিধাতার এক অমূল্য দান, বাল্যে যাঁহার চিত্ত বাহিরের জন্য আকুল হইয়া-

ছিল, এবং যিনি সেই বাহিরের আলো-বাতাসের সংবাদ তোমার অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বারের কাছে আজীবন গাহিয়াছেন, তুমি তাঁহার সঙ্গীত বুঝিতেছ না, তাঁহাকে দূরে রাখিতেছ! ইচ্ছা করিয়া যদি প্রতারিত হইতে চাও, হও; সেও ভাল,—যদি কোনও দিন অনু-তাপের দিন আসে! অহমিকার বিষে জর্জ্জরিত তোমরা, এই কাবকে চিনিলে না!

৵দ্বিজেন্দ্রলালকে তোমরা বাহবা দিয়াছ, অথচ তাঁহার কথা তোমরা বোঝ নাই! আর ইঁহার কথাও তোমরা বুঝিতেছ না। মুক্তির বাণী কি তোমাদের কাছে এতই দুর্ব্বোধ্য! নিজের পায়ের শিকল চিনিতেও কি তোমাদের এত দেরী হয়? সত্যই তাহা হইলে, দাসত্বের জন্য এমন উপযুক্ত জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

যদি স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে, তাহার অভাব বোধ করিতে, তাহা হইলে কবির "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" দেশের বালক-বৃদ্ধের হাতে দেখিতাম! কেবল ঐ একটি প্রবন্ধ হাতে লইয়া একটি জাতি মুক্ত হইতে পারে,—যদি সে মুক্তি চায়! কিন্তু দেশের এমনি অদৃষ্ট, ঐ প্রবন্ধেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে! ঐ প্রবন্ধের লেখকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও কেহ কেহ গভীর সংশয় প্রকাশ করিতেছেন! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে?

শ্রীঅরবিন্দ সেন।

মাঘ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৭৪

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শক্তিমানের ধর্ম্ম।

—ঃ০ঃ—

"সদর বড় না অন্দর বড়?"—"মানুষের বাহিরটা বড় না তার ভিতরটা বড়?"—এই হচ্ছে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এই দুটোর মধ্যে আসল তর্কটা। হিন্দুর পক্ষে কি তার রাষ্ট্রীয় অবস্থা, কি তার সামাজিক ব্যবস্থা এ দুটোর কোনটাই যে বর্ত্তমানে তেমন মোলায়েম নয় তা রবীন্দ্রনাথও বলেন আর বিপিন বাবুও মানেন—কিন্তু যত মতভেদ সে শুধু এর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে—cause ও affect নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—সমাজটা হচ্ছে ঘোড়া আর রাষ্ট্রটা হচ্ছে গাড়ী। এই সমাজ-ঘোড়া বলিষ্ঠ ও মুক্ত না হলে' সে ঐ রাষ্ট্র-গাড়ীকে টান্‌তে পারবে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Oh no, I beg your pardon that is—রাষ্ট্রটাই হচ্ছে ঘোড়া আর সমাজটা হচ্ছে গাড়ী—রাষ্ট্র-ঘোড়া শক্ত না হলে সমাজ-গাড়ী চিরকাল তক্তা হ'য়েই কাল কাটাবে।

রাষ্ট্রের তুলনায় মানুষের সমাজটা তার অন্দর। আবার সমাজের তুলনায় মানুষের মনটা তার অন্দর। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—এই মন-অন্দরের উপরে আমরা শত সহস্র নিষেধের ঘোমটা টেনে দিয়ে, অক্ষমতার সুতোয় বোনা এমনি কালো পুরু আরামের পর্দ্দা টাঙিয়ে দিয়েছি যে রাষ্ট্রের মুক্ত হাওয়া আর সেখানে আস্‌তে পারছে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Fiddlesticks—বাজে কথা। রাষ্ট্রের হাওয়াটা এসে পড়ুক ও ঘোম্‌টা টোম্‌টা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই মতভেদের মূলে একটা philosophy-র ভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—মানুষের ভিতরটা দিয়ে তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর বিপিন বাবু বল্‌ছেন—মানুষের বাহিরটা দিয়েই তার ভিতরটা গড়ে' ওঠে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আত্মাটা আমাদের দেহটাকে গড়ে' তুলেছে। অপরপক্ষে বিপিন বাবুর মতে আমাদের দেহটাই আমাদের আত্মার জন্ম দিয়েছে। এ মত শুনে হিন্দু-দর্শনের প্রতি যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তারই চক্ষুস্থির হবে নিশ্চয়। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এ দুটোর আসল অমিলটা হচ্ছে ঐ গোড়ার কথায়।

রবীন্দ্রনাথ আমরা আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে দায়ী কর্‌তে চান আমাদের নিজেকে। আর বিপিন বাবু তার জন্যে দোষী করতে চান মহম্মদ গজনি সাহেব ও জন্ কোম্পানীকে। এই নিয়েই ত তর্ক।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী গত শ্রাবণের "সবুজ পত্রে" "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে উদ্ভিদ পশু আর মানুষ এ তিনের তিনটী পৃথক বিশেষ-ধর্ম্ম আছে। উদ্ভিদের স্থিতি—পশুর গতি—আর মানুষের মতি। উদ্ভিদসম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, "উদ্ভিদ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না জোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে' শুকিয়ে মরতে বাধ্য।" বিপিন বাবু আমাদের এই উদ্ভিদের ক্যাটিগরিতে ফেলতে চান। এতে আশা করি নব্য বাংলার অন্ততঃ নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের অনেকেই মনে মনে আপত্তি করবেন।

(২)

বিপিন বাবু একজন সুতার্কিক। কিন্তু তিনি তাঁর মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে যে-সব প্রমাণ দাখিল করেন সে-সব প্রমাণেরি আড়াল থেকে অনেক সময় একটা unconscious humour উঁকি মারতে থাকে। কারণ তিনি যে-সব প্রমাণ দিয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে চান—ঠিক সেই সব প্রমাণ দিয়ে তার উল্‌টো সিদ্ধান্তটাও সমর্থন করা যায়। কারণ প্রমাণের আসল মজাটা ত প্রমাণের মধ্যে নেই—সেটা আছে তার প্রয়োগের বাহাদুরীতে। বিশেষতঃ প্রমাণ জিনিসটীর মতো মুক্তজীব এ জগতে আর দুটী নেই। প্রমাণ ঐতিহাসিক ঘটনার পোষাক পরে' ভারী ভারী বড় বড় চিন্তার আশা-শোটা কাঁধে চড়িয়ে যে-কোন সত্য-মহারাজের পাছে পাছে একই রকম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চলে—আজকার সত্য-মহারাজ যদি কালকার সত্য মহারাজের ঘোর বিরুদ্ধও হয়, প্রমাণ-আরদালীর তার প্রতিও সমান খাতির। তাই বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের পিছনেও প্রমাণ, শঙ্করের মায়াবাদের পিছনেও প্রমাণ, আবার চৈতন্যের ভক্তিবাদের পিছনেও প্রমাণ। এই প্রমাণের যখন এমনি জোর তখন আমরা বিপিন বাবুরই দেওয়া প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতটাও যে কি করে' সমর্থন করা যায় তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

বিপিন বাবু লিখছেন—সে লেখার ক্রিয়াপদগুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে ও জায়গায় জায়গায় দু একটী শব্দ বসিয়ে হুবহু তুলে দিচ্ছি—বিপিন বাবু লিখছেন যে—

• চৈতন্যদেব স্পষ্টভাবে ভগবান ভাষ্যকারের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করে' পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলে'

প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসার-জীবনে এই মারাত্মক মায়ার হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, বৈষ্ণবগুরু করল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়ল; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে ধর্ম্মের প্রেরণায়, মুক্তি কামনায়, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখে আঁকড়িয়ে ধরতে পারল না। এরা ভগবান মানল; ভগবতীলীলার কথা কইতে লাগল; ক্ষণজন্মা সাধু মহাজনেরা ভগবতী-তনু লাভ করে' ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভগবতীলীলার অনুসরণ করতে পারেন এও বিশ্বাস করল; কিন্তু তবু এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হচ্ছে * * * * এ সব কথা ধরতে ও বুঝতে পারল না।"

তারা আবার ঘুরে ফিরে "মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক বা অলীক বলে' উপেক্ষা করে' আসছিলেন" ঠিক তেমনি করতে লাগল।

এই কি একটা মস্ত প্রমাণ নয় যে সত্য কাউকে হজম করিয়ে দেওয়ার শক্তি মহাপুরুষেরও নেই, যদি না তার সে সত্যকে হজম করবার শক্তি থাকে? যে সত্য মানুষের অন্তরে সত্য হ'য়ে না উঠেছে সে সত্য তার বাহিরে ব্যর্থ হবেই? কিন্তু বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্তরের ঐ সত্য বাহিরে আপনাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারে নি। সত্যের এক নূতন মূর্ত্তি বটে! যে সত্য শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ভেঙে শত সহস্র বিপদ আপদের মাঝ দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে না পারে সে সত্য কেমন সত্য? যে সত্য কাজীর ভয়েই মুর্চ্ছা যায় সে সত্য কেমন সত্য? সত্যকে কি আমরা

এই রকম বলেই জানি! মানুষের রক্ত মাংস ত্বকের চাইতে—মানুষের জীবনের চাইতে যে মানুষের সত্য বড়—এটা ত জগতের শত সহস্র সত্যসন্ধ লোকের জীবনে কত শতবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। অথচ বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে বৈষ্ণবদের ভিতরের সত্য বাহিরের চাপে আর ফোটারই সুযোগ পেলে না। আসল কথাটা কি এই নয় যে—বৈষ্ণবদের অন্তরে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সত্য হয়ে উঠলে বাহিরের চাপে সেটা আরও দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত সুপ্ত হয়ে পড়্‌ত না কিছুতেই। সত্য কথা এই যে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিণাম-বাদের যে শিক্ষাই দিন না কেন তা তাঁদের অন্তরে সত্য হয়ে ওঠে নি—সে শিক্ষার মন্ত্র মুখে আওড়ালেও অন্তরে তাঁরা সেই শঙ্করের মায়াবাদেরই জের টেনে চলেছিলেন। কাজীর চাপ একটা excuse মাত্র—এই excuse-কে নিমিত্ত, করে' যেটা ছিল তাঁদের পক্ষে আসল সত্য, মায়াবাদ, সেইটেই তাঁদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই excuse-এর উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি মেলে। যেমন সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমরের একটা excuse।

বিপিন বাবু রাষ্ট্রীয়-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথের কথা তুলেছেন—কিন্তু ভিতরের পথ সত্য হয়ে না উঠলে যে বাহিরের পথ অপথই থেকে যায় তার উদাহরণ আছে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসে। রাষ্ট্রীয়-জীবনে ত তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দিব্যি পরিষ্কার হয়েছিল—কিন্তু হিন্দুরা সে পথ ধরে' চল্‌ল না কেন? কারণ হিন্দুদের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্য হয় নি বলে'। কিন্তু বিপিন বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য ইংরাজই সব মাটী করেছে—ইংরাজ না থাকলে

নিশ্চয়ই হিন্দুরা আপনার অধিকার পেয়ে যেত। এ হচ্ছে সেই ছেলের মত কথা যে বাপকে এসে বলেছিল—"বাবা আমি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছি।" ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্বন্ধে পিতার চির-দিনই একটু সন্দেহ ছিল তাই জিজ্ঞেস করলেন—"ক্লাসে ছেলে ক'জন রে?" ছেলে প্রসন্নমুখে উত্তর দিল—"দু'জন।" কিন্তু সত্যকথা এই নয় কি যে ইংরাজ না থাকলে বাংলার মসনদ অধিকার করে বসত ফরাসীরা,—ফরাসীরা না হলে পর্ত্তুগীজরা, পর্ত্তুগীজ না হলে, দিনেমার ওলন্দাজ আলেমান, যে হোক্ আর কেউ, বসৃত না কিছুতেই যারা, সে হচ্ছে উমিচাঁদ, রাজবল্লভ কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্র।

বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের পর যখন রাষ্ট্রে গনতন্ত্রতার প্রভাব বৃদ্ধি হল তখন থেকে ইয়োরোপে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছে। একেই ইংরেজিতে বলে—Putting the cart before the horse, আসল কথা হচ্ছে যে মানুষ কতকটা অন্তরে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল বলেই, মানব-সভ্যতার নবযুগ ইয়োরোপের মনে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই, পরে তা ইয়োরোপের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "Liberté, egalité, fraternité" সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র ফরাসীজাতির অন্তরে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলে'—এ মন্ত্রের বলে' এ সত্যের পরিপন্থী অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতসম্প্রদায় ভেসে গেল। এই হ'চ্ছে ও-ব্যাপারের আসল psychology—অন্ততঃ আমার ত সেইরকমই মনে হয়। কারণ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আত্মাটাই মানুষের দেহটাকে গড়ে তুলেছে। আর আজ এই Capital ও Labour-এর মারামারির দিনে এই সত্যটা মনে রাখা ভাল। বিশেষতঃ যখন বীজ আগে না বৃক্ষ আগে—

ডিম আগে না মুরগী আগে—গৌড়ীয় ভাষায় "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলধার পাত্র" এ তর্কের শেষ এ জগতে কোন দিন হবার আশা নেই।

(৩)

প্রকৃত ঘটনা এই যে, বুদ্ধিমানের কর্ম্মে আর শক্তিমানের ধর্ম্মে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এদের দুজনের চলার ভঙ্গীই আলাদা। বুদ্ধিমান চলে পিঠ বেঁকিয়ে—আর শক্তিমান চলে বুক ফুলিয়ে। তার কারণ হচ্ছে এই যে এই দুজন এ জগতটাকে দেখে দুরকম। দুজন ত একই জগতে বাস কর্‌ছে। তারপর যদি কেউ বুদ্ধিমান আর শক্তিমানের চোখ পরীক্ষা করে' দেখেন তবে দেখ্‌তে পাবেন যে তাদের দু'জনের চোখ এক রকম উপাদান দিয়েই তৈরী। এ সত্বেও দু'জন একই জিনিসকে দু'রকম দেখে কেন? কারণ তাদের দু'জনের মন দু'রকম। অর্থাৎ তাদের ভিতরটা এক নয় বলে'। আর বাহিরটা ভিতরটারই প্রতিবিম্ব—অর্থাৎ Reflection.

বুদ্ধিমান মনে করে যে সে যে বেঁচে আছে সেটা কেবল তার বুদ্ধির জোরে, নইলে আকাশের মঘা থেকে আরম্ভ করে' দেয়ালের টিক্‌টিকীটা পর্য্যন্ত ত তাকে মারবার ফন্দিতেই ফিরছে! তাই তার সারা জীবনটা মরণটাকে ফাঁকি দেবার ফিকির কর্‌তেই কেটে যায়। আর শক্তিমান মনে করে যে একবার যখন সে জন্মেছে তখন বেঁচে থাকাটা তার হক্ Birth-right, আর বলে যে যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন পৃথিবীটাকে কসে' বুঝিয়ে দেব যে বেঁচে আছি। শক্তিমান বলে—মঘা টিক্‌টিকী আমাকে মার্‌তে পারে কিন্তু আমাকে ছোট কর্‌তে পারে না। তাই

শক্তিমান সহস্রবার মর্‌তে রাজি কিন্তু একটী বারও ছোট হ’তে রাজি নয়।

তাই বুদ্ধিমানের নৌকা যখন ডুবল তখন সে প্রচুর গবেষনা করে বের কর্‌লে যে মঘা-নক্ষত্রে নৌকো ছাড়া হয়েছিল বলেই তার নৌকো ডুব্‌ল। তারপর থেকে সে নৌকো ছাড়্‌তে লাগ্‌ল মঘাকে পেরিয়ে। শক্তিমান বল্‌লে যে—মঘা যদি আমার নৌকো ডুবিয়ে থাকে তবে এমন নৌকো তৈরী কর্‌ব যে অন্ততঃ চার শ’ মঘার দরকার হবে সে নৌকাকে ডোবাতে। তাই বুদ্ধিমানের নৌকো আজও পাল তুলেই আর গুণ টেনেই চলছে—কিন্তু শক্তিমানের নৌকো আজ যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে তার পিতৃপিতামহের নৌকোর প্রকারগত সাদৃশ্য থাক্‌লেও আকারগত সাদৃশ্যও নেই আচারগত সাদৃশ্যও নেই।

যখন প্রথম এরোপ্লেন নিয়ে experiment আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্সে যে সেই ব্যাপারে কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। কেউ বা দু’শ হাত কেউ বা চার শ’ হাত—কেউ বা হাজার ফিট দু’হাজর ফিট চার হাজার ফিট ওঠে—তারপর এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন সমেত মানুষ ধরাশায়ী—তারপর মৃত্যু—বিশ্রী রকমের সে মৃত্যু! ফ্রান্স যদি অতিরিক্ত পরিমাণে বুদ্ধিমানের দেশ হ’ত তবে ঐ রকমের দু’এক জনের মৃত্যুর পর নিশ্চয় এরোপ্লেনকে নিজের পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা দেখ্‌তে হত। সঙ্গে সঙ্গে এমন শ্লোকও রচনা হ’য়ে যেত, যাতে স্পষ্ট করে’ লেখা থাক্‌ত যে আকাশে ওঠাটা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এমন ভাষ্যকারেরও আমদানী হ’ত, যিনি স্পষ্টতর করে’ বলে দিতেন যে ঐ শ্লোকের অর্থই হচ্ছে এই যে যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঊর্দ্ধতন

সাড়ে সাতাত্তর পুরুষের গতি হবে রৌরবে—আর বুদ্ধিমান স্পষ্টতম করে' দেখ্‌তে পেত যে তাদের মতো বুদ্ধিমান আর দুনিয়ায় দুটী নেই। কেবল তাই নয়। কেউ কেউ আবার যৌগিক বলে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করে' এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেত যে আকাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বসে' রয়েছে, যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে। আর তারপর যদি ঐ উপরি-উক্ত শ্লোকটী অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়—তবে ত পোয়াবার। বুদ্ধিমান তখন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে দিব্যি আরামে ঐ শ্লোক আওড়িয়ে সেই বিরাট দৈত্যকে একটা ভরাট নৈবেদ্য দিয়ে পূজা কর্‌তে লেগে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌ত যে এ পৃথিবীতে সূক্ষ্মদৃষ্টিটা তাদের কপালেই খালি মিলেছে।

কিন্তু ফ্রান্স শক্তিমানের দেশ। তারা দু'দশ জনের মরণটাকে কেয়ারই কর্‌লে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে যত দিন যেতে লাগ্‌ল সেই দৈত্যটার মানুষের ঘাড় মটকাবার ক্ষমতাটা তত কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে যখন শ'চার পাঁচেক মানুষের জীবন দিয়ে এরো-প্লেন্‌টার পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তখন দৈত্যটাও একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চার শ' ফরাসী মরে' চার কোটী ফরাসীকে বাঁচিয়ে গেল। মানুষ মর্‌ল বটে কিন্তু মনুষ্যত্ব বেঁচে গেল।

এখন বুদ্ধিমানের হাজার সূক্ষ্মদৃষ্টি সত্বেও যে জিনিসটা সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ যে চার পাঁচ শ' লোক মর্‌ল ওরা ও-রকম গোঁয়ার্ত্তুমি করে' মর্‌তে গেল কেন? তাতে তাদের কি লাভ? উত্তরমেরু আবিষ্কার নাই বা হ'ল?—তার আসল কেন্দ্রটা জ্যামিতিক ম্যাপের হিসেবে ঠিক নাই বা জানলেম—তাতে ক্ষতিটা কি? এ কি রকম মানুষের আজগুবি সখ! এই যে বুদ্ধিমান

শক্তিমানকে বুঝ্তে পারে না তার কারণ হচ্ছে যে তাদের দু'জনের অন্তর এক নয়। শক্তিমান নিজের অন্তরে যে প্রাণের স্পন্দন অদম্য বেগে পাচ্ছে, বুদ্ধিমান তা পাচ্ছে না। অন্তরের এই পার্থক্যের জন্যই তাদের বাহিরেও কর্ম্মের এই পার্থক্য দাঁড়েয়ে যায়। কারণ মানুষের বাহিরের কর্ম্ম তার অন্তরের ধর্ম্মেরই অনুবাদ—অর্থাৎ translation.

বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরে এই যে পার্থক্য—এ পার্থক্যের আসল নিগূঢ়তম কারণটী কি? এ সম্বন্ধে যা বুঝি সেটা বল্‌ছি।

(৪)

সৎ, চিৎ, আনন্দ—এটা হচ্ছে মানুষের কথা। ভগবান যদি দর্শন লিখ্‌তে বসে' যেতেন তবে তিনি ঐ ফরমূলাকে উল্‌টে দিয়ে লিখ্‌তেন—আনন্দ, চিৎ, সৎ। কারণ গোড়ার কথা আনন্দ—তারপর শক্তি—তারপর সৃষ্টি। আনন্দ থেকে প্রকাশ হয়েছে শক্তি—শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি। এই হচ্ছে সৃজনলীলার মূলতত্ত্ব। আর মানুষের জীবনেও এই তত্ত্বই কার্য্যকারী হ'য়ে রয়েছে। শক্তিমান ও বুদ্ধিমানের নিগূঢ়তম প্রভেদটা হচ্ছে ঐ আনন্দ নিয়ে। শক্তিমানের অন্তরে আনন্দ আছে—বুদ্ধিমানের তা নেই। অন্তরে ঐ আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান তার বেঁচে থাকার মধ্যে অমৃত পায়। বুদ্ধিমানের ঐ আনন্দ নেই বলে' সে তার বেঁচে থাকার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় আরাম। এই যে জীবনের আনন্দ—বেঁচে থাকার আনন্দ—এই আনন্দের রীতিই হচ্ছে গতিতে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—রস থেকে রসান্তরে—এক কথায় এই আনন্দের

ধর্ম্ম হচ্ছে Multiplication—Subtraction নয়। সেই জন্যে এই আনন্দ প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' শক্তিমানের যে মানসিক ভাব দাঁড়ায় সেটা বাংলায় তর্জ্জমা কর্‌লে কতকটা দাঁড়ায় এই রকম—

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধা বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি স্বজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

এই যে, দেখা, খোঁজা—তাতে শক্তিমান যাই পাক্‌, এই যে ভাঙা গড়া তাতে শক্তিমান যাই গড়ে' তুলুক—তাইই তাকে সার্থকতা মিলিয়ে দেয়—কারণ জিনিসের সার্থকতা ত জিনিসের মধ্যে নেই আছে তা মানুষের অন্তরে। বেঁচে থাকার এই আনন্দের জন্যই শক্তিমান উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে ছোটে—এমন কি নিশ্চিত মরণও তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। কারণ আনন্দ যেখানে আছে মরণও সেখানে অমৃতময় হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই ইয়োরোপ অদম্য ভোগের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েও মরতে ভয় পায় না—কিন্তু আমরা

জীবনটা নশ্বর নশ্বর করে' কাটিয়েও টিক্‌টিকিটীকে পর্য্যন্ত সমিহ্ করে' চলি। অন্তরে এই আনন্দ আছে বলে' শক্তি-মান এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে ওঠে। তা সে মরুকই আর বাঁচুকই। এই যে সে এরো-প্লেনে ওঠে সেটা সে কর্ত্তব্য বোধে করে না—তার জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় বলে' করে না। ও-সব হচ্ছে পাটোয়ারী বুদ্ধির লাভ ক্ষতির হিসেব। লাভ ক্ষতি একটা accident মাত্র'। আসল কথা হচ্ছে তার অন্তরের ঐ আনন্দ। কর্ত্তব্য-বোধে শ্রেয় জ্ঞানে মানুষ যা করে তা সে দু'দিন কর্‌তে পারে, কিন্তু চিরকাল পারে না। কারণ যেখানে শুধু কর্ত্তব্য সেখানে কেবল দাসত্ব। যতদিন না শ্রেয়টা মানুষের জীবনে প্রেয় হ'য়ে উঠেছে, যতদিন না মানুষের কর্ত্তব্য তার অন্তরের আনন্দ নিয়ে অমৃতময় হয়ে উঠেছে—ততদিন মানুষের জীবন ব্যর্থই হবে—তার ভিতরেও বাহিরেও। এই জন্যই বুদ্ধিমান শক্তি-মানের উত্তরমেরু আবিষ্কার বুঝ্‌তে পারে না। তার "গোঁয়ার্ত্তুমি" "আজ্‌গুবি" সখের" মানে অভিধান খুলেও পায় না—পঞ্জিকা খুঁজেও পায় না।

এই যে আনন্দ—এটা মানুষের অতি সহজলভ্য। তেমনি সহজ-লভ্য যেমন সহজলভ্য তার নিশ্বাস নেবার বাতাস। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সর্ত্তই হচ্ছে এই যে, সে ভগবানের জগত-লীলায় সঙ্গী হয়ে থাক্‌বে যদি ভগবান তার অন্তরের জীবন-দেবতাকে আনন্দময় করে' রাখে। মানুষ যখন তার এই অন্তরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন ভগবানকে সে নোটিশ দেয়—বলে—ভগবান চল্লেম আমি তোমার এই জগৎ থেকে। তখন সে মায়াবাদ প্রচার কর্‌তে লেগে যায়—; নির্ব্বাণ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। কেউ কেউ আবার কতগুলো

অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই আনন্দকে ধর্‌তে চায়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোরই আমরা নাম দিয়েছি—হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জোরে ফুর্ত্তি করে' বেড়ান এক কথা আর বোতল বোতল "এসেন্স অফ নিম" খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা আর এককথা।

এই হচ্ছে বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরের পার্থক্যের নিগূঢ়তম কারণ। শক্তিমানের জীবনে বেঁচে থাকার যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আছে—বুদ্ধিমানের তার অভাব। ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান হয়েছে—আর ঐ আনন্দকে বুকে করে' শক্তিমান শক্তিমান। বলা বাহুল্য আমরা এই বুদ্ধিমানের দলের লোক—আর বর্ত্তমান ইয়োরোপ শক্তিমান লোকের দেশ।

(৫)

এখন আমাদের এই গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌তে হবে, আগা থেকে নয়। কারণ কেউ কোনকালে ছাদ থেকে আরম্ভ করে' কোন ইমারত খাড়া করে' তুলেছে এ-খবর কোন দেশের বা কোন জাতির ইতিহাসেই আমরা পাই নি। যতদিন না আমাদের জীবন-দেবতার মন্দিরে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠবে ততদিন আমরা আমাদের বাহিরের কিছুকেই সত্য করে' পাব না—আর যেটাকে সত্য করে' পাব না সেটা আমাদের বোঝা হয়েই উঠ্‌বে। আর আমরা যে যে-কোন বোঝাকে মন্ত্র পড়ে' শূন্য দিয়ে গুণ করে' নির্ব্বাণ পাইয়ে দিতে পারি তার প্রমাণ আমাদের জাতীয় জীবনের "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে"র দর্শনের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে' লেখা আছে।

তাই প্রথমে আমাদের মানুষকে গড়ে' তুল্‌তে হবে। মানুষের মন

তৈরী কর্‌তে হবে—রাজনীতিকে নয়। কারণ মানুষই রাজনীতি গড়ে' তোলে—রাজনীতি মানুষ তৈরী করে না। নইলে ঘটনাক্রমে যদি বা আমরা স্বায়ত্ব-শাসন পেয়েই যাই তবে আমরা সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতোই করব। হয়ত আমরা দু'দিন বাদে আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার মজ্‌লিসে খোলকর্‌তাল নিয়ে হরিসংকীর্ত্তনের আখ্‌ড়া খুলে বস্‌ব।

অবশ্য বিপিন বাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিন্দুর যখন নৌবাহিনী গড়ে' উঠবে তখন আর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে না। যেন সমুদ্রযাত্রাটা কেবল জলযুদ্ধ করবার জন্যেই দরকার—যেন এর আর কোন প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যেটা নিষ্প্রয়োজনে করবার হুকুম নেই—মানুষ চিরজীবন ভরে' যেটা এড়িয়ে চলেছে—সেটা যে একদিন সে প্রয়োজনের তাগিদে এক লাফে করে' ফেলবে—তা খালি রূপ-কথার দেশেই সম্ভব—রক্তমাংসের দেশেও সম্ভব নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশেও সম্ভব নয়। কিন্তু যা হোক্ এখনও বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন যাঁদের অন্তর বিপিন বাবুর ঐ আশ্বাস-বাণী শুনে চম্‌কে উঠবে। তাঁদের সান্ত্বনার জন্যে বল্‌ছি যে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। যতদিন সমুদ্রযাত্রার নাম শুনে তাঁদের অন্তর এমনি চম্‌কে উঠবে ততদিন হিন্দুর নৌবাহিনী গড়ে' ওঠবার কোন সম্ভাবনারও সম্ভাবনা নেই। আর যদি বা জন কয়েক স্বধর্ম্মদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীনের বিশ্বাসঘাতকতায় কোন নৌ-বাহিনী সত্য-সত্যই গড়ে' ওঠে তবে সে জন কয়েকের ছায়ায় পুরুষের সাধ্য হবে না যে তাঁদের মধ্যে কাউকে সেই নৌ-বাহিনীর এ্যাড্‌মিরাল্যালের পদে অভিষিক্ত করা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সুর ও তাল।

-ঃ*ঃ-

"সঙ্গীতের মুক্তিতে" আনাড়ি-গায়কদলের রাস্তা যখন খুলে দেওয়া হল, তখন ভেবে দেখা উচিত ছিল যে অবশেষে তাল সামলে ওঠা দায় না হয়ে পড়ে। রাস্তা যখন খুলেছে, তখন আর তারা বাগ মানে না। ওস্তাদ-ভীতিটা এতদিন বুকের উপর ঠাণ্ডা পাথরের মত চেপে ছিল ;—আনন্দের দু' একটা তপ্ত উচ্ছ্বাস বের হবামাত্র সে পাথরের সংস্পর্শে এসে condensed হয়ে ফিরে আসত। পাথর যখন অপসারিত হল, তখন উচ্ছ্বাসগুলি বাধামুক্ত ; তপ্ত বলেই তাতে কোনো ভয় নেই, কেননা আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব অনুসারে তপ্ত জিনিস disinfected।

ওস্তাদী গানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ কলা হিসাবে ওর সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক,—কৌশল হিসাবে যে রয়েছে, তা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে। লেখকের ভাগ্যে যে দু' একজন বড় ওস্তাদ-দর্শন ঘটেছে, তা হতে, তাঁরা যে অসামান্য অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিতে পারি। "ওস্তাদ-দর্শন" বাক্যটি বাধ্য হয়েই লিখতে হল; তার কারণ, তাঁদের গানের চেয়ে অঙ্গচালনা তাঁদিগকে কম বিশিষ্টতা প্রদান করে না। উৎকটধ্বনি নির্গমনের নিষ্ফল চেষ্টায় হস্তের সঙ্গে কর্ণের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় এঁরা বেশ উদগ্রভাবেই দিয়ে থাকেন ; তা হতে এরূপ

অনুমান করা সম্ভবত নিতান্ত অসঙ্গত হবে না যে, কর্ণরন্ধ্র বন্ধ হবার অনুপাতে গীতিকৌশল স্ফুর্ত্তি লাভ করে। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মিলন, মুখ-গহ্বরের আকুঞ্চন, গ্রীবা সঞ্চালন প্রভৃতি—অর্থাৎ মুদ্রাদোষ—ওস্তাদের শাশ্বতরূপ বল্লেই হয়। কিন্তু ওস্তাদের কাছে আসল ভয়টা হচ্ছে তালকাটার ভয়। হাঁটুতে আর আকাশে চপেটাঘাত করে করে কাল কাটালেও, তালকাটা হতে অব্যাহতি লাভ ঘটে উঠতে চায় না।

সঙ্গীতসম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে, তাল জিনিসটা কি, তা সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। যাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে কাওয়ালি তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। আবার একতালাও তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। এতৎ সত্ত্বেও যে দুটিকে দুটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, তার কারণ তাদের মাত্রা। কাওয়ালী ষোল মাত্রা এবং একতালা বারো মাত্রার তাল। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

কাওয়ালী।

```
          ২              ৩            •
জা নি | জা ০ নি ০ | কো ন্ আ দি | কা ০ ল হ |
 ১            ২              ৩             ০
| তে ০ ভা সা | লে ০ আ মা | রে ০ জ গ | তে ০ র স্রো | তে ০
```

ইত্যাদি।

একতালা।

```
     ১          ২         ৩ °        ০          ১
আ ॥ মার এ ই | যা ০ ত্রা | হ ল ০ | সু রু ০ | ০ এ খন |
```

ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে কাওয়ালীতে প্রত্যেকটি টুকরা চার মাত্রা এবং একতালায় তিন মাত্রায় বিভক্ত।

অতঃপর লয়। তালের মারপ্যাঁচ "লয়" জিনিসটি নিয়ে। কোনো বিশেষ মাত্রা আপেক্ষিক ভাবে বিলম্বিত বা দ্রুত হবার উপর লয় নির্ভর করে।

বলা বাহুল্য তাল জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে সুর-নিরপেক্ষ। যেমন তালে পা ফেলা চলে, এমন কি তালে কথা বলা, কান্নাও সম্ভবে। গ্রামোফোনে সাহেবের যে উৎকট হাসিটা প্রায়ই শোনা যায়, তাও তালেই হাসা হয়েছে।

তাল যে শুধু সুর-নিরপেক্ষ, তা নয়—ধ্বনি-নিরপেক্ষও বটে। গানের বৈঠকে সমজ্‌দারদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করে গ্রীবা সঞ্চালন দ্বারা তাল দিতে প্রায়ই দেখা যায়। হস্তচালনা দ্বারাও তাল দেওয়া চলে। এক কথায় তালের জন্য গতি আবশ্যক। তাল ও সুরের সম্বন্ধ বিচার করাই আমার উদ্দেশ্য।

(২)

রাগিণী ও সুর—এ দুটি শব্দ সঙ্গীতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত। মানুষের মুখাবয়বের সঙ্গে মুখভাবের যে সম্বন্ধ, রাগিণী এবং সুরেতেও সেই সম্পর্ক। রাগিণীকে গানের আকৃতি এবং সুরকে তার প্রকৃতি বলা যেতে পারে। রাগিণীর সাহায্যে দশজনের ভিতরে গানের মুখ চিনে নিতে পারি, আর সুরের সাহায্যে বুঝতে পারি তার বেদনা--পুলক-বেদনা, ব্যথা-বেদনা, কিম্বা অন্য কোন বেদনা।

সেইজন্য সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগরাগিণীর ঠাট নির্দ্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে; বর্জ্জনীয় অবর্জ্জনীয় পর্দ্দাগুলি এমনি কড়াক্কড়ভাবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে যে, তার সীমা লঙ্ঘন করেছ কি গান 'মার্ডার' করেছ!

রাগিণী বেচারী বড়ই ভালমানুষ। সে যেন সঙ্গীত-রাজ্যের ভূগোল। সে জায়গার শুধু একটা নাম। অবশ্য প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক রাগিণীর একটা বিশেষ চেহারা আছে। কোনোটি পর্ব্বতে অরণ্যে বন্ধুর, কোনোটিতে শুধু একটানা রাস্তা; আবার কোনোটিতে প্রভাত তার স্বর্ণ-অর্ঘ্য নিয়ে প্রতিদিন এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, কোনোটিতে বা সূর্য্যাস্তের বিচ্ছুরিত ম্লান স্বর্ণ আভা হৃদয়ের অন্তস্তলে অব্যক্ত বেদনা রেখে ধীরে ধীরে নিভে যায়।

দেশ ও কাল—এ দুয়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা কালের সঙ্গে রাগরাগিণীর ঘনিষ্ঠতার কথা বারবার বলে গেছেন। বিহগের কাকলির সঙ্গে রামকেলী, মধ্যাহ্নে সারঙ্গ, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে পূরবী, শুদ্ধরাত্রে বেহাগ। কিন্তু দেশের সঙ্গে গান যে একেবারে সম্পর্কশূন্য, এরূপ ত মনে হয় না। যেমন বাগেশ্রী;—গভীর অরণ্য-সমাকীর্ণ দিগন্তবিস্তৃত বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী কিম্বা উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের কুলই বাগেশ্রীর প্রশস্ত ক্ষেত্র। বাগেশ্রীর উদাত্ত, অনুদাত্ত অভ্রভেদী স্বরিত যেন তরঙ্গিয়া চলিয়াছে—

দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তার শেষপ্রান্তে উঠি আপনার,
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার।

আবার পুরবীর দেশে যখন 'নামল ছায়া ধরণীতে', তখন ঘাটের বধূ বল্‌ছে—

জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।

* * * *

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানিনা আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

আর সজলমেঘভারাক্রান্ত আকাশের নীচে মল্লারের পুলক সেই-খানে, যেখানে—

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কুলে কুলে।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেশ ও কালের অতীত নয়,—কাল ও দেশের বাইরে নয়। শঙ্কা হচ্ছে কথায় কথায় category-র রাজ্যে গিয়ে পড়্‌ব। দর্শনশাস্ত্রে দেশ ও কাল—এই দুই category নিয়ে যে কিরূপ কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে, তা দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে গোটা গোটা কেতাব লেখা হয়ে গেছে। ইদানীং ফরাসী দার্শনিক Bergson, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত-বোধের—অর্থাৎ সময়বোধের—কতকগুলি আশ্চর্য্য যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে সকলকে কিছু ঠাণ্ডা করেছেন। যাক্ ওসকল অবান্তর কথা। আমরা সাদা চক্ষু মেলে দেশ ও কালের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, দেশ ও কাল পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করেই রয়েছে। দেশের অস্তিত্বই

কালের লীলা সম্ভব করছে, এবং দেশের বৈচিত্র্যও কালেই সংঘটিত হচ্ছে। অতএব নীপের বনে যে মল্লারের পুলক, সেটা বর্ষাকাল বলেই হচ্ছে,—তা না হলে পুলকভরা ফুল ফুটত না। বস্তুতঃ, দেশই বল, কালই বল,—উভয়ের অস্তিত্বই সেই লোকে, যাকে নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে "Universe of thought"; কেমনা এই দৃশ্যমান জগতের উপর যে সঙ্গীত নির্ভর করে না, তা অন্ধের সঙ্গীতপটুতা হতেই বুঝা যায়। তার মানসলোকেও ভোরের তারা ফোটে, প্রভাতের অরুণোদয় হয়, সূর্য্যাস্তের ঘনঘটা সংঘটিত হয়।

অতএব চিত্তটা যদি অস্তরবির ছটার মোহে যথার্থই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে ভোরে উঠে পূরবীর করুণ তান ধরলে দায়রা-সোপর্দ্দ করবার আবশ্যকতা নেই; কিম্বা উদীয়মান সূর্য্যের লোহিতরঙে যদি হৃদয়টা সত্যই রাঙা থাকে, তাহলে সন্ধ্যাবেলা ললিত ধরলে সৃষ্টি উল্‌টে যাবে না। কিন্তু ললিত ধরতে গিয়ে যদি অস্তাচলগামী সূর্য্যকে লক্ষ্য করে গাওয়া যায়—"অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল, বালার্ক সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল,"—তবে অবশ্যই সৃষ্টিকে উল্‌টে ফেলা হবে।

(৩)

বস্তুর সঙ্গে আকাশের যে সম্বন্ধ, কথার সঙ্গে তার ব্যঞ্জনারও সেই সম্বন্ধ। বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের আকাশ এবং পত্র ও শাখার মধ্যে বিক্ষিপ্ত খণ্ড-আকাশই বৃক্ষকে গঠন প্রদান করে;—এমন কি পত্রের বর্ণ, হিল্লোল, মর্ম্মরকলতান,—সমস্তই আকাশ হতে প্রাপ্ত। তেমনি

সঙ্গীতের সার্থকতা তার ব্যঞ্জনার আকাশে। সেখানে সে পরিব্যাপ্ত হয়ে মুহূর্ত্তকে অনন্তে ছড়িয়ে দেয়; মানুষকে অতি-মানুষে, ঘরকে বাইরে এবং বিশ্বকে বিশ্বাতীতে নিয়ে চলে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত মূর্ত্ত, পুলকিত হতে থাকে। সুরের মোচড়ে সৃষ্টির মর্ম্মস্থান নিগূঢ় ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ওঠে, এবং সে বেদনা দূরে—আরো দূরে গিয়ে মিশে যায়।

সুতরাং সুরের বৈঠকে যখন সুরাসুরের সংগ্রাম বেধে যায়, তখন সঙ্গীত খুব জমে বটে, কিন্তু এতই নিরেট হয়ে জমে যে, তার ভিতর পল্লবের স্নিগ্ধ হিল্লোলটুকুর জন্যও একটু ফাঁকার সংস্থান হয় না,—কলা একেবারে কসরৎ হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত-শাস্ত্র দূরের কথা, নাট্য-শাস্ত্রতেও যে কথার চেয়ে ইঙ্গিতের আবশ্যকতা ঢের বেশী—এটা ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হচ্ছে। সাহিত্যেও violence দিন দিন কমে আসছে। আত্মহত্যা, গুমখুন, এক লম্ফে প্রাকার ও পরিখা লঙ্ঘন প্রভৃতি উৎকট ব্যাপার সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে একপ্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বীরত্বের সে আস্ফালন আর নেই; ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়ে আর্ত্তনাদের সাহায্যে দুঃখপ্রকাশের প্রথা ঘুচে গেছে; আহ্লাদ জানাতে গিয়ে মুখ-গহ্বর আকর্ণ বিস্ফারিত করবার পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। দেহ-সঞ্চালনের চেয়ে কথার, কথার চেয়ে চাহনির, চাহনির চেয়ে আত্মার নিগূঢ় স্পন্দনের আভাস যে অনেক বেশী, সে বোধের পরিচয় বিশেষ করে বর্ত্তমান যুগের আর্টে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক চিত্রকলাতেও গড়নের চেয়ে দেহভঙ্গির ব্যাকুলতার প্রতি বেশী মনোনিবেশ করা হচ্ছে; expression-এর কাছে anatomy পরাজয় স্বীকার করতে

বাধ্য হয়েছে। স্থিতির ভিতর গতি আশ্রয়-লাভ করে স্বীয় সুষমায় সুসম্বদ্ধ হচ্ছে।—এক কথায় আর্ট ক্রমেই static হচ্ছে।

বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে স্থিতি মানে গতির অভাব নয়,—গতির চরিতার্থতা। বৃত্তের ভিতর অঙ্কিত অসংখ্যভুজ ক্ষেত্র যেমন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি স্থিতির মধ্যে গতি লয়প্রাপ্ত হয়। এটা নির্ব্বাণ নয়,—পরিণতি।

সুতরাং যখন বেহাগে গাওয়া যায়—

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে
জাগরে অন্তরে জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধপ্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা,
নীরব গীতরসে হল হারা।
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগেরে,
জাগেরে সুন্দর সাথে—

তখন ক্ষুদ্র বাক্যগুলির ব্যবধান বিলম্বিত হয়ে হয়ে বিশ্বের কোলাহলের উপর এমনি নিবিড় করে পর্দ্দার পর পর্দ্দা টেনে যেতে থাকে যে, সমগ্র সৃষ্টি একটা অখণ্ড নীরবতায় তর্জ্জমা হয়ে যায়, এবং এই ঘোর নিস্তব্ধতার ভিতর বিশ্ববিধাতার জাগ্রত সত্ত্বায় যেন নিখিল জগত ওতপ্রোত হয়ে পড়ে। বাক্যের ব্যবধানের মধ্যে সঙ্গীত লীলায়িত, তরঙ্গিত, স্পন্দিত হতে থাকে।

ওস্তাদেরা প্রত্যেক রাগিণীতে এমন একটা পর্দ্দা আবিষ্কার করেছেন, যাকে তাঁরা ঐ রাগিণীর "জান" (অর্থাৎ প্রাণ) বলে থাকেন। সেইটিই

নাকি রাগিণীর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র ; রাগিণী তার সৌন্দর্য্য ঐ পর্দ্দাটি হতেই লাভ করে। সে পর্দ্দাটি কোন রাগিণীতে মধ্যম (মা), কোনোটিতে কড়ি মধ্যম (হ্মা) ইত্যাদি। তাঁদের এ আবিষ্কারের যে কোনই সার্থকতা নেই—এরূপ বলা যায় না। কিন্তু জীবের প্রাণকেন্দ্র হৃৎপিণ্ড—এ কথা যতখানি সত্য, তাঁদের মন্তব্য তার চেয়ে বেশী সত্য নয়। অর্থাৎ প্রাণলীলার প্রকাশ সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে,—সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য তার সুরের সমগ্র ভঙ্গিমায়।

ভীমপলশ্রী ও মুলতান, গৌরী ও পূরবী, আশাবরী ও ভৈরবী—এগুলির ভিতর ঠাটের পার্থক্য নেই বল্লেই হয়, কিন্তু এদের ব্যঞ্জনার পার্থক্য এত বেশী যে, এরা বিচিত্রভাবে হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করে। এগুলি শুন্‌লে এই কথাটিই মনে হয় যে "সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে"—কিন্তু ধরা দেয় না। সঙ্গীত হচ্ছে লীলা, এবং লীলা কৌতুকময়ী। সাধ্য কি তাকে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বাধ্য করি। ব্যর্থ রাগিণী !

ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীব যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, তেমনি সঙ্গীতের সাহায্যে আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। সঙ্গীতকে আত্মার ইচ্ছাশক্তি বলা যেতে পারে, কেননা সঙ্গীত, আত্মার নিজেকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা-বিশেষ ; সুতরাং এর মধ্যে বরাবর একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব হতে পারে না।

(৪)

লয়ের সাহায্যে তাল সুরকে ধরবার শেষ চেষ্টা করে ;—ঐখানেই তাল ও সুরের মিলনক্ষেত্র। বাঁয়াতবলায় যারা হাত পাকায়, তারা

শুধু প্রাথমিক ঠেকা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু হাত পেকে উঠলেই সুরের বৈচিত্র্যকে ছন্দে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করে। ভূকম্পন যতটুকু Seismometer-এ ধরা পড়ে, সুর তার চেয়ে খুব বেশী তালে ধরা পড়ে না। ভূকম্পন বিক্ষিপ্ততায় ও অস্পষ্টতায় যেমন ভীষণ, সুর ব্যাপকতায় ও অনির্দ্দিষ্টতায় তেমনি রমণীয়। সুরের অভ্যাস এই যে, সে রাগিণী-রাজ্যের সুন্দর জায়গাটা একটু দাঁড়িয়ে বেশ করে দেখে নেয়। কিন্তু তাল বেচারী সে রসে বঞ্চিত;—সে শুধু চলতেই জানে। বাস্তবজগতে ভ্রমণকালেও এরূপ বন্ধুদ্বয়ের সম্মিলন বিরল নয়। এমতাবস্থায় দুজনের সমানে পা ফেলে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ মিলনের একটা বড় সার্থকতা আছে,—সে হচ্ছে কেন্দ্রবিমুখ ও কেন্দ্রাভিমুখ শক্তির সংযোগ। সুর সঙ্গীতকে পরিধির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, তাল তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। কিন্তু এ অবস্থায়ও যে আমরা সগোল বৃত্ত প্রত্যাশা করতে পারিনে, তার প্রমাণ ভূমণ্ডলের গতি। সম্ভবতঃ ভূমণ্ডলের এ ছন্দঃপাত বিশ্বেশ্বর হাস্যমুখে উপভোগই করেন।

Maeterlinck-এর "Wisdom and Destiny" একখানা আশ্চর্য্য পুস্তক। মানব-জীবনের মাধুর্য্য অমন করে খুব কম লেখকই দেখাতে পেরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও আমরা বিচার-বুদ্ধিকে (Reasoning) মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে থাকি, ব্যবহারিক জীবনে Wisdom-এর তুলনায়—Dogmatism-এর তুলনায় নয়—তার স্থান অনেক নীচে। দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে যুক্তির নাম-গন্ধও থাকে না, কিন্তু (তিনি বলেন) তা বলে কি তারা অসত্য?

সুরও নিজের প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে নেয়, এবং তার প্রয়োজন

অনন্ত ও বিচিত্র ; কারণ সুর হচ্ছে হৃদয়ের প্রকাশ। হৃদয়-বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্যের ভিতরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শুধু তাঁরাই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, যাঁরা মানুষের ব্যক্তিত্ব দুহাত দিয়ে অস্বীকার করে থাকেন। কি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে, কি সামাজিক ইতিহাসে, এঁরা এমন সকল নিয়ম দেখতে পান যে, সেগুলির উপর দাঁড়িয়ে এঁরা অকুতোভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। আজও Vitalists আর Mechanists-দের লড়াই প্রচণ্ডবেগেই চলছে। শুনা যায় "ঐতিহাসিক নিয়মের" একজন আবিষ্কর্ত্তা (জর্ম্মান-অধ্যাপক Niebuhr) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ফরাসীবিদ্রোহের পর ভগ্ন-হৃদয়ে ইহলীলা সম্বরণ করেন,—কারণ উক্ত বিদ্রোহ তাঁর "ঐতিহাসিক নিয়মের" বাইরে পড়ে গিয়েছিল!

সুতরাং প্রয়োজনে পড়ে রাগিণী 'বেপর্দ্দ' হয়ে গেলে, ওস্তাদমহোদয়গণ Niebuhr-এর পরিণামকে স্বচ্ছন্দে বাহবা দিতে পারেন, নয় তো সঙ্গীত-টিকে মিশ্ররাগিণীর কোঠায় ফেলে বীরদর্পে গোঁফে চাড়া দিতে পারেন।

মানব-ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ত্ব বড় হয়ে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম-তত্ত্ব তখন লিখিত হয় নি। থিয়লজি বয়স হিসেবে রিলিজানের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলেও, সে এখন তার বড়দাদা হয়েছে। চিত্রকলার চেয়ে চিত্রতত্ত্ব, কাব্যের চেয়ে কাব্যতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই anachronism-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা অসম্ভব। আর্টের পক্ষে এটা যে কিরূপ প্রচণ্ড বাধা তা বুঝিয়ে বলা দুঃসাধ্য, এবং এর জবাব-দিহি—কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সামাজিক সমস্যায়—বাঙালীকে যে বেশ করেই দিতে হচ্ছে, তার প্রমাণ প্রবীণ ও নবীনদলের বর্ত্তমান লড়াই।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

গ্রীসে ভাষার লড়াই।

বাংলা সাহিত্যের আসর আজকাল ভাষার তর্কে সরগরম। কি রকম ভাষায় আমাদের সাহিত্য তৈরি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা রকম সাহিত্যিকের নানা রকম মতের সংঘর্ষে তর্কটা বেশ একটু গরম হয়ে উঠেছে। অবস্থা আমাদের যতই গুরুতর হোক না কেন, একটা আশার কথা এই যে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি কাগজে কলমে আবদ্ধ। গ্রীকেরা কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ছাড়িয়ে উঠেছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামাতেও তারা পিছ্‌পাও হয়নি। সে ত বেশী দিনের কথা নয়, পনেরো যোলো বছর হবে। গ্রীসের সেই ভাষা-যুদ্ধের একটা ছোট খাটো বিবরণ বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি।

বর্ত্তমান গ্রীসে দুটী ভাষা প্রচলিত আছে—একটী মুখের ভাষা, আর একটী লেখার ভাষা। শেষোক্তটীকে "পণ্ডিতি" (learned) বা "সাধু" (purist) ভাষা বলা হয়। অধিকাংশ লেখকই অবশ্য সাধুপন্থী। যা-কিছু সাধারণের নয়নগোচর করা হয়—যেমন খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি, সমস্তই এই ভাষায় লেখা। চিঠি-পত্রে স্কুলে-কলেজে, আফিসে-পার্লিয়ামেণ্টে, এ ভাষারই চলন আছে। এমন কি দু' একজন এহেন সাধু ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা এ ভাষায় কথাবার্ত্তাও কয়ে থাকেন। প্রথমটীর নাম সাধারণ (ordinary)

বা অসাধু (vulgar) ভাষা। এ ভাষা কোথাও শেখানো হয় না কিন্তু সকল গ্রীকই এ ভাষা জানে ও অক্লেশে বলতে পারে। দু'চারটে সাধু শব্দের সহযোগে এই ভাষাই সাধারণতঃ এথেনীয় ভদ্র-সমাজে ব্যবহৃত হয়। এ দুই ভাষায় তফাৎ যথেষ্ট—কথা, উচ্চারণ, শব্দরূপ, বাক্যবিন্যাস, সকল বিষয়েই এ দুয়ের ভিতর স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

এই রকম ভাষার অনৈক্য হোমারীয় কবিতার প্রাচীনতম অংশ-গুলিতেও চোখে পড়ে। হোমারের সময় গ্রীসে কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা (dialects) মাত্র প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে কতকগুলি সেইরূপই রয়ে গেল আর কতকগুলি সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হোল। এই অপভাষাগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) আইওনিয় (২) অন-আইওনিয়। অ্যাটিক ভাষা—অর্থাৎ যে ভাষা শুধু এথেন্সে চলত ও যে ভাষায় প্লেটো ও থুকিডিডিস্ লিখতেন—তা এই আইওনিয় শ্রেণীর একটী বিশেষ বিভাগ।

মেডিক (medic) সমরের পর এথেন্সের গৌরব বেড়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার পদও উপরে উঠে গেল। ফ্রান্সে যেমন Ile-de-france-এর প্রচলিত ভাষা সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে গেল, গ্রীসেও তেমনি অ্যাটিক ভাষা সমুদয় গ্রীসদেশে প্রচলিত হোল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়ে, এই ভাষাই গ্রীসের "সাধারণ ভাষা" হয়ে দাঁড়াল।

তারপর ক্রমে ক্রমে রোমীয়েরা, স্লাভেরা, ফ্রাঙ্কেরা ও তুর্কীরা গ্রীস জয় করেছে। তারা গ্রীক-ভাষার উপর নিজ নিজ ভাষার ছাপ রেখে গিয়েছে বটে কিন্তু তার নিজস্ব রূপটীকে কিছুতেই নষ্ট কর্ত্তে পারে

নি। যে ভাষা আজকালও এথেন্স ও অন্যান্য নগরে চল্‌ছে তার স্বরূপটী সেই আলেকজান্দারের সময় হতে প্রচলিত "সাধারণ ভাষা"তেই পাওয়া যায়। এই হচ্ছে বর্ত্তমান গ্রীসের মুখের ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(২)

কিন্তু মুখের ভাষা ছাড়াও গ্রীসে আর একটী লেখার ভাষা আছে।

প্রাচীনকালে এ দুটি ভাষা যেন সমান্তরালভাবে চলেছিল। হোমার থেকে প্লেটো এবং প্লেটো থেকে প্লুটার্ক পর্য্যন্ত মুখের ভাষাও যেমন বদ্‌লেছে, লেখার ভাষাও অনেকটা সেই রকম ভাবেই বদ্‌লেছে। মৌখিক ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার আসলে ছাড়াছাড়ি সুরু হ'ল কিন্তু বৈজান্তীয় (Byzantine) যুগে। তখন গ্রীসে কোনও জীবন্ত সাহিত্য না থাকায় লেখকেরা একমাত্র প্রাচীন যুগের সাহিত্যের চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্‌লেন। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে কেবল তাঁদের লিখবার বিষয় অনুকরণ করেই নিরস্ত হলেন না, তাঁদের লিখবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অনুকরণ কর্ত্তে লাগলেন। এই রকমে মুখের ভাষা যখন সামনের দিকে পুরোদমে এগিয়ে যেতে লাগল, লেখার ভাষা তখন প্রাচীন কথা ও শব্দ এবং প্রাচীন লিখবার ভঙ্গীর মধ্যে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

কিন্তু এ রোগেরও ঔষধ আছে। তাই দ্বাদশ শতাব্দীতে, বা তার কাছাকাছি সময়ে সাহিত্যে একটী নূতন লিখন-ভঙ্গী দেখা গেল

যার ভিত্তি হচ্ছে মুখের ভাষা। ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালীতে নূতন ভাষা পুরাতন ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রীসের বেলা তা হয় নি। না-হবার কারণ এ নয় যে সে ভাষায় উঁচুদরের পুস্তকাদি রচিত হয় নি। এর একটী বিশেষ কারণ ছিল, যা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নি। শিক্ষিত গ্রীকেরা কলমের জোরে তাদের মৃত ভাষাটীকে আবার লেখায় সজীব ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিল। এই ভাষার মধ্যে তারা যেন প্রাচীনকালের সহিত তাদের একটী সুদৃঢ় বন্ধন দেখতে পেত; এ ভাষা যেন নিশ্চয় ক'রে তাদের জানিয়ে দিত যে তারা সত্য সত্যই সেই পেরিক্লিসের বংশধর। গ্রীসের সেই গৌরবময় অতীতকাল যে তাদেরই অতীতকাল এ সান্ত্বনা তারা এই ভাষা ভিন্ন আর কোথাও পেত না। পতিত জাতির অতীতভক্তির আতিশয্যবশতঃই গ্রীসের মৌখিক ভাষা ফ্রান্স স্পেন ইটালি প্রভৃতির মৌখিক ভাষার মতো সাহিত্যে স্থান পেলে না।

(৩)

কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো—ঊনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করবার ঠিক আগেই গ্রীকদের মধ্যে একটী জাতীয়তার ভাবের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল। সেই সময়ে এই প্রশ্ন উঠ্‌লো, যে সমস্ত জাতির পক্ষে ভাবপ্রকাশের জন্যে কোন ভাষা অবলম্বন করা কর্তব্য। দুই বিভিন্ন দলের মুখপাত্র হয়ে অনেক লোকে অনেক লেখা লিখ্‌লেন। সে সব লেখা যে মাঝে মাঝে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে নি তাও

বলা যায় না। ভিয়েনা, আমষ্টারডাম্, বুখারেষ্ট প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষিত গ্রীকেরা পুস্তিকা রচনা ক'রে ছাপাতে লাগলেন। চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। তারপর ১৮২১ সালে গ্রীসে স্বাধীনতার সমর জ্বলে উঠ্‌লো। সাত বছর ধরে সে যুদ্ধ চলে। সে সাত বছর অবশ্য এই ভাষার ঝগড়া বন্ধ ছিল। তারপর Coray নামে একজন গ্রীক-পণ্ডিত সাহিত্যে একটি "মধ্যপথের" ব্যবস্থা কর্‌লেন; কিন্তু সে পথ কেউ অবলম্বন কর্‌লে না।

Roidis তাঁর "পুত্তলিকা" নামক গ্রন্থে এই মত প্রকাশ কর্‌লেন যে. লেখার ভাষা থেকে তার প্রাচীন রূপগুলি একে একে পরিত্যাগ কর্‌লেই কালক্রমে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে যে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন অনৈক্য থাক্‌বে না। তাঁর কথা যে কতটা সত্য তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের গদ্যের সহিত প্রথম ভাগের গদ্যের তুলনা কর্‌লেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু সমরধর্ম্মে তখন "স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্" এর চেয়ে "কামারের এক ঘা" এর বেশী দরকার হয়েছিল। তখন বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছিল যে প্রাচীন গ্রীকই সাধু আর আধুনিক কথিত গ্রীক যে অসাধু, এ বিশ্বাসটী একটী মস্ত ভুল। এ কথা তখন কেউই মান্‌ত না যে এমন কোন ভাষা থাক্‌তে পারে না, যা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল বা দরিদ্র, এবং শিল্পীর হাতে সব ভাষাই সমান খেলে। ফ্রান্সে ভিক্‌তর হ্যুগো যা করেছিলেন, গ্রীসে Psichari-ও তাই কল্লেন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর "আমার ভ্রমণ" গ্রন্থ সেই "কামারের ঘা" দিলে।

১৮৮৬ সালে Psichari, কনষ্টাণ্টিনোপল, কিওস ও এথেন্স বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীটিকে ভিত্তি করে তিনি

রঙ্গ-ব্যঙ্গ কারুণ্যপূর্ণ কবিত্বময় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে গ্রীক্-জীবন ও জাতীয় অন্তরাত্মার সুন্দর প্রতিকৃতি ছিল; জাতীয় দোষগুলির বিশেষতঃ ভাষাবিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানের উপর তীব্র শ্লেষ ছিল; আর সেই সঙ্গে ভাষার উন্নতি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্যগুলি অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট ও বিবৃত হয়েছিল। বইখানি মুখের ভাষায় লেখা—কিন্তু লেখার ভঙ্গীটী যেমন সুন্দর তেমনি মোলায়েম, তার কোনখানে খিচ নেই খুঁত নেই। বানানেরও কতকগুলি নূতন রীতি তিনি এই গ্রন্থে প্রচলিত করেন। এই রীতিগুলি তাঁর বহু বৎসরের ভাষাবিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিস্তর গবেষণার ফল।

বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পরই গ্রীসে বেশ একটু উত্তেজনার সাড়া পাওয়া গেল। দুঃখের বিষয় অতি অল্প লোকই এ গ্রন্থের পুরো মর্য্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। অনেকে আবার এর অন্য সমস্ত গুণ স্বীকার করে ভাষাসম্বন্ধে ভয়ানক আপত্তি জানাতে লাগলেন। সমালোচকগণ দু' চারখানা পাতা পড়েই তাঁদের বাঁধাবুলিতে গালা-গালি দিতে আরম্ভ কল্লেন। কাগজগুলির মধ্যে কেবল একখানি এর স্বপক্ষে ছিল এবং কেবল একজন লেখক, Roidis, এর উপর একটী অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটী সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু মৌখিক-ভাষার পক্ষে এটী সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত ওকালতী বলে গ্রীক্-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাতে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে Psichari-র মতগুলি সত্য ও অভ্রান্ত। অনেকেই এই প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মত অবলম্বন করেছিলেন।

(৪)

এইবার আমরা ভাষাবিপ্লব সংশ্লিষ্ট গ্রীসের সেই অদ্ভুত দাঙ্গাটীর কথা উল্লেখ কর্‌ব। Acropolis পত্রে Mr. Pallais, St. Malthew-র Gospol-এর অনুবাদ প্রকাশ কর্ত্তে আরম্ভ করেন। অনুবাদটী "অসাধু" ভাষায়। জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রের দল এতে বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো। স্কুলে তারা চিরকাল সাধু ভাষাতে বই পড়ায় অভ্যস্ত; মুখের কথা ছাপার অক্ষরে দেখে তাদের চোখ যেন জ্বলে গেল। এ ভাষায় ধর্ম্ম-পুস্তকের অনুবাদ তাদের কাছে ধর্ম্মের-ই অবমাননা বলে মনে হতে লাগলো। তারা সরকারের কাছে এই বলে আবেদন করে পাঠালে যে সমস্ত বাইবেল-অনুবাদকগুলিকে সমাজচ্যুত করা হোক্। সে আবেদন গ্রাহ্য হোল না। তারপর একদিন তারা Olympian Jupiter-এর স্তম্ভের চারিদিকে জড় হোল; ক্রোধ ও মদ তখন তাদের পেয়ে বসেছে। একজন ছাত্র উঠে এই বক্তৃতা দিলে যে শুধু অনুবাদকদেরই সমাজচ্যুত কর্‌লে যথেষ্ট হবে না। যারা ঐ রকম অনুবাদ পড়ে তাদেরও শাস্তি দেওয়া দরকার। আর যেখানে যেখানে ঐ অনুবাদ পাওয়া যাবে তা পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। প্রধান মন্ত্রী তখন খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন; অমনি তারা সেই গাড়ীর উপর গুলি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলে সেই বাড়ীও তারা আক্রমণ করেছিল। সৈনিকেরা ভিড় ভেঙ্গে দিতে এলে তারা দু'চার জনকে মেরে ফেলতেও কুণ্ঠিত হয় নি। সে দিন সৈনিকেরা অতুলনীয় ধৈর্য্য দেখিয়েছিল। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু তারা স্বদেশবাসীর উপর গুলি চালায় নি, শুধু ফাঁকা আওয়াজ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল। এতেও কিন্তু সাধুভক্তদের উত্তেজনা কমলো

না। এথেনীয় সংবাদ পত্রগুলি আবার সাধারণের এই রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগ্‌লো। সমস্ত ইয়োরোপ স্তম্ভিত হয়ে গ্রীসের এই অস্বাভাবিক চিত্তবিকার লক্ষ্য করতে লাগল।

ব্যাপারটা ইয়োরোপকে বোঝান শক্ত। এ কথা ইয়োরোপ জানে যে ভাষান্দোলনে কাগজের উপর কালির বান-ই ডাকে; তা নিয়ে যে তাজা মানুষের রক্তের রক্তগঙ্গা বইতে পারে এ তার স্বপ্নাতীত। ইয়োরোপের বিস্ময় দেখে গ্রীক্‌ পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন। ইয়োরোপকে বোঝাবার জন্যে তাঁরা একটা চলনসই কৈফিয়তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কেউবা বল্লেন ধর্ম্মই এ হাঙ্গামার কারণ, কেউবা বল্লেন, রাজনীতি। কিন্তু Psichari ফ্রান্সের La Revue পত্রে একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করে প্রতিপন্ন করে দিলেন যে এই ব্যাপারের কারণ হচ্ছে একটী মাত্র—সেটী এই যে বর্ত্তমান অনুবাদটীর ভাষা "অসাধু"। গ্রীকচার্চ্চ বাইবেলের অনুবাদের বিপক্ষে নহেন; এতদিন বরং তাঁরা অনুবাদ-প্রচারকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেই এসেছেন। এই অনুবাদটীর উপর তাঁরা এত বিরক্ত কেন? শুধু মুখের ভাষায় লেখা বলে। Psichari-র কথায় ইয়োরোপ বুঝল ব্যাপারখানা কি।

(৫)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মুখের ভাষার উপর এত রাগ কেন? এ নিয়ে গ্রীসে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। আমরা এখন তার সারমর্ম্ম দেব।

গ্রীসের সাধুপন্থীরা বলেন—"অসাধু" ভাষা সাবেক্‌ গ্রীক্‌ ভাষার বিকৃত আকার।

প্রতিবাদীরা বলেন—যে ভাষা সমস্ত গ্রীক্ জনসাধারণ ব্যবহার করে, এমন কি শিক্ষিতেরাও লেখায় না হোক্, কথায় ব্যবহার করেন, সে ভাষা অসাধু হতে পারে না। তা ছাড়া এ ভাষা প্রাচীন গ্রীক্ ভাষার বিকার নয়—বিকাশ। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হতেই হবে। ভাষা মানুষের চেষ্টার ফল। মানুষের যে সকল মনোবৃত্তির ক্রিয়ার ফলে ভাষা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেগুলিও যখন পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের অধীন তখন ভাষা যে চিরদিন এক থাক্তে পারে না তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আর, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষার তুলনায় পরবর্ত্তী যুগের ভাষা বিকৃত হয়, তা হলে প্লেটোর ভাষাও হোমারের তুলনায় বিকৃত, নিউ টেষ্টামেণ্টের ভাষাও প্লেটোর তুলনায় বিকৃত।

সাধুভাষীরা বলেন—অনেক দিন অধীনতা স্বীকার করায় মৌখিক গ্রীক্ ভাষার মধ্যে বহু বিদেশী কথা এসে পড়েছে এবং তাতে করে গ্রীক্ ভাষা বিকৃত হয়েছে ও তার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে।

প্রতিবাদীরা উত্তর দেন—এ যুক্তির কোন মূল্যই থাকে না যখন আমরা দেখতে পাই, কোন দেশের কোন ভাষাই বিদেশের প্রভাবমুক্ত নয়। যে সব বিদেশী কথা ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কোন দেশের কোন লোকই সে সব কথা পরিত্যাগের পক্ষপাতী নয়। তা ছাড়া ভাষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও এই সমস্ত আমদানী-করা কথার একটা বিশেষ দাম আছে। এই রকম এক একটী কথার ভিতর দেশের ইতিহাসের এক একটী যুগ প্রচ্ছন্নভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ইতিহাসের এই সাক্ষীগুলিকে বিনষ্ট করবার অধিকার কারো নাই, কারো থাক্তে পারে না।

আর একটা আপত্তি সাধুপন্থীরা বার বার করে তুলে থাকেন—সাধারণ গ্রীক্ ভাষা বলে বাস্তবিক কোন ভাষা নেই। গ্রীসে মুখের ভাষা সব জায়গায় এক রকম নয়। দুটী বিভিন্ন গ্রামে কথা ও তার উচ্চারণ ভঙ্গী দুই-ই আলাদা। যদি প্রত্যেক গ্রামই নিজের নিজের ভাষায় লেখে তাহলে কেমন করে একটা সর্ব্বজনীন গ্রীক্ ভাষা তৈরি হওয়া সম্ভব?

প্রতিবাদীরা কথাটীর উত্তর দেন দু' রকমে। তাঁরা প্রথমতঃ বলেন—ধরে নেওয়া যাক্ দেশের অবস্থা এই রকম। তাহলে সাধু-ভাষাই বা কেমন করে এ স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবে। ব্যাকরণের উপর গড়ে তোলা একটা কেতাবিভাষা দেশের সমস্ত কথ্য ভাষাকে উপেক্ষা করে কি রকমে স্থায়ী হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি নে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা বলেন—দেশের ভাষার সম্বন্ধে এ কথা আমরা মানিনে। প্লেটোর ভাষা অনেক সাধুপন্থীর আদর্শ এবং সকল গ্রীক্ই প্লেটোর ভাষা বুঝতে পারেন এ গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন। কিন্তু সাধুভাষার পক্ষপাতীর দল এ কথা কি জানেন না যে, প্লেটো এমন একটী কথাও ব্যবহার করেন নি যা তাঁর সময়ের এথেন্সে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল না। আমরা এ কথা খুব বিশ্বাস করি যে একজন এথেনীয় যদি তাঁর শিক্ষিত ঢঙটী ত্যাগ করে সাধারণ ভাবে কথা বলেন তবে গ্রীসের সকল ভাগের লোকই তাঁর কথা বুঝতে পারে। যদিই বা কোন প্রদেশের লোক তাঁর কথা বুঝতে না পারে তাতে ক'রে এমন কিছুই প্রমাণ হয় না যে গ্রীসে কোনও সাধারণ ভাষা নাই; শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে সর্ব্বত্র এখনও সে ভাষা পুরো চালানো হয় নি। ফ্রান্সে একটা সাধারণ ভাষা নেই এ কথা বোধ হয় কেউই বলবেন না

অথচ এই ফ্রান্সেই ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে গিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে গেলে অনেক জায়গার স্থানীয় অপভাষা ব্যবহার কর্ত্তে হয়।

সাধু ভাষার দলের আর একটি আপত্তি এই যে অসাধু ভাষায় উচ্চ ভাব প্রকাশ করা যায় না। প্রতিবাদীরা উত্তরে বলেন, এ কথা যে কতদূর ভিত্তিহীন তা শুধু বর্ত্তমান গ্রীক্ সাহিত্যের দিকে চাইলেই বুঝতে পারা যায়। কবিতা ত এ ভাষাকে একেবারে একচেটে করে নিয়েছে। আধুনিক গ্রীসের দু'জন খুব উঁচু দরের কবি Solomos ও Valaority মুখের ভাষাতেই পদ্য রচনা করেছেন। গদ্যেও যে এ ভাষা কতদূর উপযোগী তা Psichari তাঁর "আমার ভ্রমণ" ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ভাষায় জ্যোতিষ, ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে। সুতরাং কেমন করে বলা যেতে পারে যে এ ভাষার সম্পদ্ কম আর এ ভাষা দিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় না।

একটা কথা প্রতিবাদীরা সকলকে মনে রাখতে বলেন। সাধারণ ভাষায় লিখ্তে হবে বলে সাধুভাষার কোন কথাই যে তাঁরা ব্যবহার কর্ত্তে পাবেন না এ কথা যেন কেউই মনে আদৌ স্থান দেন না। শিক্ষিত লোকের ও অশিক্ষিত লোকের ভাষার মধ্যে ব্যবধান সব দেশেই থাকে এবং গ্রীসেও আছে। যদি কোন কথা সাধারণ ভাষায় না থাকে তবে লেখক অনায়াসে তা সাধুভাষা থেকে নিতে পারেন। কেবল কথাটীকে এমনি ভাবে নিতে হবে যে তা যেন অন্যান্য সাধারণ কথার সঙ্গে বে-মালুম ভাবে মিশে যায়, যেন তা তাদের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে যেতে পারে।

গ্রীসে এই ভাষা-সমস্যার আজও কোন সমাধান হয় নি। দুটী ভাষাই চল্‌ছে; এখনও কোন ভাষাই একাধিপত্য স্থাপন কর্ত্তে পারে

নি। আমাদের দেশেও আজকাল ভাষান্দোলন প্রবল বেগে চল্‌ছে। গ্রীসের উদাহরণ আমাদের সত্যের আলোকের আভাস দেখিয়ে দিতে পারে এই ভরসায় এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

পত্র।

(নববাণী হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমান্ অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

তোমরা যখন "নববাণী" প্রচার করতে কৃত-সংকল্প হয়েছ, তখন আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, সে বাণী কোনও পূর্ব্ববাণীর প্রতিধ্বনি হবে না, নচেৎ ও নামের কোনও সার্থকতা থাকে না, এবং ও নাম সার্থক করবার আজ প্রয়োজন আছে; কেননা দিন এসেছে। আমরা যে একটা নবযুগের সন্ধিস্থলে এসে পৌঁচেছি, তার পরিচয় ত ভারতবর্ষের সকলের কথায় এবং সকল কথায় পাওয়া যায়। আজকের দিনে আমাদের আশার ও ভাষার একমাত্র বিষয় হচ্ছে—স্বরাজ্য। এ বিষয়ে আমাদের আশা যে কি তা আমাদের ভাষা থেকে ঠিক ধরা না গেলেও, এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, আজকের দিনে সমগ্র ভারতবাসীর মনের কথা এই যে—তে হি নো দিবসা গতাঃ। আগামী কল্য কি মূর্ত্তি ধারণ করে আসবে, তা ঠিক না জানলেও, আমরা এটা ঠিক জানি যে গত কল্যের হাত থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি,—অন্ততঃ মনে।

(২)

বাংলা দেশে যে-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম লাভ করে, এবং গত একশ' বৎসর ধরে বাঙ্গালী যে সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করে আস্‌ছে—সে সাহিত্য হচ্ছে সেই দিনের সাহিত্য,—যে দিন, আমাদের মতে গত হয়েছে। সুতরাং এই আসন্ন নবযুগে নিশ্চয়ই একটি নব-সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, যদি বাঙ্গালী স্বরাজ্যের মোহে মনো-রাজ্যের দিকে পিঠ না ফেরায়। সে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। আমাদের আগামী যুগ শুধু স্বরাজের নয়, "স্বদেশীর"ও যুগ হবে অর্থাৎ ভারতের লুপ্ত শিল্প বাণিজ্য এ যুগে পুনর্জ্জন্ম অথবা নব জন্ম লাভ কর্‌বে। সুতরাং বাঙ্গালীর মন অবস্থার গুণে কল-কারখানার দিকে সহজেই এতটা ঝুঁকবে যে, হয় ত সরস্বতীর বদলে বিশ্বকর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বেন—এ দেশের একমাত্র উপাস্য দেবতা। বিশকরম পুজোর আমি বিরোধী নই ;—তাই বলে এ কথাটাও আমি ভুলতে পারি নে যে, দোয়াত-কলম ছেড়ে শুধু যন্ত্রপূজা করে কোনও জাতি, উন্নতি পড়ে থাক্ অভ্যুদয় পর্য্যন্ত লাভ কর্‌তে পারে না। তবে আশার কথা এই যে, পৃথিবীর এই আগতপ্রায় যুগ, আর যাই হোক খুব সম্ভব যন্ত্রযুগ হবে না। মানুষ যন্ত্রবৎ চালিত এবং যন্ত্রচালিত হলে অবশেষে তার যে কি দুর্গতি হয়, তার প্রমাণ ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখে পড়ে রয়েছে। ইয়োরোপের নরমেধ-যজ্ঞ হতে, যে দেবতা বিশ্ব-মানবের উদ্ধারকল্পে দক্ষিণ হস্তে বর আর বামহস্তে অভয় নিয়ে আবির্ভূত হবেন, তাঁর প্রসাদ লাভ কর্‌বে শুধু তারা যারা জানে যে, মানুষের আত্মার শক্তিই হচ্ছে তার যথার্থ আত্মশক্তি। ভবিষ্যতে কোন জাতিই আর মনে কৃপণ হয়ে জীবনে

ধনী হতে পার্‌বে না। সুতরাং এ অবস্থায় সরস্বতীর আসন টলা দূরে থাক্‌, ঊনবিংশ শতাব্দীর যত পাপ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর, মানব-সভ্যতার যে খাঁটি সোণা উদ্‌বর্ত্ত থাক্‌বে সেই সোণায় সরস্বতীর নব পদ্মাসন নয় নব সিংহাসন রচিত হবে। অন্ততঃ এই ত আমাদের আশা।

(৩)

আমার বিশ্বাস, আমাদের গত একশ' বৎসরের সাহিত্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং সে সাহিত্যের মতি-গতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্‌।

প্রথমেই নজরে পড়ে যে সে-সাহিত্য নিরানন্দ। আজ একশ' বৎসর ধরে আমরা আমাদের সকল লেখায় সকল কথায় প্রকাশ করে এসেছি—শুধু অসন্তোষ। এর কারণ—আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য, আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন জিনিসই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন হীনতা আমাদের বুকের ভিতর অষ্টপ্রহর কাঁটার মত বিঁধছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে শুধু আক্ষেপ ও আক্রোশের সাহিত্য। এ সাহিত্যে, আমরা এক চোখ লাল করেছি,—হয় কেঁদে, নয় রেগে; আর এক চোখ আলো করেছি, বিদ্রূপের হাসিতে—সেও হয় ক্ষোভে নয় ক্রোধে। এ সাহিত্যে অবশ্য বৈরাগ্যেরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সব হয় মিছে, নয় বাজে।

যার দেহে রজোগুণ নেই, তার মনে সত্ত্বগুণ থাকতেই পারে না। যে আঙ্গুরের নাগাল পাওয়া যায় না, সে আঙ্গুরকে খাট্টা বলায়—কি আধ্যাত্মদর্শন কি ভৈষজ্যবিজ্ঞান কোনটিরই পরিচয় দেওয়া হয় না। কথামালার শৃগালকে আমরা ছাড়া আর কেউ ত্যাগী পুরুষ বলে মান্য করেনি।

এই বিলাপ ও প্রলাপের জমির উপর অবশ্য গুটিকয়েক এমন ফুল ফুটে উঠেছে যার বর্ণে সাহিত্য-গগন উজ্জ্বল আর যার গন্ধে সাহিত্য-জগৎ আমোদিত হয়ে উঠেছে। এর কারণ সাহিত্য-জগতের যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের প্রতিভা যুগধর্ম্মের একান্ত অধীন নয়। তাই বলে কবি-প্রতিভা কিছু আর স্বকালের সম্পূর্ণ বহির্ভূতও নয়। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতা নেওয়া যাক্; এ কবির কাব্যের পর পর চারিটি বেশ স্পষ্ট পৃথক্ যুগ আছে। মোটামুটি হিসেবে, এ কবির প্রথম যুগের সুর আনন্দের, দ্বিতীয় যুগের বেদনার, তৃতীয় যুগের বিদ্রোহের এবং চতুর্থ যুগের মুক্তির। কিন্তু তাঁর প্রথম যুগের আনন্দও নিরাবিল নয়, তার অন্তরেও হয় বেদনা, নয় বিদ্রোহের সুর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—জাতীয় জীবনের নির্জ্জীবতার প্রতি আর যিনিই হোন কবি কখনই উদাসীন হতে পারেন না; কেননা মহাপ্রাণতাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ।

(৪)

তার পর নজরে পড়ে যে এ সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়।

এর কারণ এ সাহিত্য মুখ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। গত একশত বৎসর

ধরে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যে একমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা সকলেই স্বজাতিকে মনে ও চরিত্রে শক্তি-শালী কর্‌তে, রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ কর্‌তে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমৃদ্ধি-শালী কর্‌তে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছেন, এ কথা বল্‌লে নেহাৎ বাজে কথা বলা হবে না। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ত সর্ব্বলোকবিদিত। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জবানিই কবুল করেছেন যে স্বজাতির উন্নতিকল্পেই তিনি লেখনী ধারণ করেন; অর্থাৎ লেখা জিনিসটে এঁদের সকলের কাছেই ছিল জাতি-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র। সাহিত্যকে এঁরা একটা means হিসেবেই দেখতেন, end হিসেবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরোপকার, গৌণ উদ্দেশ্য কাব্যসৃষ্টি। ফল যদি তার উল্টো হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাত থেকে যা বেরিয়েছে তা যদি মুখ্যতঃ সাহিত্য হয়ে থাকে ত, তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের অবাধ্য প্রতিভা তার সঙ্কীর্ণ সংকল্পকে অতিক্রম করে। বঙ্কিমের লেখারও তিনটে যুগ আছে। তাঁর মধ্য যুগের রচনাই যথার্থ কাব্য, আর তাঁর আদি ও অন্ত যুগের লেখা জাতীয় হিত-সাধনের সাহিত্য। দুর্গেশ-নন্দিনী ও মৃণালিনীর যুগে আর্ট তাঁর করায়ত্ত হয় নি, আর আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণীর যুগে আর্ট তাঁর করচ্যুত হয়েছিল। সুতরাং এ সকল গ্রন্থের যা কিছু মুল্য সে হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাপুস্তক হিসেবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কি শিক্ষা দেয়? তার উত্তর

পেট্রিয়টিজম। আনন্দমঠ প্রভৃতির শিক্ষাও ঐ। দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর প্রথমগুলি ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে রচিত আর শেষগুলি সংস্কৃতের।—এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সাহিত্যের—পেট্রিয়টিজম এবং রাজনীতির পেট্রিয়টিজম এক বস্তু নয়; কেননা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের ভিতরের অবস্থা এবং রাজনীতির উদ্দেশ্য তার বাইরের ব্যবস্থা বদল করা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ দৈন্যের প্রতি অন্ধ হয়ে কাব্য রচনা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এ কথাও সত্য যে সম্পূর্ণ আত্মগত না হতে পারলেও আর্টিষ্টিক সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিষয়বিশেষে অহৈতুকী প্রীতিই হচ্ছে আর্টের বীজ এবং সে বিষয়ে তন্ময় হতে না পারলে সে বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই জন্যেই, অর্থাৎ তিনি আত্মগত ও আত্মায় তন্ময় হতে পারেন বলেই তাঁর কবিতায় চরম আর্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গড়বার যন্ত্র আর গদ্য তাঁর ভাঙ্গবার অস্ত্র। তাঁর কবিতার ধর্ম্ম হচ্ছে সত্য শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা আর তাঁর বিচারপ্রসঙ্গের ধর্ম্ম হচ্ছে অসত্য অশিব ও অসুন্দরের উচ্ছেদ করা। সুতরাং তাঁর প্রায় সকল গদ্য লেখাই উদ্দেশ্যমূলক, এবং তাঁর ছোট-বড় অনেক গল্পও একেবারে উদ্দেশ্যমুক্ত নয়। ম্যাথু আরনল্ড যাকে Criticism of life বলেন,—রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু কাব্য জীবনের শুধু শোধক নয়, জীবনের রসায়নও বটে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য যে কাব্যরসে পরিপুষ্ট, তার কারণ সে গদ্য কবির হাতের লেখা।

(৫)

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পার্‌ছ যে আমি বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের দেহে কি রূপের ও অন্তরে কি গুণের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা মনে পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, সে সাহিত্যে আনন্দ ও আর্ট দুই সমান ফুটে উঠবে—এ আশা করার কি বৈধ কারণ আছে, এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ যে স্বরাজ্য আমাদের হাতে তুলে দেবেন, এ রকম বিশ্বাস কিংবা এ রকম আশা আমার মনের কোন কোণেও কোন দিন স্থান পায় নি; কেননা আমি সাহিত্যিক হলেও একেবারে বিষয়বুদ্ধিহীন নই। বৈষয়িক লোকেরাই যে আসলে বিষয়বুদ্ধিহীন তার প্রমাণ—আমাদের রাজ-নৈতিক দলের অনেক পাকা মাথার ভিতর এ আশা বাসা বেঁধেছে; অন্ততঃ এঁদের কথায় ত তাই মনে হয়। পরের কথায় নিজের মন কিংবা নিজের কথায় পরের মন ভোলানো আমার ব্যবসা নয়, সুতরাং এ কথা বল্‌তে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, স্বরাজ্যে আমাদের পূর্ণাভিষেকের এখনও দেরি আছে—এখনও কিছুদিন ধরে আমাদের ইংলণ্ডের কাছে রাজনীতির শিক্ষানবীশি কর্‌তে হবে। তবে এমন কথাও শুন্‌তে পাই যে স্বরাজ্যের ঐ ষোল আনা দাবাটে হচ্ছে রাজনীতির প্রমারার তাড়া। হতে পারে যে আসলে ব্যাপারটা তাই—কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি? রাজনীতির জুয়োখেলে যখন রাজাধিরাজেরাই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন—তখন আমাদের পক্ষে সে খেলা খেল্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যদি রুষিয়া ও জার্ম্মণী পরস্পরকে প্রমারার তাড়া না মার্‌তেন তা হলে ইয়োরোপে এই আগুন জ্বলত না এবং তার ফলে এদের

সর্ব্বনাশও হত না। Czar ত ইতিমধ্যেই ফকির হয়েছেন এবং Kaiser ফতুর হবেন ;—দু'দিন পরে। আমাদের যখন কোন রকমে হাতের পাঁচ রাখা নিয়ে কথা, তখন আমাদের পক্ষে রাজনীতির বৈঠকে চিৎ-বিস্তি খেলাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। যখন আমার বিশ্বাস যে, আকাশের চাঁদ খসে কাল আমাদের হাতে এসে পড়্‌বে না, তখন আমি আগামী যুগকে কেন নবযুগ বল্‌ছি সে কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করা যাক্।

ভারতবর্ষ যদিও বর্ত্তমান যুগের রাত পোয়ালেই ক্যানেডা কিংবা অষ্ট্রেলিয়া হয়ে উঠ্‌বে না ; তবু তা এমন যায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে আমরা নিজের শক্তিতে আমাদের স্বরাজ্য গড়ে তুল্‌তে পার্‌ব। এর চাইতে সু-খবর আর কি হতে পারে? আমরা এই মোটা কথাটা সদাই ভুলে যাই—যে স্বরাজ্য কিংবা স্বদেশ কোন জাতিই পড়ে পায় নি, সকল জাতিকেই তা নিজ হাতে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে। দেশ বল্‌তে খানিকটা মাটি বোঝাতে পারে, কিন্তু সেই মাটিতে একমাত্র ভূমিষ্ঠ হবার কষ্ট স্বীকার কিংবা আরাম উপভোগ করে মানুষে সে দেশকে স্বদেশ করে তুল্‌তে পারে না। স্বদেশ বল্‌তে আমি বুঝি—সেই মহাবস্তু, দেশ নামক মাটির উপর, মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে যা গড়ে তোলে। প্রথমটি হচ্ছে জড়-জগতের অন্তর্ভূত, দ্বিতীয়টি মনোজগতের একটা দেশের উপর একটা সমগ্র জাতে মিলে, নিজেদের দেহমনের বাসের জন্য যে ঘর বাঁধে, সেই ঘরই যথার্থ স্বদেশ। এ ঘরের উপকরণ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, কাব্যকলা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি ; অর্থাৎ এ সব উপকরণ মানুষকে নিজ মনে ও নিজ হাতে তৈরি করে নিতে হয়। এ বাসগৃহ একদিনে গড়া যায় না, এবং

একবার গড়ে তারপর চিরদিন আরামে ভোগ-দখলও করা যায় না। প্রতি যুগে এর জীর্ণ অঙ্গ ভাঙ্গতে হয়, আবার নূতন অঙ্গ গেঁথে তুলতে হয়। এবং সেই জাতিকেই মানুষে কৃতী বলে—যাদের হাতে মানুষের এই স্বহস্তরচিত গৃহের উদারতা ও উচ্চতা যুগের পর যুগে ক্রমে বেড়েই চলে। এক কথায় স্বদেশ জিওগ্রাফির নয়—হিষ্টিরির অধিকারভুক্ত। জিওগ্রাফি গড়ে প্রকৃতি, আর হিষ্টিরি গড়ে মানুষে।

এই হিষ্টিরি গড়বার স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। এ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর যে স্বাধীনতা ছিল, বিংশ-শতাব্দীতে তার চাইতে ঢের বেশী থাক্‌বে। লোকে যাকে রাজ-নৈতিক অধিকার বলে, সেটা হচ্ছে আসলে একটা জাতীয় দায়। আসৃছে যুগে স্বজাতির শাসন-সংরক্ষণের ভার কতটা জানি নে, কিন্তু অনেকটা ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়্‌বে; এর ফলে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের কাজের ক্ষেত্র ঢের বেশী বিস্তৃত ও বিচিত্র হবে। ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—জীবনের সকল ক্ষেত্রে তোমরা মানুষের সেই ভগবদ্দত্ত অধিকার লাভ কর্‌বে, অর্থাৎ তোমরা আবার মানুষ হবার অধিকার লাভ কর্‌বে।—এই লাভই ত মানুষের যথার্থ স্বরাজ্য লাভ।

এই বিশ্বাসের বলে আমি আশা করছি ভারতবর্ষের এই নব-যুগে তোমাদের জীবন নব-আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে; কেননা স্বাধীনভাবে কাজ কর্‌বার ভিতরই মানুষের আনন্দ, ভোগ কর্‌বার ভিতর আরাম থাকৃতে পারে—আনন্দ নেই। কাব্য রচনা করে' কবি যে আনন্দ পান, কাব্য পাঠ করে পাঠক সে আনন্দ কখনই পেতে পারেন না। যে জাতি স্বদেশকে একটি মহাকাব্যের মত গড়ে তুল্‌তে ব্রতী হয়, সে

জাতি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একটা তীব্র আনন্দের প্রবাহ অনুভব করে। আমাদের নব-মহাভারতের আদিপর্ব্ব রচনার দায় তোমাদের উপরেই বর্ত্তাবে, অতএব তোমাদের জীবন কখনই নিরানন্দ হবে না, যদি না সে দায় তোমরা এড়াতে চেষ্টা করো। সুতরাং সে আনন্দ নবযুগের সাহিত্যে ব্যক্ত হতে বাধ্য।

তার পর তোমাদের পক্ষে, একাগ্রমনে আর্টের চর্চ্চা করাটা আবশ্যক; অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য হয়ে পড়্‌বে। মানব-সভ্যতার প্রতি অবস্থারই কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বিশেষ দোষ আছে, এবং জাতীয় সাহিত্যের সার্থকতা হচ্ছে, সেই গুণের অনুশীলনে ও সেই দোষের নিরাকরণে। যে ডিমোক্রাসির স্তুতিগানে দেশ আজ মুখরিত, সেই ডিমোক্রাসির অশেষ গুণের মধ্যে একটি মহা দোষ হচ্ছে তার ইতরতা। সাধারণতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। সাম্যবাদীরা মানব-সমাজকে জীবনে সমবস্থ করে খুসী হন্ না, সেই সঙ্গে তাঁরা সকলকে মনেও সমধর্ম্মী করে তুল্‌তে চান; কেননা বৈচিত্র্যকে তাঁরা বৈষম্যজ্ঞানে নষ্ট কর্‌তে সদাই প্রস্তুত। মনোজগৎকে তাঁরা সমতল ভূমিতে পরিণত কর্‌তে চান,—তাঁদের ধারণা এ পৃথিবীটে গোচারণের মাঠ হলেই তা ভূ-স্বর্গ হয়ে উঠ্‌বে। পৃথিবীতে অবশ্য যা শ্রেষ্ঠ তাই অসাধারণ। ডিমোক্রাসি অসাধারণতার বিপক্ষ ব'লে, কাব্য ও কলার পরিপন্থী; কেননা কাব্য ও কলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মনের সৃষ্টি। ডিমোক্রাসির ইতরতার একমাত্র কাটান হচ্ছে আর্ট; কেননা একমাত্র আর্টের সাহায্যে মানবজাতি তার ভাবের ও কর্ম্মের আভিজাত্য রক্ষা কর্‌তে পারে। সুতরাং নব-যুগের সাহিত্য তার অভিজাত্য রক্ষা কর্‌বার জন্য, সজ্ঞানে আর্টের চর্চ্চা কর্‌তে বাধ্য। আমি সজ্ঞানে বল্‌ছি এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস এ যুগের

সাহিত্য গদ্যপ্রধান হয়ে উঠ্‌বে। গদ্য হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের ভাষা—সুতরাং সে ভাষার ইতর হয়ে পড়্‌বার দিকে একটা জন্ম-সুলভ ঝোঁক আছে—এ ঝোঁকের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য লেখকদের সদাসর্ব্বদা সতর্ক ও সচেতন থাক্‌তে হবে। ডিমোক্রাসির যুগ utilitarianism সাধারণের মনের উপর—রাজার মত প্রভুত্ব করে, সুতরাং সে যুগের মানবাত্মার মুক্তির বাণী হচ্ছে art for art's sake যেমন theocracy-র যুগে মুক্তির বাণী হচ্ছে truth for truth's sake. আশা করি তোমাদের "নববাণী" এই নব-যুগের আনন্দ ও আর্টের বাণী হবে। আমার শেষ কথা এই যে, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—গীতার এ আদেশ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও শিরোধার্য্য; কেননা সিদ্ধিলাভের ঐ হচ্ছে একমাত্র উপায়।

রাঁচি
৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বালাই

মাঘ মাস—শীতটা কমে আসছিল এমন সময়ে বাদলা নামল। এমন দিনে কোথাও যাওয়া আসা করা আরামের না হলেও সেদিন ভোর ছটায় আমাকে গাড়ী ধরতে হ'ল—বাড়ী যেতে হবে। সুখের মধ্যে গাড়ীতে ভিড় ছিল না—একজন মাত্র কথা কবার লোক কামরায় ছিলেন।

লোকটী ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। ক্রমে পরিচয় হ'ল ও কথায় কথায় অর্দ্ধেক পথ যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম যখন নৈহাটী এসে গাড়ী থামল ও সশব্দে গাড়ীর দরজা খুলে একটী হ্যাটকোটধারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক সবেগে গাড়ীতে উঠলেন।

লটবহর ওঠানর হাঙ্গামা ও মুটের সঙ্গে বকাবকিতে আমাদের আলাপ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দোর দিয়ে হু হু করে বৃষ্টির ছাঁট ও শীতের হাওয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল। ভদ্রলোকটী বীরের মত দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—over coat-এর ওপর তাঁর বর্ষাতি মোড়া। ফুঁকো হাওয়া বা বাদলের ধারা তাঁকে একটুও টলাতে পারল না কিন্তু বর্ম্মচর্ম্মহীন আমার বুকটা গুরগুর করে উঠছিল।

গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে দালাল বাবুটী নবাগতের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন—"কোথায় যাবেন মশাই ?"

"চাঁদপুর।"

"বহুদূর যে!"

কথায় যোগ দেবার জন্য আমি বলে উঠলাম—"অনুপ্রাসের অট্ট-হাসি শোনা যাচ্চে", কিন্তু আমার রসিকতার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে চোরা চাহনিতে সে খবরটা জানিয়ে, ভদ্রলোক তাঁর দালাল বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বললেন—হাঁ একটু দূর বটে।

"কিন্তু এমন দিনে বেরোলেন যে? একে দূরের পথ তাতে এই দুর্য্যোগ আবার মেয়েছেলে সঙ্গে রয়েছেন"—

"কি করি মশাই ভাল দিনের জন্য আজ পাঁচ পাঁচ দিন এখানে বসে!"—ভদ্রলোকটীর প্রতি আমার মন প্রসন্ন হতে পারে নি। তাঁকে আঘাত করবার একটা সুযোগ তাই আমি অবহেলা করতে পারলাম না—বললাম "তাই বুঝি বেছে বেছে এই তেরস্পর্শ নিয়ে বেরোলেন?"

তেরস্পর্শ কি বলচেন মশাই!

"আমি বলচি নে—আপনার বন্ধুই বলচেন। দূর দুর্য্যোগ ও দয়িতা মিলে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মেই তেরস্পর্শ হয়েছে আমার কথায় হয় নি।"

ভদ্রলোক একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসতে হাসতে বললেন—"কিন্তু মশাই কি জানেন যে যাত্রার এমন দিন সচরাচর পাওয়া যায় না?"

"না পাওয়া যাবারই কথা। শীতকালের দিনে এমন বাদলা কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এমন দিন যে যাত্রার পক্ষে এত উপাদেয় তা জানা ছিল না।"

"পাঁজিখানা দেখলে আর ওকথা বলতেন না"—

"না আমি পাঁজি দেখি নি। দরকার হল বেরিয়ে পড়লাম"—

"পাঁজি ফাঁজি দেখেন নি। তাই খামকা বলে দিলেন যে দিনটা খারাপ। নিজে দেখেছি ত পাঁজি, তবু কথাটা শুনে বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছে। তেরস্পর্শ এমনি জিনিস।"

"পাঁজি দেখিনি বটে কিন্তু দিনটা সকাল থেকেই দেখে আসচি। জানা ছিল তেরস্পর্শ খুব খারাপ দিন তাই ভাবলাম যে আজ তেরস্পর্শ না হয়ে যায় না বিশেষ আপনার পক্ষে।"

ভদ্রলোক উত্তর করবার আগেই দালাল বাবুটী বললেন—"পাঁজিতে যখন যাত্রা লিখেছে তখন দিন ভাল হতেই হবে। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, যে বারটা যেন একটু কেমন কেমন বোধ হচ্চে না দাদা?" মেয়েরা বলে রবিবারে—

আপনিও তাই বলেন নাকি? লেখাপড়া শিখেও ও-সব মেয়েলি শাস্ত্র মানেন আপনি?

দালাল বাবুটি আর কথা কইতে পারলেন না—একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলেন। তাঁর হ'য়ে একটা কথা তাই আমাকে বলতে হ'ল—"মেয়েলী শাস্তর না হয় আপনারা মানলেন না কিন্তু মেয়েরাও যদি পৌরুষী শাস্ত্র না মানেন?"

ভদ্রলোক পরম বিজ্ঞভাবে উত্তর করলেন—"তাতে সুবিধা নেই মশাই তাতে সুবিধা নেই। সুবিধা হচ্চে শাস্ত্র মেনে চলায়। মেয়েরা সেটা বেশ বোঝেন—তাই আমাদের চেয়ে শাস্ত্র তাঁরাই বেশী মানেন। আপনি কি বলেন মশাই?"

ভদ্রলোক তাঁকে এই মধ্যস্থ মানায়, দালাল বাবুটি নিতান্ত আপ্যায়িত হলেন বলে বোধ হল; তাই তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন—"নিশ্চয়ই তা আর বলতে।"

"তা হতে পারে কিন্তু সুবিধার হিসাবে যে তাঁরা শাস্ত্র মানেন এ কথা বলা যায় কি?"

"তবে কি হিসেবে তাঁরা শাস্ত্র মানেন মনে করেন আপনি?"

"হিসেব ত পড়েই রয়েছে। এই ধরুন আপনার গায় জামাজোড়া যথেষ্ট রয়েছে দুর্য্যোগ আপনাকে পোয়াতে হচ্চে না, কিন্তু ভিজে শাল-খানি জড়িয়ে খালি পায়ে আপনার স্ত্রী দেখুন এখনো কাঁপচেন। সুবিধার হিসাব"—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে দালাল বলে উঠলেন—না মশাই আপনি যদি আমাদের মেয়েদের জুতো মোজা পরাতে চান তবে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেইও হবেও না। পরে ভদ্র-লোকটীর দিকে ফিরে বললেন—"আমি কেবল বলছিলাম যে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে এই দুর্য্যোগ।"

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বলে উঠলেন—"দুর্য্যোগ কি বলচেন মশাই—গাড়ীর মধ্যে আবার দুর্য্যোগ কি? এ কি গরুর গাড়ী? আর রবিবার ফবিবার যা বলচেন স্বামীর সঙ্গে যেতে তা বাছতে হয় না।"

"ওঃ তাও ত বটে—ঠিকই ত। স্বামীর সঙ্গে যেতে ত ওসব কিছুই বাছতে হয় না—স্বামীর সঙ্গে সহমরণ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এ ত শুধু সহগমন।"

কথাটা শুনে দালাল হেসে ফেলছিলেন কিন্তু ভদ্রলোকটাকে হটাৎ গম হ'য়ে যেতে দেখে, শেষে এমনি গম্ভীর ভাবে তিনি টাইমটেবল দেখতে আরম্ভ করলেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি সাহস করলাম না। অতঃপর রাণাঘাটে গাড়ী থামলে যখন আমি দু'জনকে নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লাম তখন দু'জনের কেউই আমায় তা ফিরিয়ে দিলেন না।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

তোতা কাহিনী।

——:০:——

(১)

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বক্‌শিস্ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি ?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্রমিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়ানাকড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিস্‌তুতো খুড়্‌তুতো এবং মাস্‌তুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিয়াছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়!"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না। পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই!"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি। কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখার মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কান-মলাসর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

(৬)

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্র দস্তুর মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার

আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায়রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এম্‌নি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখীটা মরিল।

কোন্‌কালে যে কেউ তাঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষীছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে ?"

"না।"

"আর কি গান গায় ?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্-খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বেহিসাবের নিকাশ।

সুখস্পৃহা জীবের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি মানুষের সহজ কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উক্ত প্রবৃত্তির প্রচারকল্পে পণ্ডিতেরা যখন মধুমক্ষিকা আর পিপীলিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিমুখ বা সন্দিগ্ধ মনকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস পান তখন সঞ্চয়ী লোকের হুল এবং বিষ সম্বন্ধেও কারো কারো মনে স্বতঃই একটা অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে।

প্রাণিজগতের ঐ সব স্বভাব-সঞ্চয়ী অধিবাসীবৃন্দের পদমর্য্যাদা মানুষের চেয়ে এত বেশী, আর তাদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত এতই বৈষম্য যে, তাদের সংস্কারগত সঞ্চয়পটুতার অনুকরণপ্রয়াসে আমাদের পক্ষে সম্যক সফল-কাম হবার সম্ভাবনা অতি কম! জন্মান্তরীণ সংস্কারের বশে যদিই বা কেউ এ কার্য্যে কতকটা সফলতা লাভ করতে সমর্থ হন, তা হলেও সমাজের দিক দিয়ে তার মূল্য যে কেমনতর, আর কতটা—তা নিয়ে তর্ক উঠবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে! হুলের ঘা মধুর প্রলেপে সারে কিনা—সমাজ-বৈদ্যগণ এখনও তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। সেইজন্যেই হয়ত এবেলা ওবেলা তাঁদের ব্যবস্থা বদলাচ্ছে। কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে শিখাচ্ছেন—"সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে", আবার পরক্ষণেই কানে পাক দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—"অর্থই অনর্থের মূল। "সভাপর্ব্বের"

পরে "বনপর্ব্বের" অবতারণা করছেন ;—"অশ্বমেধের" ঘটার পরে "স্বর্গারোহণের" অন্তর্জলীর ব্যবস্থা দিচ্ছেন !

এই সব অব্যবস্থিততা এবং অনবস্থিতি দেখে শুনে পণ্ডিতেরা সুখদুঃখময় সংসারটাকে চাকার সাথে উপমিত করে' নানান্ ভাষায় নানান্ ছাঁদে যে সব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বলা বাহুল্য, মীমাংসা তাতে কিছুই এগোয় নি—বরং পিছিয়েছে। অপণ্ডিতেরা তর্ক তুলছে—চাকাই বা হতে গেল কেন ? নৌকাও ত হতে পারত ! তাহলে ত গড়্গড়িয়ে না গিয়ে দিব্যি তর্তরিয়ে সর্সরিয়ে চল্‌ত ! দুঃখের ধূলা-কাদায় অমন নাস্তানাবুদ হয়ত হত না !

মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তিটার আরোপ নিশ্চয়ই আদিযুগের কোনো এক বিশ্বামিত্রের কাজ। এতে যদি ঈশ্বরের হাত থাক্‌ত তাহলে কি যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁর যে সব ওয়ারীশ বা সরিক অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—তাঁরা এর পরে এত বিরক্তি দেখাতে পারতেন ? মহর্ষির অভিপ্রায় সম্ভবতঃ মন্দ ছিল না। কিন্তু যা শাশ্বত নয় কালের বশে তার প্রয়োজনের পরিবর্ত্তন হবেই হবে ! সভ্যতার উন্মেষ-উষায় যখন শীতের কাপড়ের চেয়ে শীতের কাঁপুনি অনেক গুণে বেশী ছিল—তখনকার দিনের রোদে পিঠ দিয়ে বসার সার্থকতা এখনকার সামাজিক মধ্যাহ্নে আর ত নেই ! তাতে এখন শুধু স্বাস্থ্যহানি আর বর্ণকালিই সার হবে ! এখন এই দীপ্ত মধ্যাহ্নে "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" এ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করে এমন কোনো মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে এই প্রখর রশ্মিজ্বালা প্রত্যাহত হয়ে মৃদু আলোকমালায় পরিণত হতে পারে !

(২)

ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভবিষ্যতের জন্যে সংস্থান-প্রয়াসও যে অবশ্যকরণীয় সে বিষয়ে ত কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না! কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেই যে উক্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এমন মনে না করবারও যথেষ্ট হেতু রয়েছে! আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কোলে ঝোল টান্‌তে স্নুরু করি তাহলে, খুব সম্ভব, ঝোলে অচিরেই টান পড়বে। কারণ, বর্ত্তমানের ক্ষিদের চেয়ে ভবিষ্যতের লোভ অনেক বেশী। প্রত্যেকেই যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে রূপচাঁদের আভায় ফুট্‌ফুটে কর্‌তে প্রয়াস পাই তাহলে অনেকের ভাগ্যেই চিরকাল সর্‌ষের ফুল দর্শন অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। কারণ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এবং স্নুযোগের সম্মিলন আমাদের ভিতরে যাঁর ভাগ্যে জুটবে উক্ত লোভনীয় কার্য্যে "ইতি" দেবার প্রয়োজনীয়তা কখনো তিনি অনুভব কর্‌বেন না।

বর্ত্তমানের সম্ভোগ যতই বেহিসাবী হোক না তার একটা সীমা থাকবেই—পেটুকের পেট না ভরলেও তার চোয়াল ধরবে—কিন্তু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হচ্ছে অনেকটা অদৃষ্টকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা; পুরুষপরম্পরাক্রমে করলেও কোনো দিনও তার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

ব্যক্তিবিশেষের অপরিমিত অর্থসঞ্চয়-চেষ্টা যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হতে চুরির প্রয়াস সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সমাজের ডালপালা ছেঁটে, তার গলা চেঁচে সঞ্চয়ের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিলে

অনতিবিলম্বেই যে তা তাড়ি হয়ে উঠ্‌বে—সে ত অতি সুনিশ্চিত। হয়েছেও তাই। এ সামাজিক অকল্যাণ দূর কর্‌তে হলে ব্যক্তিগত জীবনকে তথাকথিত সঞ্চয়ের নেশা থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। যত দিন না সঞ্চয়-প্রবৃত্তির একটা নবতর সংস্করণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" আর "চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা" এ দুটী কথায় সময়ে সময়ে বিশেষ কোনোই তফাৎ থাকবে না।

অনেক সময়ে শুন্‌তে পাওয়া যায় মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির আধিক্যের ফলেই শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র আদি করে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষ আজ এত উন্নত। একথা ঠিক নয়! পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠবার একটা সহজ প্রেরণা জীবমাত্রেরই ভিতরে আছে। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষেতে এর চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তারি উন্মাদনাতেই মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব সব দিক দিয়ে প্রতিপন্ন না করে' স্থির থাক্‌তে পারে নি! মানব-সভ্যতার বস্তু আর ছন্দ দুইই নিতান্ত বেহিসাবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। হিসাব মাঝে মাঝে তাতে সুর যোজনা করেছে মাত্র। (আর তা যে অধিকাংশ স্থলেই বেসুরো বাজ্‌ছে—সে কথা বুঝতে হলে হিসাবের কানমলা থেকে কান বাঁচিয়ে চলা নিতান্ত দরকার)—মানুষের স্বাভাবিক চয়ন-লীলার পরে একটা সুদীর্ঘ ষট্‌পদী হিসাবের উপসর্গ চেপেই সঞ্চয়লোলুপতার সৃষ্টি করেছে। চড়নদারকে ঘোড়ার মালিক বলে' মনে করলে অনেক সময়েই ভুলের সম্ভাবনা থাকে—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে।

সঞ্চয়ের ধর্ম্মই হচ্ছে বর্ত্তমানের বিকাশ এবং ব্যাপ্তির যে মূল্য, যে পাথেয় তাই জমিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে পথ্যের সংস্থান। এ যেন

শিশুর আটকড়াই থেকে খই চিড়ে তার ভাবী শ্মশান-বন্ধুদের জন্যে তুলে রাখবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এমন হিসাবী অভিভাবকের হাতে পড়লে সমাজ-শিশুর ভবিষ্যৎ একটুও আশাপ্রদ হত না। কিন্তু সুখের বিষয় তা পড়ে নি। হিসাবী লোক কি কখনো "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ" নিরর্থক তাড়াতে যায়? পুষ্করিণীর মৎস্য তার চেয়ে ঢের বেশী উপাদেয় এবং নিরাপদও বটে। আশু চক্রবৃদ্ধির আশা না থাকলে হিসাবী লোক কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এমন কি রাঁধা-মাছ মারতে পারলে পুকুরের ধারেও যেতে চায় না। কাজেই এ হেন হিসাবী-তথা-সঞ্চয়ী লোকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলেই মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে একথা অনেকটা কাকের ডাকাডাকিতেই ভোর এসেছে বলার মতই সুসঙ্গত।

(৩)

মানব-সভ্যতাটা অভাবের তাড়নায় গড়ে ওঠে নি—ওবস্তু স্বভাবের-প্রেরণাতেই ফুটে উঠেছে। অভাবই যদি কর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা হ'তো তা' হ'লে খুব সম্ভব হাঁসেরা আজ পুকুর কাটতে শিখত; গরুরা কেবলি জাবর না কেটে মাঝে মাঝে আঁটি আঁটি ঘাসও হয়ত কাট্‌ত—আরো কত কি হ'তো! কিন্তু তা হয় নি—কারণ, ইতর জীবের অভাবের তাড়নার তুলনায় স্বভাবের প্রেরণা নিতান্তই অস্পষ্ট!—আর মানুষের অনেকটা তার বিপরীত। মানুষ শুধু অভাব মেটায় না নূতন নূতন সৃষ্টিও করে। এমন ধারা সৃষ্টি কার্য্যে তার যে খরচ তা' যে নিতান্তই বেহিসাবের বাজে খরচ সে কথা অস্বীকার করা চলে না!

মানব-সভ্যতার নব নব বিকাশশীলতা, নিত্যনব উদ্ভাবনপ্রবণতা ত' চিরদিনই এগিধারা বেহিসাবের অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে আস্ছে। হিসাবের উচ্ছিষ্টে নিশ্চয়ই তার পুষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাব-প্রবৃত্তি আর সহজ সামাজিক বেহিসাবের দ্বন্দ্বে যখন হিসাব জয়ী হয়—মানুষের মনুষ্যত্ব স্বতঃই মলিন হয়ে পড়ে।—প্রাথমিক-শিক্ষার অবাধ প্রচলনের প্রস্তাবের সাথে সাথেই তখন চাকর মজুরের সম্ভাবিত দুর্ম্মূল্যতার আর রায়েত-জনের অবশ্যম্ভাবী অবাধ্যতার আশঙ্কা আসে। হিসার ত' চিরদিনই সমাজের পকেট সংস্করণের জন্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে।—সমাজের কপালে রাজার টীকা সে ত' বেহিসাবেরই আঙ্গুল-কাটা রক্তের টিপ্!

বেহিসাবের আতিশয্যের উত্তেজনায় যদি কেউ আঙ্গুল না কেটে নিজের গলাও কেটে বসে তাতে তার ব্যক্তিগত যতই ক্ষতি হোক না, সমাজের উন্নতি-স্রোতে তা' জলবিম্বের মতই নির্ব্বিবাদে মিশে যাবে। আর, বেহিসাবের প্রতি বীতরাগ হয়ে সমাজে যদি কেবলি সঞ্চয়-প্রবৃত্তির বীজ বপনের কাজ চল্‌তে থাকে তা' হ'লে খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই নিজের আঙ্গুল নিরাপদ কর্‌তে পরের গলায় ছুরি বসাবে। হত্যা আর আত্মহত্যা এতদুভয়ের কোনোটিই বরণীয় না হ'লেও দুটাই সমান দূষণীয় নয়। বেহিসাবের অবিবেচনার প্রশমন কল্পে সমাজে সঞ্চয়ের কার্পণ্যের পোষকতা কখনো পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অমিতব্যয়ী বেহিসাবীর যে দণ্ড তা' সেই বহন করে থাকে; আর অপরিমিত সঞ্চয়-লালসার নৈতিক আর্থিক পারমার্থিক সর্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত সমাজের ছোট বড় মাঝারি সবাইকেই কর্‌তে হয়!

তবু মানুষের সঞ্চয়ের নেশা ঘোচে না। নেশার ধরনই নাকি ঐ! নেশার ঝোঁকে মানুষ যখন পদে পদে ভূমিসাৎ-ড্রেনসাৎ হতে থাকে তখন তার সন্দেহ হয়—পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের অচলতায় আর রাস্তার ধারের ঐ ড্রেনগুলোর স্থিতিশীলতায়।—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে সংসারের বিকৃতিটাকেই আমরা তার প্রকৃতি বলে ধরে নিয়ে "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিতরে" তারপরে ইত্যাকার সব করুণ সুরের সারি-গা-মা সাধ্‌ছি!—উচিত আমাদের জমাখরচের খাতা পুড়িয়ে ফেলে বেহিসাবের তরফ থেকে অর্থনীতি-শাস্ত্রের "পরিশোধিত সংস্করণ" বের করা।

মাঘ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত

জাতীয়জীবনে সাহিত্যের উপযোগীতা।

(১)

নানা রকমের খেল্‌না সংগ্রহ করে শিশুরা বড় ঘরবাড়ীর বড় সংসারটির ভিতর তাদের আপ্‌নার ছোট্ট একটি সংসার পেতে বসে। সেইখানে তাদের পূরো স্বাধীনতা। বৃহৎ একটি সংসারের অভিজ্ঞতার উপর তাদের ক্ষুদ্র সংসারটির প্রতিষ্ঠা বটে; কিন্তু মোটেই তার শাসনাধীন নয়। সে সংসার তাদের আপনার সৃষ্টি। তার মূলে আছে তাদের শিশু-অন্তরের স্বাধীন কল্পনা।

মানুষ তেমনি ভগবানের সৃষ্টির মাঝখানে আপনার একটি পৃথক সৃষ্টি গড়ে তুলেছে। মানুষের মনুষ্যত্ব তার ঐ আপনার সৃষ্টিতে। আর ঐখানেই মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা। মানুষের সৃষ্টির মূলে যদিও বিশ্বপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা আছে, প্রকৃতির শাসন সে সৃষ্টি মানে না। সে সৃষ্টির বীজ-কোষ মানুষের আপনার স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চিন্তা।

বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির একটি জায়গায় বেশ একটা মিল দেখা যায়। উভয় সৃষ্টিরই বাইরের একটা রূপ আছে, আর সে রূপের আড়ালে আছে একটা অরূপ শক্তি। বিশ্ব-সৃষ্টির বাইরের রূপ হচ্ছে বিশ্ব-বস্তু, আর তার আড়ালে আছে বিশ্ব-শক্তি। মানুষের সৃষ্টির রূপের পরিচয় মানব-জাতির সভ্যতার বাইরের নিদর্শনগুলোতে, আর সে সৃষ্টির অন্তরের যে শক্তি, সেটা হচ্ছে মানব-মনের চিন্তার ধারা।

ঐ চিন্তার ধারা,—বিশ্বমানব-মনের চিন্তার ধারাই মানুষের সাহিত্য। সাহিত্যের উপরই জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠা; কেননা প্রত্যেক জাতির নূতন নূতন সৃষ্টিই জাতীয়জীবনের গতি এবং সমৃদ্ধির পরিচয়। ঐ সৃষ্টির ভিতরেই জাতির প্রাণের স্পন্দন।

মানুষের দেহটা যখন প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে, ভিতরের একটা বিষাক্ত বাষ্পে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার বিকৃতি ঘটে। ঐ দূষিত বাষ্প জাতির অন্তরেও জমে ওঠে, যখন জাতীয় মনের যে চিন্তার ধারা জাতির সাহিত্যে প্রবাহিত হয় তার গতি-বেগ প্রবল এবং অপ্রতিহত না থাকে। গতিই ত প্রাণ। গতি প্রতিহত হলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিষাক্ত বাষ্পের উদ্ভব জীবন্ত দেহেও ঘটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ রক্ত-স্রোত বিশুদ্ধ রাখ্‌বার জন্য একটি অন্তর-অঙ্গ সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকে। যে রক্ত-স্রোত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা-উপশিরায় সঞ্চালিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দূষিত হয়ে ওঠে; দেহের ঐ অন্তর-অঙ্গটি বাইরের উপাদান এনে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই দূষিত রক্ত-ধারাকে শোধন করে। সাহিত্য-প্রতিভা জীবন্ত-জাতিদেহের ঐ রকমের একটি অন্তর-অঙ্গ বিশেষ। বিশ্ব-মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যে একটা যোগ আছে বা থাকা দরকার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই, সে জাতীয় মনের বদ্ধ আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে। তখন প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরাই সে জাতির অন্তরে বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়া সঞ্চারিত করে জাতির জীবন রক্ষা করে। সাহিত্যিকেরাই জাতীয় রোগের প্রকৃত চিকিৎসক।

রোগ-চিকিৎসার একটা নূতন পদ্ধতি আমরা একালে দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঐ নূতন প্রণালীতে যাঁরা চিকিৎসা করেন, তাঁদের মূল মন্ত্রটি হচ্ছে এই,— If you think diseased thoughts you attract disease, if

you think healthy thoughts you attract health. এঁরা দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে দেহীকেই ধরে বসেন। এঁদের কথা, রোগের যে সব লক্ষণ মানুষের শরীরে প্রকাশ পায়, সেগুলো মনের রোগেরই বাইরের রূপ। এই কারণে চিকিৎসক সম্মোহন-বিদ্যার (hypnotism) বলে রোগীকে যাদু করে তার মন থেকে রোগ-বিভীষিকা তাড়িয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাব তার অন্তরে সঞ্চারিত করেন। এই প্রণালীর চিকিৎসা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর ফলদায়ক তা ঠিক বল্‌তে পারিনে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জাতীয়রোগের চিকিৎসার ঐ একমাত্র পদ্ধতি। জাতীয়জীবনে যখন নানা রকমের বিকৃতি-বীভৎসতা দেখা দেয়, তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা বিচক্ষণ চিকিৎসকেরই মত বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সমগ্র জাতীয়মনকে মুগ্ধ করে জাতির অন্তরে আপনার স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাবসকল সঞ্চালিত করতে এবং সমস্ত জাতিকে নব নব উচ্চতর আদর্শে গড়ে তুল্‌তে সমর্থ হন। আপনার মনের চিন্তাধারা সমস্ত জাতির অন্তরে প্রবাহিত করতে সাহিত্যিক যে রীতিটি অবলম্বন করেন, সেইটি হচ্ছে সাহিত্যের আর্ট। জাতীয়-জীবনের উপর সাহিত্যের আর্ট-বস্তুটির প্রভাব কতটা, এবং আর্টের সাহায্যে জাতীয়জীবনের কতদূর উৎকর্ষ-সাধন হয়েছে, সে আলোচনার পূর্ব্বে, আর্টের পরিচয় কি, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যা'ক।

ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যসমালোচক আর্ট সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই তিনটি,—জীবনের ব্যাখ্যা, The interpretation of life; জীবনের আলোচনা, The criticism of life; এবং জীবনের নব নব বিকাশ, The expression of life.

আর্টের একটি সার্থকতা তাহলে এই যে, তাতে আমরা দেখি, নব নব রূপে জীবনের প্রকাশ, অর্থাৎ জীবনের নূতন আদর্শের সৃষ্টি। নূতন আদর্শের প্রয়োজনটা কি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। কালের শাসন যে কেবল মানুষের রক্তমাংসের দেহটাকে মেনে চল্‌তে হয়, তা নয়, কালের হুকুমে মানুষের পুরোণো মনোভাব-গুলোকেও নতুনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। আর মানুষের মনের আইডিয়া যখন বদ্‌লে যায়, তখন জীবনের আইডিয়ালের পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। কেননা, মানুষের মনের আইডিয়ার অনুরূপ তার জীবনের আইডিয়াল যদি না হয়, তার অন্তরে বাহিরে একটা বিরোধ ঘটে। মানুষ এ অবস্থাতে আপনাতে আপনার বিশ্বাস হারায় এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতা করে। এমনি ভাবে নানা রকমের বিকৃতি তার প্রকৃতিতে ঘটে। এতে করে তার আত্মশক্তি দিন দিন হ্রাস হয়ে আসে। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষে ঐ একই কথা, কেননা, ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই ত জাতি।

In the course of life, the outer and the inner remain in incessant conflict and one must therefore arm himself to maintain the ever-renewed struggle,—Goethe নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথাটি বুঝেছিলেন, এবং আপনার অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করবার যে শক্তি তিনি নিজের জীবনে অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমগ্র জর্ম্মাণ জাতিকে সেই শক্তি দান করে, জর্ম্মাণীর জাতীয়জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধন তিনি করেছিলেন। Goethe-র জর্ম্মাণীতে জাতীয়জীবনের যে বিকৃতি ঘটেছিল, তার কারণ আইডিয়ার অভাব নয়, অশরীরী

আইডিয়ার জীবন্ত সাকার-মূর্ত্তির অভাব। নতুন নতুন আইডিয়াতে দেশের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল! কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সেই আইডিয়াকে প্রয়োগের সময় জর্ম্মাণজাতির সঙ্কোচ এবং দুর্ব্বলতার অবধি ছিল না। ফরাসীদেশে নব ভাবের যে বান এসেছিল, তার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস সে দেশের সীমানা অতিক্রম করে জর্ম্মাণীতে এসে পৌঁছেছিল। জর্ম্মাণ-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছিল। জর্ম্মাণ-সমালোচকেরা পুরাতন আচার-বিচার, রীতি-নীতি পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করতে সুরু করেছিল। নূতনের আক্রমণে জাতীয় মনের পুরাণো আইডিয়াগুলো অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু নূতন আদর্শের অভাবে জীবনের পুরাতন আদর্শের খোলসটা রয়েই গিয়েছিল। জাতির নবীন মন জীবনের পুরাতন আদর্শের বিধি-বিধানের শিকলে বাঁধা পড়েছিল। তাতে রুদ্ধগতি রক্তস্রোতের মত ঐ রুদ্ধমনের চিন্তাধারা দূষিত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থা থেকে জর্ম্মাণজাতিকে রক্ষা করেন Goethe, Schiller, Heine প্রভৃতি সাহিত্যিকেরাই। তাঁরা এই নতুন আইডিয়াগুলোকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, আশ্চর্য্য স্পষ্টতা এবং অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত করেন। এঁরা নতুন নতুন ভাব নিয়ে জীবনের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে জর্ম্মাণ-জাতির সুমুখে খাড়া করেন। Goethe-র অধিকাংশ চরিত্রই ত নিরাকার আইডিয়ার জীবন্ত সাকার রূপ।

দর্শন বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার অনুরূপ জীবনের নতুন আদর্শ যে জর্ম্মাণ-সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল, সে সাহিত্য যে মঙ্গলের সৃষ্টি, তার

প্রমাণ Goethe-র এই বাক্যে,—It may now without arrogance be asserted that German Literature has effected much for humanity that a moral-psychological tendency pervades it, introducing not ascetic timidity, but a free culture with nature and in cheerful obedience to Law.

(৩)

একটি কারণ দেখানো গেল। নতুন ছাঁচে জীবনের আদর্শ গড়ে তোলবার প্রয়োজন আরো অনেক কারণে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে, অথবা ভিতরের অবস্থার পরিবর্ত্তনে, অনেক সময় জীবনের সনাতন পথটি রুদ্ধ হয়ে আসে, তখন জাতির কল্যাণ নতুন পথের সৃষ্টিতেই। কেননা, আত্মপ্রকাশের সহজ পথটি যখন নেই, তখন মানুষের পক্ষে চোরাগলির অনুসন্ধানে ফেরাটা বড় অস্বাভাবিক নয়। ঐ অবস্থাতে জাতির অন্তরে হীনতা এসে পড়ে। আর সেই হীনতা যাদের মন আছে তাদের মনকে পীড়া দেয়; মানুষের দুঃখ তাঁদের মনকে কষ্ট দেয়—কিন্তু তার চাইতে বেশী কষ্ট দেয় মানুষের অবনতি। প্রাণের ঐ বেদনা থেকেই সাহিত্যিকদের অন্তরে আসে সৃষ্টির তাগিদ। তাঁদের সৃষ্টি জাতির মঙ্গল সাধন করবেই, কেননা সে সৃষ্টির গোড়াতে আছে মায়ের প্রাণের মঙ্গল-কামনা।

যাঁদের অন্তরের সম্বল কেবল স্পর্দ্ধা, তাঁদের উপর সমাজের শাসন-ভারই অর্পিত হয়েছে, তাঁরা চান কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষের

প্রাণটাকে দমন করতে। পরের দুঃখে তাঁদের অন্তরে ব্যথা বাজে না। বেদনা-বোধ তাঁদের নেই। অপরপক্ষে আত্মপ্রকাশের সনাতন পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আসাতে, জাতির প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে মরবার উপক্রম হয়, তখন যে মণীষীরা নতুন পথ গড়বার শ্রম স্বীকার করেন, সাহিত্যে যাঁরা জীবনের নতুন নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেন, পরের দুঃখটা তাঁরা আপনারাই বোধ করেন। পরের অধোগতিতে তাঁরা নিজেদের অপদস্থ মনে করেন। সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য জাতীয় জীবনের হিতসাধন এবং জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন যে করবে, এ ত ধরা কথা।

একটা উদাহরণের দ্বারা এ মতের সমর্থন করা যাক। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের আইডিয়ালের একটা পরিচয় স্ত্রী-পুরুষের ভিতরে সখ্যভাবের (friendly comradeship) আদর্শে। যৌনসম্বন্ধ যখন এই নব আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমি নয়, তখন দেহের আকর্ষণ এই মিলনের কারণ হতে পারে না। মনের শক্তি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানব-মনের সঙ্গে মানব-মনের মিলনই হচ্ছে এই নব আদর্শের ভিত্তি। এখন এই আদর্শের কি প্রয়োজন, এবং এতে করে জাতীয় জীবনের কোন্ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা করবার সামর্থ্য আমার অবশ্য নেই, তবে মোটামুটি দু' চারটি কথা বলতে পারব, এ ভরসা আছে।

মানব-প্রকৃতি জড়-প্রকৃতির নিয়মাধীন, এই সিদ্ধান্তে আস্থাবান একজন জর্ম্মাণ জড়বাদী স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যে প্রণয়, তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন, অণু-পরমাণুতে যে কারণে রাসায়নিক যোগ সংঘটন হয়, ঐ প্রণয়ের মূলে সেই একই কারণ বর্ত্তমান। জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতটি আমি অগ্রাহ্য করিনে। কিন্তু এখানে আমার বলবার কথা এই

ভাস্কর তাঁর যে মানসী মূর্ত্তি পাথর খুদে বের করলেন, তার দিকে আমরা যখন চাই, পাথরটাই কি তার ভিতর আমাদের কাছে সত্য-বস্তু বলে মনে হয়, না ভাস্করের কল্পনাই সেখানে সত্যরূপ ধারণ করে? স্ত্রী-পুরুষের যে প্রণয়, তার মূলে যাই থাক, বর্ত্তমানে তার শোভা-সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ মানুষের মনের ক্রিয়ারই ফল। মূলে যার সৌন্দর্য্যের অভাব তাকে সুন্দর শোভন করে তুলবে, এ সামর্থ্য সাহিত্যের আছে। আমাদের ভিতর যেটা কুৎসিৎ, সেটাকে শ্রীযুক্ত করবার ভার সাহিত্যের উপরই ন্যস্ত। কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইহলোকের মালমসলা নিয়েই আর একটি কল্পলোকের সৃষ্টি করা—যে লোক এই মাটির পৃথিবীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দর ঢের বেশী সত্য এবং ঢের বেশী অক্ষয়।

সাহিত্য ব্যক্তির মনকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেছে, তাতে জাতীয়-মনের সৌন্দর্য্য এবং সম্পদ বেড়েছে। এরপর গোটা জাতিটার উপরেও সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে। যে গণতন্ত্রীয় শাসন-প্রণালী, আজকের দিনে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ইউ-রোপের এমন দিন ছিল, যখন তার কাছে ওটি স্বপ্নের চেয়েও অলীক ছিল। দরিদ্রজনসাধারণের কাছে সে দেশের ধনী জমিদার 'ধর্ম্মাবতার প্রবল প্রতাপান্বিত' ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই অস্বাভাবিক ব্যবধান, ইউরোপের সাহিত্যিকেরাই দূর করেছেন। তাঁরাই সাম্য-বাদের উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারপর মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সৃষ্ট সাহিত্য বিগত ৪০ বছরের মধ্যে আমাদের জাতীয়মনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করেছে, তা চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়।

(৪)

সাহিত্যে পাওয়া যায় ভাবীজীবনের পূর্ব্বাভাষ। এমন একদল লোক সকলদেশেই আছেন, সাহিত্যের ঐ নূতন আইডিয়ালটাকে যাঁরা শনির অবতার মনে করেন। এঁদের সাধ বেশ আয়েস করে চিরপুরাতনের গুহায় ঘুম দেন। নতুনকে বরণ করে নেবার শ্রম-স্বীকার এঁদের ধাতে নেই। কিন্তু মানুষ আপনার খুসিতে যদি চলতে না শেখে, কালের কষাঘাতে একদিন তাকে নতুনের পথে এসে দাঁড়াতেই হয়। কালের ধর্ম্মে যেটা একদিন আস্‌বেই সাহিত্য তার পূর্ব্বপরিচয় যদি করে দেয় তাতে দোষ কি? বরং সুবিধেই আছে। নতুনের সঙ্গে যেদিন সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তাকে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করে ভয় পাব না, তার সঙ্গে যে আমাদের আগে থাক্‌তেই পরিচয় হয়ে গেছে এইটে দেখে খুসি হয়ে তাকে বরণ করতে পারব। সেই অনাগত বন্ধুর দ্বাররোধ করে নিজেদের কল্যাণকে বিমুখ করব না। আর কালের গতি যে বড়ই কুটিল, প্রতিকাজ-কর্ম্মে আমাদের এ অভিযোগ খাড়া করতে হবে না।

সমাজের প্রায় সকল-ক্ষেত্রেই ত দেখছি, নূতন-পুরাতনের একটা দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। পিতা-পুত্রের শ্বাশুড়ী-বধূর আইডিয়ার গরমিল থাকাতে মনের অমিল ঘট্‌ছে। নবীন প্রাচীনের শাসন মান্‌ছে না। প্রাচীন নবীন প্রাণের আব্‌দার সইছে না। এতে করে সমাজের ভিতর অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আর দোষারোপ হচ্ছে কাল-বেচারীর উপর, যেহেতু তার একটা গতি আছে। চিরপুরাতনের মধ্যে সে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। নূতন নূতন পথ বেয়ে তাকে চল্‌তে হয়। জাতীয়মনে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা বড় বেশী সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠ্‌তে পারে না, যদি সাহিত্য পূর্ব্ব হতে এসে পুরাতনকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, যে সাহিত্য জাতীয়জীবনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। সকল স্থলেই অভিযোগটি যে একেবারে মিথ্যা, সে কথা অবশ্য বলিনে। তবে অধিকাংশ স্থলেই এ অভিযোগের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকে না। যাঁদের এ অভিযোগ তাঁদের প্রকৃতি—যাঁরা চরিত্রের কলঙ্ক রট্‌বে এই আশঙ্কায় চিকিৎসকের কাছে আপনার ব্যাধি গোপন রাখেন, যে পর্য্যন্ত না ভীষণ আকারে তা দেখা দেয়,—ঠিক তাঁদেরই মত।

যাঁরা প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁদের একটা গুণ, তাঁদের প্রাণের সরলতা। তাঁদের অন্তর-বাহির একেবারে স্বচ্ছ। মানুষ ভিতরের কলুষ গোপন রেখে, বাইরে সাধু সাজবে এ কপটতা তাঁদের চক্ষুঃশূল। তাই জাতিরও অন্তরের যে গলদ, সাহিত্যিক সেটাকে সমাজের সাম্নে ধরে তার আলোচনা করেন। কিন্তু অনেকেরই সাধ, আত্মগোপন করে, বাহিরে সাধু সাজেন।

তারপর সমাজ-কর্ত্তাদের সঙ্গে সাহিত্যিকদের একটা বিরোধ অনেক সময় দেখা দেয়। উভয়-পক্ষের উদ্দেশ্য এক হলেও, পথটা অনেক সময় বিভিন্ন। অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের স্বভাবটাকে মানুষের কাছে গোপন রাখ্‌বে, এ সাহিত্যিকদের অভিপ্রায় নয়। তাঁদের কথা, আইডিয়ালের-বলে মানুষের অন্তরটাকে যখন ফুলিয়ে ফাঁপিয় তোলা যায়, তখনই মানুষ আপনার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ছাড়িয়ে অনেক উর্দ্ধে উঠ্‌তে সক্ষম। সাহিত্যিক তাই, অসাধ্য-সাধনের ব্রতগ্রহণে মানুষের মনকে আহ্বান করেন। সাহিত্যিকদের কাছ থকে এর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

Goethe তাঁর Affinities বইতে মানুষের প্রকৃতিকে যেন রাসায়নিক প্রণালীতে বিশ্লিষ্ট করে, তার ভিতরের হীনতা দুর্ব্বলতা

মানব-সমাজের সুমুখে ধরলেন। কিন্তু Goethe কি বাস্তবিকই সমাজে দুর্নীতি প্রচার করলেন? তিনি দেখালেন, মানুষ যখন আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করে, তখন তার অধোগতি কতদূর সম্ভব, আর ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়ে কত ঊর্দ্ধে উঠতে পারে। Edward ছিল স্বীয় প্রকৃতির দাস, কিন্তু Edward ত Goethe-র আদর্শ-চরিত্র নয়। মানুষ আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করবে, এ শিক্ষা Goethe কখনও দিতে পারেন না। কেননা, Goethe-র কথা,—Man alone

Can achieve the impossible.

Goethe-র শিক্ষা মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির বলে, অসাধ্যসাধন করবে। ঐ অসাধ্যসাধনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। Goethe-র যা শিক্ষা, সেই একই শিক্ষা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা দিয়েছেন। তাঁরাই মানুষকে আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আর সে আকাশ-কুসুম লাভ করবার উৎসাহ-উদ্দীপনা মানুষের অন্তরে জাগিয়েছেন। মানুষ ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে যে উন্নত হয়েছে, সে তার আস্তা-কুঁড়ের দিকে নজর রেখে নয়, আকাশ-কুসুমে লক্ষ্য রেখে। আকাশের কুসুম হয়ত আকাশেই রয়ে গেছে, কিন্তু তার লাভের সাধনা থেকে মানুষ শক্তি পেয়েছে,—আপনার পশুত্বের সীমা অতিক্রম করে, দেবত্বের উচ্চতর লোকে অগ্রসর হতে।

It is the striving after, not the attaining of ideals, that is the motive-power behind human endeavour. Ideals recede farther and farther as we advance, but we rise towards the stars as we seek them—জর্ম্মাণজাতি

যখন আকাশ-কুসুমে বিশ্বাস হারিয়েছিল, Schiller তার কানে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন।

(৫)

এতক্ষণ যে কথা বললুম, সেটা বিশেষ করে সাহিত্যের সৃষ্টির দিকটা নিয়ে, তার আর একটা দিক আছে, সেটি হচ্ছে ধ্বংসের দিক। Criticism of life, বা জীবনের সমালোচনা,—আর্টের এই লক্ষণটি বেশী স্পষ্ট হয়ে সাহিত্যের এই দিকটায় ফুটে ওঠে। জাতীয়-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই ধ্বংসের দিকটার কি সম্বন্ধ তার আলোচনা করা যাক।

মানুষের মনের সম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করবার ভার সাহিত্যের হাতে। তবু মানব মনকে সবল ও সুশ্রী করে গড়ে তুলতে হলে, মানুষের ভিতরের জীর্ণতাতে আঘাত করে, পুরাতনকে ধ্বংস করতে হয়। ওটি ভগবানেরই বিধান, কেননা তিনি তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা করবার জন্য কেবল যে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে নতুনের সৃষ্টি করছেন তা ত নয়, পুরাতনকে ধ্বংস করবার জন্য সংহার মুর্ত্তিও ধারণ করছেন। সাহিত্যেও ঐ দেবতার আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন, কেননা পুরাতনকে ধ্বংস না করলে, সেখানে নতুনের সৃষ্টি জীর্ণ-বাড়ির নতুন রঙ্-ফেরানো মাত্র হবে।

বাহির থেকেই এ-সাহিত্য তার শক্তি-অর্জ্জন করে। জাতির আপনার গণ্ডির ভিতর, বদ্ধ এবং দূষিত আবহাওয়াতে এ সাহিত্য পুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত নয়। বিশ্বের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপাদানেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দেশবাসীর মনোরঞ্জন করা

নয়, আঘাত করাই এ সাহিত্যের কাজ,—জাতির অন্তরে যেখানে হীনতা, কপটতা এবং সঙ্কীর্ণতা, সেইখানে আঘাত করা। এ সাহিত্য যাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের বিরুদ্ধে সকল দেশই এই অভিযোগ খাড়া করা হয়, যে তাঁরা স্বদেশ-দ্রোহী, স্বজাতি-বিদ্বেষী। Goethe যখন তাঁর স্বজাতির মনে আঘাত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ আনা হয়েছিল। Goethe তার যে জবাবটি দিয়েছিলেন, আমার মনে হয়, এঁদের সকলের পক্ষ হতে ঐ একই জবাব দেওয়া যেতে পারে,—What is meant by love of one's country? If the poet has employed life in battling with pernicious prejudices, in setting aside narrow veiws, in purifying the tastes of his countrymen, what better could he have done?

দেশের প্রতি অন্ধভক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের যথার্থ হিতসাধক নন। জাতির মঙ্গল-সাধন তাঁদের দ্বারা হয় না, যাঁরা জাতির অন্তরের যত কলুষ চাপা দিয়ে রেখে, শতমুখে তার প্রশংসা করেন। দেশবাসীর অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার, এবং জাতীয় মনের হীনতার উপর আঘাত করবার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের বা জাতির পরমমিত্র। আমার ত ধারণা, জাতীয়জীবনের Sanitation-বিভাগের কাজ-কর্ম্ম তখনই বেশ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হতে পারে, যখন তার portfolio সাহিত্যের প্রলয়-দেবতা এসে হাতে নেন্। এ সিদ্ধান্ত আমার কোন যুক্তির বলে, তা নির্দ্দেশ করছি।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনের অনেক বিধি-বিধান এবং প্রথা-পদ্ধতির প্রাণ-বিনাশ হয়েছে, কিন্তু তাদের জায়গাটি জুড়ে

তাদের শব পড়েই রয়েছে। এর কারণ কি, তার উত্তর দেবে, যাঁরা মৃত-দেহের সৎকার কখনও করেছেন, তাঁদের আপনার অভিজ্ঞতা। মানুষের মৃত্যুর পর, তার শবটার উপর তার আত্মীয়-স্বজনের মায়া বড় কম নয়। কিন্তু সে মায়াকে কাটিয়েও সে দেহের সৎকার করাতেই গৃহের মঙ্গল।

যে সব সাহিত্যিক, জাতির মঙ্গলের জন্য জাতির অন্তরে আঘাত করেন, তাঁদের তুলনা,—যাঁরা মায়ের প্রাণে তীব্র-বেদনা দিয়ে মায়ের কোল থেকে মৃতশিশুটিকে কেড়ে নিয়ে যান শ্মশানে তার সৎকার করতে,—তাঁদেরই সঙ্গে। যখন দূষিত বাষ্পে জাতীয়মনের আব্‌হাওয়া বিষিয়ে ওঠে, তখন ঐ শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই জাতির মানস-পুত্র এবং মানস-কন্যাদের মৃতদেহের সৎকার করে জাতীয়জীবনের মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ।

(৬)

সাহিত্যে আর এক প্রকারের শ্রেণীবিভাগ আছে। মানব-প্রকৃতির যেমন দুটো দিক আছে, ভাবের এবং বুদ্ধির দিক। মানব-মনের সৃষ্টি, সাহিত্যেরও তেমনি দুটো দিক, একটি হচ্ছে তার ভাবের দিক, আর একটি হচ্ছে বুদ্ধির দিক।

ভাবের প্রাচুর্য্য যে সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য—তার সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলা আবশ্যক। একদল সমালোচক আছেন, ভাবপ্রধান সাহিত্যকে তাঁরা বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। তাঁদের মত, এ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়জীবনের কোন মঙ্গল সাধন হতে পারে না। এঁদের এই মতের সত্যাসত্য বিচার করে দেখা দরকার মনে করি।

ভগবানের এই বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধে একটি মত প্রচলিত আছে, সেটিকে anthropocentric dogma বলে ; যাঁরা ঐ ডগ্‌মাটি মেনে চলেন, তাঁদের ধারণা একমাত্র মানবজাতির জন্য ভগবান এই বিশ্ব-প্রকৃতি রচনা করেছেন। এই হেতু তাঁদের পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক হবে, যদি বিশ্বের যে যে বস্তু মানবজাতির কোন কাজে না আসে, সেগুলোকে তাঁরা ভগবানের বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। ভগবানের বিরুদ্ধে ঐ বাহুল্য-সৃষ্টির অভিযোগ মানুষের অন্তরে আছে কিনা, তা জানিনে, প্রকাশ্যভাবে সে অভিযোগটি উপস্থিত করতে কেউ কোন দিন বোধ হয় সাহস করেন নি। কিন্তু কবি যে কাব্য লিখলেন, তা যদি কোন সমালোচকের অভিরুচির অনুরূপ সৃষ্টি না হয়, তখনই সে কবির বিরুদ্ধে সমালোচক অভিযোগ উপস্থিত করেন।

ধরুন, কোন কবির অন্তরে ভাবের খুব প্রাচুর্য্য। তিনি অন্তরের ভাবে বিভোর হয়ে প্রাণের কথা শোনালেন, যাঁদের প্রাণ আছে তাঁদের। আর সমালোচক,—যাঁর বুদ্ধির দিকটায় জোয়ার এসে থাকবে, কিন্তু ভাবের দিকটায় হয়ত ভাটা পড়েছে, কবির সঙ্গে প্রকৃতিগত অনৈক্য বা রুচির বৈষম্য ঘটায় কবির সৃষ্টিকে তিনি নিরর্থক মনে করলেন। কিন্তু একমাত্র মানবজাতির জন্য যেমন ভগবানের সৃষ্টি নয়, কবির সৃষ্টিও তেমনি কোন ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা কোন উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য নয়। সমালোচক, কবির যে সৃষ্টিকে নিরর্থক মনে করলেন, জাতির কাছে তার যদি কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে, তাহলে তাকে বাহুল্য-সৃষ্টিমাত্র মনে করা সঙ্গত নয়।

জাতির দিক থেকে এইবার বিচার করা যাক। জাতি অর্থে ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির

বল্লুম, কেননা, রুচি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের ভিতর চিরদিনই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সমালোচকের যে প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির এবং ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তি জাতির মধ্যে অনেকেই থাকবেন, এটা বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। ভাবের দিকটাই যাঁদের অন্তরে প্রবল, ভাবের দিক থেকে যে সাহিত্যে সৃষ্টি, সেই সাহিত্যই তাঁদের পরম সম্পদ। কবির কাছে প্রাণের কথা না শুন্‌লে এঁদের অন্তরাত্মা গুম্‌রে মরে। ভাবের প্রাবল্যহেতু কবির সৃষ্টিকে বাহুল্য-সৃষ্টি জ্ঞান করে দেশ থেকে কোনজাতি যদি তাকে নির্ব্বাসিত করে, তাহলে সে জাতির গড়ন কখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। দেহের শ্রী তার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে, একটি অঙ্গ যদি খর্ব্বাকৃতি হয়, তাতে সকল দেহের শ্রীহানি হয়। জাতীয়মনের একটা দিক যদি শুকিয়ে যায় আর একটা দিক যদি ফুলে ওঠে, তাহলে সে মনের চেহারা সুসঙ্গত এবং সুন্দর হতে পারে না। জাতির সভ্যতা তখনই পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠ্‌বে, যখন তার সাহিত্যের সকল দিকের সমান উৎকর্ষ সাধিত হবে। সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়জীবনের সম্বন্ধ কোন একটা দিকের সম্বন্ধ ত নয়; জাতির রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবন, তার আভ্যন্তরীণ যে শক্তির বলে সুস্থ সুশ্রী এবং সবল হয়ে ওঠে, সাহিত্যই সেই শক্তির আধার।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

হৈরা।

(মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত)

মা-বাপমরা ছোট ছাওয়ালটীরে যেদিন গায়ের একজন গিরস্ত লোক মাসির বাড়ীতে আইনা দিয়া গেল, সেইদিন থিকা তার মাসি সেই হাড্ডিসার ছোট ছাওয়ালটীর ক্যাবল যে আশ্রয়স্বরূপ হৈল তা না,—বেওয়া বিধবা মাসির অপায়া সংসারটাও য্যান একটা কিছু হাতের সাম্‌নে পায়্যা আস্তে ধীরে গুছায়্যা উঠব্যার্ লাইগ্‌ল। বাপ-মায় কি বৈলা যে ছাওয়ালটারে ডাইক্‌ত, আইনা-দেওয়া লোক্‌টী তা কিছুই কইব্যার পারে নাই। দিন চাইরেক কোকন বৈলা ডাইক্‌ব্যার পরে মাসির মনে বইন্‌পুতের একটা নাম মন-উক্কেই জোয়ায়্যা উঠ্‌ল ; সে বইন্‌পুতের নাম রাইখ্‌ল গয়ানাথ। ইস্তককাল গয়ার পিণ্ডির কথা মনে হৈতে মাসি তিনকুল বিচ্‌রায়্যা কাক প্রাণীডাও পাইত না, বৈতরণী পার হওয়নের কথা মনে হৈলে তার নিলক্ষের চক্ষু ভয়ে বুইজ্যা আইসৃত।

একেই ত বইন্‌পুৎ, তাতে আবার স্বগোত্তর ক্যাজেই গয়ানাথের হাত দুইখানিরে রাইমণি ক্যাবল হাতই মনে কৈরৃত না, পিণ্ডির আধার বৈলা সে হাতে সোয়াগ্ কৈরা সোনার বয়লা পরায়্যা দিল। মানষে কইণ্ডেই কয় যে কোনতারই বাইড়্ ভাল না। ইক্ষেত্রে সে কথা হাতে হাতেই ফইল্‌ল। মাসির দিন রাইত আঢালা সোয়াগে গয়ানাথ খুব একজন আল্লাইদা ছাওয়াল হইয়্যা উঠ্‌ল। পাড়ার

ছাওয়ালগোরে যার হাতে যা দেখে মাসির কাছে কান্দন জুইড়্যা দিয়্যা তাইই আদায় কইর‍্যা নেয়। এই ভাবে পনর বচ্ছর পার হওয়নের পর সে যখন বেশ ডাঙর হইয়্যা উঠ্ল তখনো তার পড়া-শুনার নামগন্ধও তার নিজের কি তার মাসির কেউরই মনে উদয় হৈল না। ছাওয়াল-পাওয়ালের পড়ন-শুনন কোন কালেই আপন গরজে হয় না মুরুব্বির উর্দ্যোগেই হইয়্যা থাকে। গয়ানাথের এক-মাত্র মুরুব্বি মাসি। তার ধারণা যে লেখন-পড়ন শিখন লাইগ্‌ব এক যারা বিধি-বিধান দেয় আর যারা চাকুরী কইর‍্যা খায়, মাত্র তাই গোরে। রাইমণির জোত জমার যা আয় তাতে তার সংসারে খরচ-পত্র ভালয়ালে কুলায়্যাও কিছু কিছু উবুর্‌ত। এই ভাবে ফি বচ্ছরের অল্পবিস্তর বাড়্‌তি রাইমণির হাতে জইম্‌তে জইম্‌তে তার একটু তেজারতি কার্‌বারও জাঁইক্যা উঠ্‌ছিল। সুতরাং বইন্‌পুতের লেখন পড়ন শিখানের কথা মাসির যে মনেই হইত না ইয়াতে আচম্বিৎ হওয়নের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু তাই বৈলা ঘর-গিরস্তালির কামকাজ ও আওয়ৎ বিয়ৎ শিখান মাসির নজর একটুও এড়ায় নাই। নিজের স্বার্থ বুইঝ্যা নিতে রাইমণি অপটু আছিল না কিন্তু ক্ষ্যাণে ক্ষ্যাণে দেখা যায় বাশের থিকা কঞ্চি দর, গয়ানাথের সম্বন্ধে ই-কথাটা একিকালে কাপে কাপে খাইট্‌ত। মাসির শিক্ষাগুণে বইন্‌পুৎ আখরে অজ্ঞান থাইক্যাও আখেরের চুর‍্যান্ত জ্ঞানী হইয়্যা উঠ্‌ল—ঘরের খাইয়্যা বনের মইষ সে কোন কালেই খ্যাদায় নাই।

রাইমনির সংসারে এক্ক মাত্র চাকর হৈরা। গয়ানাথ যখন ই-বাড়ীতে আইসে নাই তার আগের থিকা সে রাইমণির চাকর। এখন তার বয়েস হইচে বৈলা রাইমণি তারে বেশী কিছু ফর ফরমাইস্

পার্য্যমানে দিত না কিন্তু গয়ানাথের বুদ্ধি বাড়নের লগে যেমুন তার কর্ত্তাগিরি বাইরা উঠ্‌ব্যার লাইগ্‌ল, হৈরার খাটুন্নীও সেই সাথে সাথে কমনের বদলে দিনে দিনে বাইরাই চইল্‌ল। বইন্‌পুতের আইসনের আগে নিসন্তান রাইমণির একটু স্নেহ এই হৈরা দখল কই্‌রতে র‍্যাৎ করে নাই, তাই তারে অতিরিক্ত মেহানৎ কই্‌রতে দেইখ্‌লেই রাইমণির কাছে অসহ্য ঠেই্‌কত। কিন্তু গয়ানাথ হৈরার বিনাকামে বইসা থাকন একিব্যারেই দেইখার পাইর্‌ত না। এই অনুজরের চাকরটীরে নিয়া ই-দাইন্‌কে মাসি বইন্‌পুতের মধ্যে এক আধটু ঝগড়া ঝাটির সুরু হৈব্যার লাইগ্‌ল। হৈরা মানুষটা আছিল বুদ্ধিতে কিছু খাটো কিন্তু তার বুকের পাটাটা আছিল খুব বড় আর কৈল্‌জাটা খুব নরম। ধারে কাছে গিরস্তলোকের ফ্যারে অফ্যারে তার শীত গীরিস্মি জ্ঞান থাইক্‌ত না।

যে কালের কথা কওয়ন হইতাছে সে আছিল ফাগুন মাস। গয়ানাথের হুকুম মতে হৈরা ভোর বিয়ানে উইঠা চৈতালি ফসল বুইঝ্যা আইন্‌ব্যার জন্যে বর্‌গাদারের বাড়ী যাইব্যার লাইগ্‌ছিল—এমুন সুমে পথে মরা কান্দন শুইনা তার পাচ পরাণ ছ্যাৎ কইর‍্যা উঠ্‌ল। বর্‌গাদারের বাড়ী আর তার যাওয়ন হৈল না, সে তাড়াতাড়ি গোশাই বাড়ীর দিগে ছুইটা গেল।

হৈরা যখন গোশাই বাড়ীর আঙ্গিনায় পাও দিছে তখন সে বাড়ীর মাঠাগেন আঙ্গিনায় বাইর-করা মরা ছাওয়ালের মুখে উপুর হইয়্যা পইর‍্যা মাথা কুইটা কাইন্দব্যার লাগ্‌ছিল। রাধিকা গোশাইর মাঝারো ছাওয়ালটীর উপ্‌রে পোশু রাইতের থিকা ওলা দ্যাব্‌তার নজর হওনের কথা সে আগেই শুন্‌ছিল কিন্তু কোন ছুতায়ই গয়ানাথের কামকাজ

এরায়্যা একবার আইসা খোঁজটাও নিবার পারে নাই, তার দুই চইখ্ বাইয়্যা দরদরায়্যা জল পইর্ব্যার লাইগ্‌ল।

দুপুরের ঠিক যখন ঠাটাপরা রৈদ, সেই সুমে হৈরা মরা পুড়ান সারা কইর‍্যা পরণের কাপড় গায়ে শুকায়্যা ফিরা আইচে। তার পরাণ তখন খিদায় জর্ জর্, শরীর তেষ্টায় থর্ থর্ কইরব্যার লাইগ্‌ছিল বর্‌গাদারের বাড়ীর থিকা ফিরণের দেরি দেইখা গয়ানাথ যে তার সব কাণ্ডু কারখানা মন্নে মনেই ঠাওয়র কইর‍্যা নিচে, বিন্‌হুকুমে পরের কামে যাওয়নে সে যে চাকরের উপ্‌রে রাইগা আগুন হইয়্যা বইসা রইচে, হৈরার তা বুইঝ্‌ব্যার বাকী আছিল না। সে তাই বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া সরাসর না ঢুইকা কাঞ্চি কোনা ঘুইর‍্যা একিকালে মাঠা-গেনের হবিষ্যিঘরের আঙ্গিনায় যাইয়্যা খাওয়নের লাইগা হাজির হৈল। কিন্তু হৈরার নছিপের ফ্যারে গয়ানাথ তখন বাড়ীর মধ্যেই আছিল। হৈরার আওয়াজ শুননমাত্রই সে পায়ের খরম খুইলা এমনভাবে হৈরার উপ্‌রে রুইখা খারাইল যে সে ফ্যাল ফ্যালাইয়া রাইমণির দিগে তাকাইতে তাকাইতে ভয়ের চোটে দুই এক পাও কইর‍্যা না পাইছায়্যা থাক্‌ব্যার পাইর্‌লো না। গয়ানাথের ব্যবহার রাই-মণির কাছে আইজ ভারি অসহ্য ঠেইক্‌ল। সে রাগের মাথায়, তার বাড়ীর থিকা তারি. চাকরেরে খেদায়্যা দেওয়ানের কোন একতারই যে গয়ানাথের নাই, এই ভাবের একটা কথা খুব রুইঠা সুরে কইর‍্যা ফেলাই-ল।

এত বড় একটা খোটা• সওয়নের মতন ম্যাজাজ গয়ানাথের কুষ্টিতেই লেখা নাই। সে যে পরের খায়্যা মানুষ, এই কথা সে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে পারাপোর্শিগোরে মুখে যখন তখনই শুইনত,

আর তার কোনই শোধ না তুলব্যার পাইর‍্যা মনে মনে ইলাগাৎ আশ্রয়দাতারেই দোষী ঠাওরায়্যা আইস্‌ব্যার লাইগ্‌ছিল ; তার উপুরে আবার চাকরের মোকাবিলায় এই দারুণ অপমানের খোটা আইজ্ তারে রাগের মাথায় দুপুইরা চাড়াল কইর‍্যা তুইল্‌ল। সে হাতের খরম ফেলায়্যা চক্ষের পলকেই একটা পাইট্‌খেল কুড়ায়্যা আইন্‌ল, হৈরা যখন চিক্‌খইর দিয়া উঠ্‌ছে তখন গয়ানাথের জোরে ফেইকা দেওয়া পাইট্‌খেলের গুতায় রাইমণির মাথা খণ্ড বিখণ্ড হইয়্যা গেছে, তার নিসম্বিৎ শরীর রক্তে মাখাচোখা হৈয়া মাটিতে লুটাইবার লাইগ্‌ছে।

বেলা তলানের আগেই যার যার মতো কিছু কিঞ্চিৎ ট্যাকে গুইজা গায়ের যত মুরুব্বি-মাতব্বর এই ব্যাপারটীরে পানে চুনে মিশানের মতন নিভাজে হজম করণের লাইগা এক জুঠ্ হৈল। সদ্য খুনের দিন্ বৈলা স্মৃতিচুরামণি মশয় সে দিন আর ঐ দলে যোগ দিলেন না কিন্তু পরের দিন তিনির মোকাবিলা গয়ানাথ যেমুন রাইমণির পাওনা টাকার খতখান ফাইরা ফ্যালাইল, অম্‌নি তিনর মনে বাওয়নের জাইৎ রাখনের লাইগা ফট্ কৈরা ধর্ম্মভাব উৎলায়্যা উঠ্‌ল। তিনি পাচ জনের সাথে একমত ত হৈলেন-ই—তার উপুরে বাওয়নের ছাওয়াল জেলে গেলে তার যে জাইৎ যায়, আর যে গায়ের বাওনের জাইৎ যায় সে গায়ের চেংড়া বুইড়া বেবাকেরেই যে পাপপঙ্কে ঘিরা ধরে, ও তার ফলে যে হাজার বচ্ছর কণ্ডুক-নরক ভুগণ লাগে, এই সকল শাস্তর প্রমাণের কথা গায়ের দশ জনেরে নিজে থিকা ডাইকা আইনা শুনাব্যার লইগ্‌লেন।

অনেক দূরে থাইকাও যেমুন মরা জীবজন্তু শকুণের নজর এর‍্যায় না, লাভের তদন্তও সেই রকম গায়ের চোকিদারে চাপা দিলেও

থানার দারগাগোরে কানে ঠিক মত পৌছে। গায়ের লোকের সাব্যস্ত থাকন সত্বেও রাইমণির মরণের চাইর দিনের দিন দারগা আইসা গায় অধিষ্ঠান হৈল। তখন মুখে কেউ কিছু না কৈলেও মুরুব্বিগোরে বেবাকেরি পাচ পরাণ তলে তলে থগড় বগড় কইর‍্যা উঠ্‌ল। কিন্তু দারগাসায়াব যখন সরাসর আসামীর বাড়ীতে না ঢুইকা তিনু সরকারের বাড়ীতে আড্ডা নিলেন, তখন সকলের মনেই অল্পবিস্তর সায়স জইম্‌ল। গায়ের মধ্যে তিনু সরকার দারগা পুলিশের ওয়াকিব জানা লোক। আরো কয়েকবার এই গায় দারগা তদন্তে আইছিল তখন তিনুই মধ্যে পইরা সব গোলমাল অল্পে সল্পে মিটায়্যা দিছে। আসামীরে ধৈরা আননের জন্যে কনেস্টবল পাঠানের আগেই তিনু নিজেই যাইয়্যা গয়ানাথেরে সাথে কইরা, আইনা দারগার সুম্‌খে হাজির কইরা দিল। দণ্ডেকের মধ্যেই বাওয়নের জাইৎ বাচানের লাইগা দারগাবাবুও গায়ের মুরুব্বিগোরে সাথে এক মত হৈলেন, ও সেলামীর টাকা তিনশ কনেস্টবলেরে গইনা নিবার কইয়া, গুরগুরির নলটা মুখে গুইজা দিলেন। এম্‌নি কইরা দারগা বাবুর চিৎ যখন ঠাণ্ডা হইয়্যা আইল তখন তিনি গায়ের পাচ জনের দিগে ফিরা বইসা, পারাপর্শিরা ইয়া নিয়া যাতে আর কোন সুর গোল না করে, তারির পরামিশ দিবার লাইগ্‌লেন ; এমুন-সুমে পূব পাড়ার মুরুব্বি রূপলাল রাইমণির চাকর হৈরারে সাব্যস্ত কইরা দিয়া যাওয়নের কথা জানায়্যা হুজুরের সাম্‌নে হাত জোর কইর‍্যা খারাইল।

খুনের মোকাবিলা সাক্ষী-মাত্র হৈরা। তার মুখ বুজানের জন্যে বেবাকের আগে গায়ের মুরুব্বিরা তারি একলার হাতেই পচিশ টাকা দিব্যার গেছিল, কিন্তু সে দুই হাতে মুখ ঢাইকা সেই যে উইঠা গেছে

তারপরে ইলাগাৎ কেউই আর তার লাগুর পায় নাই। ছোট কালের থিকাই সে আছিল রাইমণির চাকর। সগণ সরীক কেউ ত তার নাইই, বৈরাগী ফকিরেরও নিজের একখান ডেরা কুইরা থাকে তার তাও নাই। রাইমণির মরণের পরদিন থিকা গায়ের বাওয়ন ভদ্র বেবাকেরেই যখন সে গয়ানাথের পক্ষ নিতে দেইখ্‌ল সেই দিন থিকা সে আর কেউর বাড়ীতেই যায় নাই। আইজ কয়দিন ধইরা সে তার ছোট-কাইলা মিতা হরি মালির কাছে আশ্রয় নিছে। মাঠাগেনের শোকে তার কৈলজাটা যে ফাট্‌ ফাট্‌ করে তা সে তার মিতারেও বুঝায়্যা উঠ্‌ব্যার পারে নাই।

হৈরা আইসা দারগার কাছে খারাইতেই ইকয়দিনকার চাপা কান্দন তার মুখ চইখ্‌ ছাপায়্যা বাইরয়্যা পৈল। খানিক বাদে কান্দন থাইমা আইলে, সে যেমুন তার মাঠাগেনের খুনের নালিশ হুজুরের কাছে মনের খেদ মিটায়্যা জানাইব ভাইবা একটু থির হইয়্যা রইল, ঠিক সেই সুমে দারগা তারে ঠাণ্ডা হৈতে দেইখা সে যাতে আর এই খুনের বিষয় নিয়া কোন রকম সুরগোল না করে, এই কথা ফিরা ফিরা দুই তিন বার তারে বুঝায়্যা কইলেন আর তিনির কথামতন না চইল্‌লে তার নিজেরও ফাস্যাদে পড়ন লাইগ্‌ব ইয়াই বৈলা একটু শাসায়াও রাইখ্‌লেন। দারগার ই-সকল কথায় হৈরা হাঁ হুঁ কিছুই না কইয়্যা ক্যাবল থম্‌ ধইরা বইসা রইল। ইয়ারি মধ্যে দারগা সায়াব তিনু সরকারেরে কি যান্‌ ইসারা কইর্‌লেন আর সে উইঠা গয়ানাথের হাতে থিকা গোণা পনরটা টাকা নিয়া হৈরার মুঠের মধ্যে রাখ্‌তেই সে হেচ্‌লা টান দিয়া হাত ছারায়্যা আইন্‌ল, ফলে তার হাতের উছটে তিনুর হাতের বেবাক টাকা ঘরময় ছরায়্যা পইল, এবং

তারি একটা টাকা দারগার ডেনায় ছিটা পরলে, তিনি রাইগা অগ্নি-শর্ম্মা হৈলেন। তিনির মুখের ভির্‌কুটী ও চইখের ভাব দেইখা আর কেউ কিছু ঠাওয়র না পাইলেও তিনুর বুঝতে বাকী রইল না যে হৈরার শ্রীমন্দিরে যাওয়ন ঠেকানের লোক আর ই পির্‌থিমিতে কেউই নাই।

সাত দিন পরে মহুকুমার মাজিস্টরের এজ্‌লাসে হৈরার বিরুদ্ধে,—থানায় খুনের মিথ্যা এজাহার দেওয়ন আর দারগা রাসবিহারী দাসের উপ্‌রে খামাখা রুইখা যাওন, এই দুই অপরাধের দুই নম্বর মামলার বিচার এক সাথেই সারা পাইল। স্বয়ং দারগার জোবানবন্দী হওয়নের পরেই তিনু সরকার সাক্ষীর কাঠগরায় খারাইল। তার জোবানবন্দীর সুরুতে রাইমণি সন্ন্যাস রোগে মইরা গেছে তক শুন্‌তেই হৈরার মুখে চইখে কেমুন য্যান্ একটা চমক্ লাইগ্‌তে দেখা গেল। বোধ করি, সাক্ষীর কথায় আসামীরে চইম্‌কা উঠ্‌তে দেইখাই সে যে পূরা অপরাধী মাজিস্টর তা মনে মনেই ঠাওয়র পাইলেন। তার পরে মাত্র রূপলাল আর একজন কনেষ্ঠবলের সাক্ষী নিয়া, আরও যে অনেকে রাইমণির সন্ন্যাস রোগে মরণ আর দারগা সায়াবের উপ্‌রে হৈরার খামাখা রুইখা যাওয়নের কথা ঠিক ঠিক কৈবার আইচিল, উবুরস্তু ও অতিরিক্ত বৈলা হাকিম তাগোরে বেবাকেরেই কাচারির বাইর থিকাই বিদায় দিলেন।

দণ্ডেক কাল বইসা মাজিস্টর রায় লেইখ্‌লেন পরে আসামীরে যখন দুই বছর ফাটকের কথা পইরা শুনান হৈল, তখন তার মুখের ভাবের কিছুই বদল দেখা গেল না।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যাপতি

—:*:—

পলিটিক্সের রঙ্গমঞ্চে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটার যে-রকম মূল্যই থাক্ না কেন বাণীর মন্দিরে কিন্তু তার কোন আসন নেই। যদি বা থাকে ত সেটা নিতান্তই নীচু—আর একান্তই এক কোণে। এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করি তবে বীণাপাণীকেই আমরা খাট করব—আর তাতে সবার চাইতে সবার আগে ক্ষতি হবে পেট্রিয়টিজ্‌মেরই। আমরা যে আজকাল সময়ে অসময়ে সভাসমিতিতে ঘরে বাইরে সুযোগ পেলেই আমাদের বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে একটা আকাশ-পাতাল জোড়া মত প্রকাশ করি—বিশ্ব-সাহিত্যের মাঝে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানি হীরক-মুক্তা-খচিত রত্নসিংহাসন পেতে দিয়ে প্রশংসমান নেত্রে গদগদভাবে বলি—আঃ কি সুন্দর—এমন আর হয় না—এমন আর হবে না—হতে পারে না—সে-সবের মাঝে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটা কতখানি আছে তা জানি নে—কিন্তু তার মধ্যে যে এই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটার একটা বড় রকম এলোপ্যাথিক ডোজ্‌ থাকার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে—সেই কথাটাই এখানে ব'লে নেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বৈষ্ণব কবিদেরই একজন—বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটী নিয়ে আমি

বিদ্যাপতিকে সার্টিফিকেট দিতে যাচ্ছি নে—সেটা ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। বিদ্যাপতি যে কবি—একজন প্রকৃত কবি সে সম্বন্ধে বোধ হয় দু'মত নেই। বাস্তবিক—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন নেল॥

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোলিল
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

আধ আঁচল খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

—এ রকম আরও কতও আছে—এ সবের মধ্যে যে সুর ও সৌন্দর্য্য রয়েছে তা বাঙ্গালী হ'য়ে যিনি উপভোগ করতে পারেন নি তাঁর দুর্ভাগ্যই বল্‌তে হবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যাপতির পদাবলীর মুল কথা যেটা সেইটে নিয়ে একটু অলোচনা করা।

(২)

এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা বলেন যে বৈষ্ণব পদাবলী কুনীতি কুরুচি ও অশ্লীলতা পূর্ণ। সুতরাং এ-গুলোর কোন মূল্য নেই—বড় জোর এ-সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা। তাঁরা বলেন যে এই সকল কবিতার সংসর্গে এসে নরনারীর মন চঞ্চল ও অশুচি হ'য়ে ওঠ্‌বার সম্ভাবনা—তাতে সমাজের অমঙ্গল। আর্থাৎ এই সকল সমালোচক যখন কাব্য সমালোচনা করতে বসেন, তখন তাঁরা শুধুই কাব্য-সমালোচকই নন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নীতিবিদ্‌ও বটেন আবার সমাজপতিও বটেন। আর আমাদের ত এটা চোখে দেখা যে Judicial Executive এক জনের হাতে থাক্‌লে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা পদে পদে। এই শ্রেণীর সমালোচকের বিচারটা কতকটা এই রকমের।

আসল কথা হচ্ছে এই পৃথিবীতে কেউই কবির dictator হতে পারে না—তা তিনি নীতিবিদই হন, সমাজপতিই হন, বা নবাব সিরাজদ্দোলার নাতিই হন। কবির লেখায় যদি সমাজের অমঙ্গল হয় তবে সমাজপতি সে কবিকে কারাগারে রুদ্ধ করতে পারেন কিন্তু তাঁর দ্বারা নীতির তত্ত্ব লিখিয়ে নিতে পারেন না। কবি কি লিখবেন

তার উপরে সমাজপতি নীতিবিদের হাত ত নেইই খোদ কবিরও বড় বিশেষ নেই। কারণ কবিতার জন্ম যেখানটায় সেখানে কবির মনোময় পুরুষ পৌঁছিতে পারে না। কবির যেখানে এই কবিতার জন্ম হচ্ছে সেখানটা কুনীতি সুনীতি, শ্লীল অশ্লীল জুড়ে বসে নেই—সেখানটা জুড়ে বসে আছে সত্য ও আনন্দ। যখন সেই জগৎ থেকে আনন্দের ঠেলা খেয়ে সত্য, সুর ও সৌন্দর্য্যকে সঙ্গে নিয়ে কবির মনোরাজ্যে নেমে আসে, তখন কবি বসে যান তাতে শব্দ যোজনা কর্‌তে—আর তখনই আমরা পাই কবিতাকে। কবি তখন দেখে সত্যকে, পায় সৌন্দর্য্যকে, অনুভব করে আনন্দকে। শ্লীল অশ্লীল কুনীতি সুনীতি প্রভৃতি কথা ভাববার অবসরই নেই তখন তার। সে তখন এমন একটা জগতে, যে-জগতটা এই অজ্ঞান ও বদ্ধ পৃথিবীর চাইতে মুক্ততর, সত্যতর, দীপ্ততর। আর এই পৃথিবী দিয়ে সেই সত্যময় আনন্দময় জগতটাকে শাসন করবার চেষ্টাটা আমাদের ডন্ কুইক্‌সোট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জারই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। কাজেই নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ—সে-কালেও এ-কালেও ব্যাকরণেও আচরণেও।

অপর পক্ষে আবার আছেন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণবেরা। তাঁরা আমাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বল্‌বেন—সাবধান লেখক—এ সব পদাবলী নিয়ে খেলা নয়। এ সব হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন লীলা—অমূল্য রত্ন—এ সবের উপরে কলম চালাতে যেও না—সাবধান! আমরা বল্‌ব রাধাকৃষ্ণের লীলা বটে কিন্তু লেখা মানুষের। কৃষ্ণভক্ত বল্‌বেন—মানুষ, সে কি সাধারণ মানুষ! তাঁরা ছিলেন সব ভক্তশ্রেষ্ঠ পরম সাধক! আমরা উত্তরে বল্‌ব যে—পরম সাধক হলেই চরম

সাহিত্যিক হয় না—শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেই উৎকৃষ্ট কবি হয় না। আসল কথা হচ্ছে যে রাধাকৃষ্ণ বড় মহাজন বটে কিন্তু সেই বড় মহাজনের নামের ছাপ মেরে সাহিত্যের বাজারে আমরা কোন মালই বিনপরখে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেব না। বড় লোকের হাতে আংটী থাকলে সাধারণ লোকে সেটাকে সোনার আংটী বলে' মনে করুক কিন্তু যে স্বর্ণকার তাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে', সে-আংটী বাস্তবিক সোনার না পিতলের।

গৌরাঙ্গভক্ত পরম বৈষ্ণবের পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা জীবন কৃতার্থ মান্‌তে পারি এবং তিনি যখন মৃদঙ্গ দেখে ভাবে আত্মহারা হয়ে অশ্রু বর্ষণ করেন তখনও কারও আপত্তি করবার কারণ ঘটে না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিচারকালে যদি তিনি বলে' বসেন যে, সকল বাদ্য-যন্ত্রের সেরা বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মৃদঙ্গ তখন তাঁর সঙ্গে তর্ক লাগবেই—তখন আমাদের বল্‌তেই হবে যে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণার স্থান মৃদঙ্গের চাইতে অনেক উঁচুতে—তা তিনি আমাদিগকে গালাগালিই দিন, ভক্তিহীন নরাধমই বলুন আর যাই করুন।

(৩)

এতক্ষণ এক রকম ভূমিকাতেই কেটে গেল। এইবার আসল কথা পাড়ব।

বলেছি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। এই আসল কথাটা কি? সেটি হচ্ছে প্রেম—মধুর প্রেম। প্রমাণ,—এতে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন ইত্যাদি

মধুর প্রেমের যা কিছু আনুষঙ্গিক সব আছে। এখন একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এই যে--প্রেম ত বোঝা গেল--কিন্তু কার প্রেম?

যাঁরা একটু আধ্যাত্মিক ছাঁচের লোক তাঁরা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বলবেন যে এ-প্রেম পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার—যাঁরা একটু পৌরাণিক ধাঁচের তাঁরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হয়ে ভাববেন—কার প্রেম? এ প্রশ্ন আবার ওঠে কেন! স্পষ্টই ত লেখা রয়েছে এ সব রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এঁরা দু' দলই হয়ত ঠিক। কিন্তু আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক—আমরা বল্‌ছি যে এ প্রেম জীবাত্মা পরমাত্মারও নয়, রাধাকৃষ্ণেরও নয়—এ প্রেম হচ্ছে বিদ্যাপতির নিজের। বিদ্যাপতির যে পদাবলী তার প্রত্যেক লাইনটীর প্রত্যেক শব্দটীর প্রত্যেক সুরটীর পিছনে রয়েছে বিদ্যাপতির অনুভব—বিদ্যাপতির দৃষ্টি—বিদ্যাপতির আনন্দ। এক কথায় বিদ্যাপতির পদাবলীর পিছনে রয়েছে মানুষেরই হৃদয়ের স্পন্দন—মানুষের অনুভবেরই অনুবাদ। আর সেই জন্যেই এ সব পদাবলী রাধাকৃষ্ণের নাম করে' চিরকাল মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া শক্ত। কারণ প্রেম জিনিসটা সম্বন্ধে সব মানুষেরই বেশী কম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে আস্‌ছে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে বিদ্যাপতির প্রেম হোক্‌—কিন্তু কার প্রতি প্রেম সেটাও ভাবা উচিত। আমরা বলি যে তার কোনই দরকার নেই। কারণ কাব্যে প্রেম কতখানি মহীয়ান গরীয়ান সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা কবি কাকে ভালবেসেছেন তার উপরে নির্ভর করে' না মোটেই। নির্ভর করে এর উপরে যে কবি কেমন ভালবেসেছেন—আর তার কতখানি আত্মপ্রকাশকের ক্ষমতা—তাঁর প্রতিভার ওজনই বা কত। রজকিণীকে ভালবেসেও চণ্ডীদাস প্রেমের মহীয়ান্‌ রূপের দর্শন পেলেন—আর

সেটা ঐ উপরে যা বলা গেল তারি সত্যতা প্রতিপন্ন কর্ছে বলেই মনে করি। আসল কথা হচ্ছে এই যে মানুষের যে প্রেম তা ভগবানের প্রতিই হোক্ বা মানুষের প্রতিই হোক্ দুইই তাকে এক রকম অমৃতই মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কারণ প্রেমের যে অমৃত মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা সেটা ভগবানেও নেই—প্রেমপাত্র ও প্রেম-পাত্রীতেও নেই—সেটা আছে প্রেমের মধ্যে—প্রেমিক্ প্রেমিকার প্রেম অনুভব করবার শক্তির মধ্যে—তাদের প্রেমানুভূতির গভীরতা ও একনিষ্ঠতার মধ্যে। সুতরাং বিদ্যাপতির প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি না শিবসিংহের অন্তঃপুরবাসিনী কোন কিশোরীর প্রতি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের দরকার নেই। আমরা দেখ্‌তে চাই তাঁর কাব্যে আমরা কি পাই। আর সে জন্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা কালে এ কথাটা আমাদের মনে রাখা খুব দরকার যে আধ্যাত্মিক-যোগ সাধনা আর কাব্য-রচনা এক কথা ত নয়ই—এ দুয়ের এক প্রথাও নয়। কারণ কাব্য-রচনাটা এক প্রকারের সাধনা বলে' মেনে নিলেও সব রকমের সাধনাই যে কোন প্রকারের কাব্য তা স্বীকার কর্‌তে পারে তারাই যাদের মস্তিষ্ক আর হৃদয়টা ঠিক্ অ্যানাটমির নিয়ম রক্ষা করে' সৃষ্ট হয় নি।

বৈষ্ণব কবিদের কথা উঠ্‌লেই যে আমরা "আধ্যাত্মিক" "যোগ-সাধনা" ইত্যাদি ইত্যাদি কতগুলো বাঁধিগৎ আওড়িয়ে তাঁদের কাব্যের চার পাশে একটা Mystery-র কুয়াশা সৃষ্টি করি সেই কুয়াশা কতকটা দূর কর্‌বার প্রয়াসেই উপরের অতগুলো কথা বলা গেল—নইলে কথাগুলো বোধ হয় অবান্তর। যা হোক্ এখন বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটার দিক থেকে একটা মূল্য দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌র। এই আসল কথাটা হচ্ছে মধুর প্রেম।

(৪)

বিদ্যাপতির কাব্যের একটা সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গেলে তাঁর একটী কবিতাকে বাদ দেওয়া দরকার। সেটী হচ্ছে সেই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজনোদ্ধৃত কবিতাটী—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছল কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥ ইত্যাদি॥

এ-কবিতাটী বাদ দেওয়া দরকার এই জন্যে যে এটী দিয়ে বিচার করতে গেলে বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণাই হবার সম্ভাবনা। কারণ এ কবিতাটী বিদ্যাপতির অন্যান্য পদাবলী থেকে এত বিভিন্ন—এত উঁচুতে যে হঠাৎ মনে হয় এটা বুঝি প্রক্ষিপ্ত। এই কবিতাটী দাঁড়িয়ে উন্নতশিরে বিদ্যাপতির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। বলছে—দেখ দেখ—আমি কি হতে পারতেম—অথচ কি হই নি—আর সে দোষ বিদ্যাপতি ঠাকুরের। আমার মনে হয় এই কবিতাটীতে

চণ্ডীদাসের ভাব বিদ্যাপতির ভাষার পোষাকে একেবারে নিখুঁত সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

এ কবিতাটী পড়ে আমাদের অন্তরে যে ছবি ফুটে ওঠে সে এ-লোকের নয়—সেটা স্বলোকের। মানুষের অন্তরে যে একটা প্রেমের এম্‌নি পারাবার আছে যার তল সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি তার পরিচয় এ কবিতার প্রত্যেক ছত্রে আছে। এই গ্রামটায় আমরা প্রেমের যে সুর শুন্‌তে পাই সে-সুর বোধ হয় কতকটা পরিমাণে আর একটা কবিতায়ও আছে—সেটা হচ্ছে সেই যার আরম্ভ "আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দ" দিয়ে। কিন্তু এ ছাড়া বিদ্যাপতির আর যে-সব পদাবলী তার জন্ম প্রেমলোকে হয় নি—তার জন্ম হয়েছে কামলোকে।

কথাটা শুন্‌তে বোধ হয় একটু কড়া শোনায়—কিন্তু উপায় কি? যখন পড়ি—

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥ ইত্যাদি

তখন এ-সব পদের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুরের হৃদয়-প্রেমের কোন ধারা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে' যায় না—আমাদের মনে অন্য রকমের ছবি ফুটে ওঠে। হাফেজের একটী কবিতা আছে—

ছড়ায় রাজার পথে তারা
মণি মুক্তা কতই না জানি;

আমি কিন্তু মোর প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথ খানি।

তবুও এ অনুবাদ—কিন্তু এর পিছনে হাফেজের যে একটা অনুভবের অনুভব আমরা পাই বিদ্যাপতির কাব্যে তা কোথাও পাই নে—অবশ্য বলেছি ঐ একটী কবিতা ছাড়া যেখানে বলা হয়েছে যে সে-প্রেমের ব্যাখ্যান কর্‌তে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। কেউ কেউ মনে কর্‌তে পারেন যে আমি আমার মত সমর্থন কর্‌বার জন্যে খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে ঐ একটী পদ বের করে' এখানে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যাঁদের বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁর পদাবলীতে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের কথার চাইতে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী। আর হৃদয়জ জিনিসটা প্রেমলোকের গানের বিষয় নয়—সেটা হচ্ছে কামলোকের ধ্যানের বস্তু।

দেশী বিদেশী অনেক প্রেমিক-কবির কবিতা তুলে তার সঙ্গে তুলনা করে' বিদ্যাপতির প্রেমের গানের যে কি পার্থক্য তা দেখান যেতে পারে কিন্তু তাতে পুঁথিই বেড়ে যাবে আর তার দরকারও নেই। কেননা বিদ্যাপতির কাব্য নিজ গুণেই স্বপ্রকাশ হ'য়ে আছে—তা বুঝবার জন্যে আর কারও কাছে যাবার দরকার নেই। বিশেষতঃ প্রেম জিনিসটা এমন একটা দ্রব্য যার গুণ সম্বন্ধে সব মানুষেরই অল্প বিস্তর-অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাটা একবার খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

একাল পর্য্যন্ত মানুষ প্রেমের তিনটী রূপের দর্শন লাভ করে' এসেছে। প্রথমটী হচ্ছে—নিছক কাম। এতে নাসিকা কুঞ্চিত

করবার কিছু নেই। কারণ এও একটা ভগবান-সৃষ্ট সত্য। এর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপরে—তার দেহের অণু-পরমাণুর যে চৈতন্য তার উপরে—তার অন্নময় কোষের instinct-এর উপরে। এও এক প্রকারের প্রেম। এ প্রেমের আনন্দ অতি পরিমিত, অতি সীমাবদ্ধ—কেননা অন্নের সীমা আছে আর সেইজন্যই এটাকে আমরা নিকৃষ্ট প্রেম বলি—কারণ মানুষকে এর আনন্দ দেবার ক্ষমতা অতি কম। এই প্রকারের প্রেমেই জন্মেছে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বায়রণের ডন্ জুয়ান, বোকাচ্চিয়োর ডিক্যামেরন। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে কাম এবং প্রেমের একটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড গোছের। এইটী হচ্ছে বিশেষ করে' মানবীয় প্রেম। সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে কাম ও প্রেম এমনি ভাবে জড়াজড়ি করে' থাকে যে এর একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে প্রায় সে বুঝতেই পারে না। মানুষের অন্তরে এই প্রকার প্রেমের মধ্যে কামের ডোজ যত কমে আস্‌তে থাকে আর প্রেমের ভাগ যত বেড়ে যেতে থাকে তার আনন্দের অনুভবও তত পরিপূর্ণতর হতে থাকে। কেননা কামই মানুষের সীমা দেয়—কামই মানুষকে সকাম করে' তোলে—আর মানুষ সকাম যেখানে সেখানে তার দুঃখের চাইতে সুখ কম—অমৃতের চাইতে অশান্তি বেশী। এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে। তাই এ প্রেমের আনন্দেরও সীমা আছে। কারণ মানুষের হৃদয় ক্ষুদ্র না হলেও তা অসীম নয়।

এ দুই প্রকার ছাড়া তৃতীয় রকমের এক প্রেম আছে যেটা মানুষ সাধারণ ভাবে অনুভব না কর্‌লেও অসাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে তার খবর সে পেয়েছে। সেটা হচ্ছে নিছক বিশুদ্ধ প্রেম। এই প্রেমের অনুভবেই অমৃত—এ প্রেমের আনন্দের পূর্ণতা বাইরের মিলনকে

উপেক্ষাও করে না—আবার তার অপেক্ষাও রাখে না—এ প্রেম স্বরাট, যা নিজগুণেই মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেয়। এ প্রেমের মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেবার ক্ষমতা অসীম—কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা সেইখানে যেখানে মানুষের সীমা নেই। কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে আমি বাজে বক্‌ছি—বড় জোর একটা থিওরির সৃষ্টি কর্‌ছি। এর্ ছাপাই স্বরূপ বল্‌ছি যে এই প্রকার প্রেমের ইঙ্গিতই চণ্ডিদাসের পদাবলীতে অনেক খানে আছে—অবশ্য তাও অনেক স্থলেই তত্ত্ব হিসেবে—কাব্য হিসেবে নয়। কারণ একথা আজকাল সবাই মানেন যে তত্ত্বকথা পদ্যে গাঁথলেই তা কাব্য হ'য়ে উঠতে বাধ্য নয়।

এই যে তৃতীয় রকমের প্রেম এইটে হচ্ছে উত্তম প্রেম। কারণ এ প্রেমের অনুভব যখন মানুষ পায় তখন তার পূর্ণ আনন্দ—তখন তার প্রেমে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। কারণ এ প্রেমে ব্যর্থতার স্থান নেই—কেননা এ প্রেমের অনুভবের মধ্যেই মিলন রয়েছে—আর তার কারণ হচ্ছে এই যে দৈহিক মিলনটা যতটা স্পষ্ট ততটা সত্য নয়। আর প্রেমের সত্য ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া—দুঃখ দেওয়া নয়। এ প্রেম উত্তম প্রেম কারণ এ প্রেমের আনন্দ দেবার ক্ষমতাও অসীম—কেননা বলেছি এর প্রতিষ্ঠা অঙ্গে নয়—অঙ্গের সীমা আছে—মানুষের হৃদয়েও নয়—হৃদয়ও অসীম নয়—এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা তার চাইতেও ঊর্দ্ধলোকে। এ প্রেম সীমাকে আশ্রয় করে' অসীমে উন্মুক্ত হয়েছে—এ প্রেম রূপকে জড়িয়ে অরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাই এ প্রেমে অঙ্গ পরিত্যক্তও হয় নি আবার তার আধিপত্যও রয় নি—ইন্দ্রিয়াদি মুছেও যায় নি আবার তার বন্ধনও

পড়ে নি—এই হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের খেলা—রূপের মাঝে অরূপের প্রকাশ। আর এই হচ্ছে মানুষের আসল সত্যময় রহস্যটী যা দিয়ে সে তৈরি।

এখন আমরা প্রেমের কবিতার মধ্যে চাই এমন কতগুলো কথার সমষ্টি—এমন একটা সুরের ব্যঞ্জনা—এমন একটা ভাবের সঙ্গীত যার ভিতর দিয়ে আমরা খবর পাব এই উত্তম প্রেমের। কারণ ঐ দিকেই আমাদের গতি—ঐটেই যে আমাদের সত্য আর ঐটেই যে আমাদের অপ্রাপ্ত। যেটার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নেই—সেটার খবর আমরা পেতে চাই কবির অন্তরের ভিতর দিয়ে। কারণ কবি অন্যান্য লোক থেকে কিছু অসাধারণ। আমরা সাধারণ মানুষ যে লোকে যেতে পারিনে কবি সেখানে হামেশাই যাওয়া আসা কচ্ছেন। সুতরাং প্রেমের উৎকৃষ্ট গান বল্‌ব সেই সবকে যা আমাদিকে এই উত্তম প্রেমের অনুভব কতকটা করিয়ে দিতে পারে। আর যে গান যত বেশী করে'—যত গভীর করে'—যত স্পষ্ট করে' ঐ ভাব আমাদেকে অনুভব করিয়ে দিতে পার্‌বে সে-গানকে আমরা তত উচ্চে আসন দেব। আর বিদ্যাপতির কাব্যে—বলেছি ঐ একটি কবিতায় ছাড়া—ঐ জিনিসটী আমরা পাই নে—অবশ্য সেটা জোর করে' বল্‌ছি নে—সেটা বল্‌ছি দুঃখ করে'।

বিদ্যাপতির হ'য়ে কেউ কেউ একটা কথা বল্‌তে পারেন যে যেখানে মধুর প্রেমের ভিতর দিয়ে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়েছে সেখানে ত দেহের মিলন ঘটবেই—সেখানে ত পরস্পরের চোখে পরস্পরের দেহ সুন্দর হয়ে উঠ্‌বেই—সেই রহস্যই ত বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা পাই। সত্যি কথা—আত্মার মিলন হ'লে দেহের মিলন হবেই। কিন্তু যখন

কাব্যে দেহের মিলনটাই প্রধান বক্তব্য বিষয় হ'য়ে ওঠে এবং আত্মার মিলনের সন্ধানও পাওয়া যায় না—তখনই মুস্কিলের কথা। কারণ প্রেমিক লেখক যেখানে আত্মার মিলনের ভিতর দিয়ে দেহের মিলনে এসে পৌছেচেন পাঠক সেখানে দেহের মিলনের গান শুনে আত্মার মিলনে পৌঁছিতে পারে না। কেননা দেহ আত্মাকে গড়ে নি—আত্মাই দেহের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আত্মার সঙ্গে সঙ্গে দেহ এলেও—দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়ে' যে বিদ্যা বা সুন্দরের অন্তরের প্রেমের কোন রূপ আমাদের মানস-চোখে ফুটে ওঠে না—সেটা সবাই একবাক্যে স্বীকার কর্‌বেন—কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে যে মতভেদ হয় তার কারণ আমার মনে হয়—রাধাকৃষ্ণ নামের পুরাতন মাহাত্ম্য আর আমাদের মনের সনাতন জড়ত্ব। রাধাকৃষ্ণের নামের সঙ্গে এমন কতগুলো association of ideas আমাদের মনে আছে যে রাধাকৃষ্ণের নাম পেলেই সেটাকে আমরা সেই সব "ideas"-এর আতসীকাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি—নইলে দশ জনের চোখে খেলো হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কাও যে একটু না আছে তাও নয়। রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। বিশল্যকরণি না চিন্‌তে পেরে মহাবীর হনুমান সমস্ত গন্ধমাদনটাকেই নিয়ে যাবার মতলব আট্‌ছেন। এক নিরক্ষরা যুবতী কেঁদেই আকুল। তার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গিনী জিজ্ঞেস কর্‌ল—"ওলো কাঁদিস্ কেন?" যুবতী বল্‌লে—"আহা কি কষ্ট।" সঙ্গিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কার কষ্ট?" যুবতী উত্তর দিলে—"কেন! সীতার।" সঙ্গিনী বল্‌লে—দূর, এ যে হনুমানের কথা হচ্ছে।" "যুবতী তখন চোখ মুছে বল্‌লে—"ওমা আমি মনে

করেছিলুম বুঝি সীতার বনবাস হচ্ছে।" এও যেন কতকটা সেই রকম।

যা হোক শেষে বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিদ্যাপতির কাব্যকে যখন প্রেমের দিক থেকে দেখি তখন তাঁর সমস্ত পদাবলীগুলো পাঠ শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথাই খালি মনে জাগতে থাকে—সে কথাটা হচ্ছে—"পিতল কাটারি কামে নাহি আওল উপরহি ঝিকি-মিকি সার।" তবু যে বিদ্যাপতিকে একজন প্রকৃত কবি বলি তার কারণ হচ্ছে যে তিনি যে গান গেয়েছেন তা সুন্দর ও মিষ্টি। আর অস্‌কার ওয়াইলডের এই যে কথা—

There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written that's all.

এ কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয় বলেই মনে করি।

(৫)

এখন যারা

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে ,
বিহি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥

কিম্বা

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥

কিম্বা

ঝাঁপবি কুচ দরশয়েবি কন্দ।
দৃঢ় করি বাঁধিবি নীবিহক বন্ধ॥

ইত্যাদি পদে একটা ভীষণ আধ্যাত্মিক অর্থের ও তত্ত্বের সন্ধান পান তাঁদের কেউ কেউ আমাকে সম্বোধন করে' যে একটা কথা বলবেন তা জানি। তাঁরা বল্‌বেন—হে মূর্খ লেখক! তুমি বিদ্যাপতির কিছুই বোঝ নি। তাঁর কাব্যে যে একটা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ রহস্য—যে একটা গভীর যোগসাধনের ধারা ইত্যাদি ইত্যাদি। তা তাঁরা যদি বিদ্যাপতির কাব্যকে যোগশাস্ত্র বলে চালাতে চান তা চালান—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তাতে সাহিত্যের আসরে বিদ্যাপতির গৌরব কম্‌বে বই বাড়্‌বে না—অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাজে তর্ক।

:#:-

[স্থান—হ্যারিসন রোডস্থ এক ত্রিতল বাটীর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সময়—সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা। শচীন্দ্রকুমার ও তাহার বন্ধু অমিয় চৌকিতে উপবিষ্ট। উভয়েই তরুণ বয়স্ক যুবক। শচীনের চেহারাতে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও সরলতার বেশ একটু আভা আছে। অমিয় একটু স্থূলকায় এবং তাহার চেহারা সাদাসিদে ভাল মানুষটির মত। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।]

অমিয়। তোমার কাছে ফণীবাবুর সেই বইখানা আছে না, শচীন?

শচীন। হ্যাঁ আছে। পড়া হয়ে গেছে, চাই তোমার?

অমিয়। সেটা নিতেই তো এসেছি। আচ্ছা শচীন, সেদিন ফণীবাবুর সঙ্গে হরিদার কি তর্কই বেধে গেল। হাতাহাতি হয় আর কি। আমি না থামিয়ে দিলে ঠিক মারামারি হতো।

শচীন। হ্যাঁ, ফণীবাবুর অতটা তেতে ওঠা উচিত হয় নি। জানেই তো হরিদা একটুতে কি রকম চটে যায়, তার সঙ্গে এত তর্ক করা কেন? আর বিশেষ হরিদা বয়সে ঢের বড়, তাকে এতটা ক্ষেপিয়ে তুলে লাভ কি?

অমিয়। তুমি আর কথা ব'ল না। একবার তর্ক উঠলেই হ'ল, তার স্রোতে গা ভাসিয়ে কোথায় যে চলে যাও, তার ঠিকানাই পাওয়া যায় না।

[হরিদার প্রবেশ, তিনি অপর দুজনের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। তাঁহার চুল সাম্‌নে ও পিছনে সমান ভাবে কাটা। শিরোপরি একটী শিখাও উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।]

শচীন। এই যে হরিদা—আসুন।

অমিয়। অনেক দিন বাঁচবেন হরিদা। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।

হরিদা। তাই নাকি, আমার ভাগ্যি বলতে হবে। তা কি কথা হচ্ছিল শুন্‌তে পারি কি ?

শচীন। এমন কিছু না। আপনার সঙ্গে ফণীবাবুর সেই ঝগড়ার কথা বল্‌ছিলাম।

হরিদা। ঝগড়া আর কি ? তবে যারা তর্ক করব বলে তর্ক করে, আর তর্ক করতে গিয়ে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না—তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ফণী তো কথা বলতেই জানে না।

অমিয়। (একটু হাসিয়া) সে দোষটা শুধু ফণীবাবুর কেন, অনেকেরই আছে।

হরিদা। ফণী বলে কি জান ? আমাদের দেশের নাকি যা-কিছু সবি মন্দ। আমাদের ধর্ম্ম অচল, আমাদের সমাজের গঠন খারাপ, আমাদের স্ত্রীশিক্ষা নেই—এ সব অন্যায় কথা শুনলে কার না রাগ হয়, বল তো, অমিয়।

অমিয়। সে ত ঠিক কথা।

শচীন। না, ফণীবাবু এমন অন্যায়ই বা কি বলেছেন ? আপনারা সব বলেন যে আমাদের দেশে খুব স্ত্রী-শিক্ষা আছে, কিন্তু কোথায় যে আছে তাত দেখতে পাইনে।

হরিদা। নেই? স্ত্রী-শিক্ষা নেই? আমাদের দেশে যেরূপ স্ত্রী-শিক্ষা, সেরূপ কোন্ দেশে তুমি দেখাতে পার?

শচীন। এইটে ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের দেশে যেমন, এ রকম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে গৃহলক্ষ্মীদের সঙ্গে সরস্বতীদেবীর যেমন মুখ দেখাদেখি নেই—তেমন বোধ হয় এক আফগানিস্থান ছাড়া আর কোথায়ও নেই।

হরিদা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কথা বলছ, শচীন। শিক্ষা তুমি কাকে বল? যাতে মনের সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় এবং চরিত্র গঠন হয়, তাই তো শিক্ষা। এদিক থেকে বিচার কর্‌লে দেখতে পাবে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যত শিক্ষিতা এরূপ আর কোথাও নেই।

শচীন। কেবল মুখে বড় বল্‌লেই তো হয় না, কিসে বড় সেইটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

হরিদা। কিসে বড়? স্ত্রীলোকের যাহা প্রকৃষ্ট গৌরবের বিষয়—'মাতৃত্ব' তাতেই বড়। জান, কবি যা বলে গেছেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়—"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ"—কোথাও না।

শচীন। সর্ব্বত্র গেলেই পাওয়া যাবে। "মা" হওয়াটা ভারত-বর্ষের স্ত্রীলোকদেরি একচেটে নয়। আর এই যে আপনি বল্‌ছেন 'মাতৃত্বটা' আমাদের স্ত্রীলোকদের গৌরব, তা, ভাল-মা হবার উপ-যোগিতাই কি এদের আছে? শুধু বুকভরা স্নেহ থাকলেই ভাল-মা হয় না। পৃথিবীর ছোট-বড় নানা বিষয়ের ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি, যে মাতৃত্বের ভিতর নেই সে মাতৃত্বকে আমি বড় বল্‌তে পারিনে।

হরিদা। তোমার কাছে এক অভিনব কথা শোনা গেল। স্নেহ থাক্‌লে 'মা' হয় না, মাতৃত্বটা উঁচুদরের জিনিস নয়, বাৎসল্যটা মায়া-মাত্র, অদ্ভুত বটে।

অমিয়। চটেন কেন, হরিদা? শচীনের কথায় দোষটা কি হল? সত্যিই তো, মনে করুন, যদি সন্তানের জ্বর হয়, সে ভাল জিনিস কিছু খেতে পায় না বলে, মা যদি একটি সন্দেশ লুকিয়ে খেতে দেন, তাহলে তার জ্বর-বিকার হতে পারে। শুধু স্নেহটা থাকলেই চলে না, আরও কিছু দরকার। আর ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার যদি রোজগারের খাটুনিতে শ্রান্তক্লান্ত পিতারি নিতে হয়, তবে মাতৃত্বের গর্ব্বটা অত করি কিসের?

হরিদা। শুধু স্নেহ থাকলেই সব হয়। 'মা' কখনও রুগ্ন সন্তানকে কুপথ্য দিতে পারেন না। তোমরা যে শিক্ষা শিক্ষা কর, শিক্ষা কাকে বলে, তাই তোমরা জান না। মানচিত্র খুঁজে কোথায় পোপোকেটি-পেট্‌ল্ আছে তাই বের করার নাম শিক্ষা নয়; আর আকবর সাহের কটা হাতী ছিল—তা ঠিক না জানাটাই অশিক্ষা নয়।

শচীন। নিশ্চয়ই অশিক্ষা। পৃথিবীটা কি রকম, কোথায় কোন দেশে কি রকম লোক থাকে—এ সমস্ত না জেনে থাকা, আর ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকা—একই কথা।

হরিদা। ওঃ, তোমরাই ভারি সব জান কিনা? তোমরা পৃথিবীর কটা খবর রাখ? কটা রাসায়নিক তথ্য তোমার জানা? দুপাতা ইংরেজী পড়েই মনে ভাব তুমি ভারী শিক্ষিত; ধরতে গেলে, তোমাতে আর ঐ কেষ্টাতে আমি কোন প্রভেদই দেখি না। তফাতের মধ্যে কেষ্টা ভৃত্য আর তুমি বিয়ে পাস।

অমিয়। আপনি কি বল্‌তে চান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কোন উপকারে আসে না?

হরিদা। আসে বৈকি? এতে খুব অর্থ আসে। তা নিজে ঘরকন্না দেখে স্ত্রীকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় পাঠাতে চাও তাকে খুব ঠেসে শিক্ষা দাও। কোন আপত্তি নেই।

শচীন। বাজে কথা বলেন কেন? এই যে সব ছেলেরা মিল্‌টন, সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি বড় বড় কবিদের বই পড়ে, এতে করে কি তাদের মনের বিকাশ হয় না, বলতে চান? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ যে সভ্যতা মনপ্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমাদের কোন লাভ হয় না?

হরিদা। কাব্য-রসাস্বাদনের জন্য বহুদিন কষ্ট করে একটি বিজাতীয় ভাষা শেখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি বিবেচনা করিনে। তোমাদের ভবভূতি নেই, কালিদাস নেই, কৃত্তিবাস নেই, কাশীদাস নেই? তোমরা নিজের সোনার অলঙ্কার ছেড়ে পরের গিল্‌টিকরা জিনিস পরতে এত লালায়িত হও কেন? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ কি Civilization-এর চর্চ্চা করেছে? তা কি তোমাদের হতাদর আর্য্যঋষিদের Civilization-এর পায়ের কাছে লাগে? আমাদের সভ্যতা, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক নয়।

শচীন। আচ্ছা মানলুম, তাহলে আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা হয় নি, তা ত স্বীকার করেন? না তাও করেন না?

হরিদা। না, তাও করিনে। যে দেশে ন্যায়-দর্শনের এত গভীর গবেষণা হয়েছে সেখানে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয় নি, এটা অসম্ভব কথা।

তা ছাড়া চর্চ্চা নেই তোমাকে বল্লে কে? অঙ্কশাস্ত্র, রাসায়নিক শাস্ত্র এ সব তো আমাদেরি জিনিস।

শচীন। বটে? আর এই যে রেলগাড়ী চড়ে যাতায়াত কচ্ছেন, ট্রামে চাপছেন, বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাস ভোগ কচ্ছেন, এ সবও কি আপনাদের মহর্ষিরা দিয়ে গেছেন নাকি?

হরিদা। দেখ শচীন, তুমি আমাকে যা বলবে বল, কিন্তু আর্য্য-ঋষিদের সম্বন্ধে কোন শ্লেষ প্রয়োগ ক'র না। তাঁরা তোমার ঠাট্টার পাত্র নন।

শচীন। রেখে দিন আপনার আর্য্যঋষিদের। তাঁরা করেছেন কি? লোকালয় ছেড়ে এক পাহাড়ে গিয়ে বনে ধ্যান করেছেন; তাতে লোকের কি এল গেল? আর কাজের মধ্যে করেছেন এই যে বামুন, বৈদ্য, কায়েত, শূদ্র প্রভৃতি সমাজের নানা ভাগ তৈরি করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে চিরকাল একটা প্রভেদ থাকে, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত।

হরিদা। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কি বিষময় ফল হয়, তা তোমাদের দেখেই বেশ বোঝা যায়। বর্ণভেদ নিয়ে যে এতটা চেঁচামিচি কর, বলি বর্ণভেদ নেই কোথায়? ইউরোপে নেই? তাদের মধ্যে বামুন যাদের পয়সা আছে, আর যে হতভাগ্য গরীব সেই শূদ্র, তাকে ছুঁলে তাদেরও জাত যায়। এ খবর রাখ?

শচীন। সে বর্ণভেদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে, ভারতবর্ষও বাদ যায় না। আমাদের মধ্যে যার অর্থ বেশী তাকে সম্মান করিনে? চির-কালই করে এসেছি—কলির ভাগ্যে আজই যে করি তা নয় বরং ধনীর মান্য আজকাল কমে আসছে। আমাদের মধ্যে আছে দোকর

জাতিভেদ—এক পয়সার, আর এক জাতের। পয়সার উপদ্রব মানুষমাত্রকেই ভোগ কর্ত্তে হবে, তাই করি, কিন্তু তা'র উপরে যে আর একটা হাতেগড়া দৌরাত্ম্য সহ্য করব, তা অসম্ভব।

অমিয়। যাক, তোমরা কি বাজে কথা নিয়ে তর্ক কচ্ছ, সন্ধ্যা-বেলা। তর্কে তোমাদের মধ্যে যে জিতবে, তারি মতে সায় দিয়ে পৃথিবীটা চল্‌বে এই ভেবে তর্ক বাধিয়েছ—না কি? আচ্ছা হরিদা, আপনি তো বামুন, আপনি কি মনে করেন যে আপনার খাবার সময়ে আমি ছুঁয়ে দিলে, আপনি আর বামুন থাকবেন না—একদম কায়েত হয়ে যাবেন?

হরিদা। এম্নি ছোঁও কিছু ব'লব না, কিন্তু সামাজিক ভাবে যখন আহার করব, তখন ছুঁলে আমাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

শচীন। এই তো, এই জন্যেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার লাগে। মিথ্যার উপর যে সমাজের ভিত্তি তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। সমাজ আমাকে বল্‌ছেন—তোমার যা ইচ্ছে যায় কর, বিলেত যাও, মুসলমানের হাতে খাও, সব কর—কিন্তু সামাজিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেই বলা চাই, আমি কিছু করি নি তো! এ সব খুব ভাল, কি বলুন হরিদা?

হরিদা। তা ছাড়া, সমাজ কি করবে আর? লোক উচ্ছৃঙ্খল হবে, তা কি নেতারা এসে তাদের ধরে প্রহার করবে? মিথ্যা আচরণে কোনও দোষ নেই—উদ্দেশ্যটা যদি হয় খুব মহৎ।

শচীন। এটা আপনার নিতান্ত এ্ড়োতর্ক। মিথ্যার সাহায্যে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য কস্মিনকালে সিদ্ধ হয়ও নি, হবেও না। বিবেকানন্দ বলেছেন—

হরিদা। সব কথাতেই স্বামীজি, পরমহংসদেব এঁদের টেনে এন না। তোমার এই অভ্যাসটা বড় খারাপ। এঁদের কথা তুলতে তোমার একটুও সঙ্কোচ হয় না। এ অশ্রদ্ধার ভাবটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। স্বামীজি কি বলেছেন? তাঁর কথা তোমরা কেউ বোঝ? এটা দেখছি, ছেলেদের মধ্যে এক ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে—সবারি মুখে বিবেকানন্দের কথা। তাঁর 'বাণী' কেউ বোঝে না, কেবল কুতর্ক করবার জন্যে কতগুলি বুলি আওড়ায়।

শচীন। আপনারও এ রকম ত্রিকালজ্ঞ হবার ভাণটা কেউ ভাল বল্‌তে পারে না। ধর্ম্ম, স্বামীজি, পরমহংসদেব, সবি কি আপনার একলার? আর কেউ এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারবে না?

হরিদা। পারবে না কেন—আমি কি নিষেধ করি? যার অধিকার আছে সেই পারবে, অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়।

শচীন। মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে।

অমিয়। আপনারা কি কচ্ছেন, হরিদা? এই ফণীবাবুর বাড়ীতে এত তর্ক, আবার এখানে—কেন, এ রোগ কেন?

হরিদা। তর্ক আবার কি? যে যা খুসি বলবে আর সব নীরবে সহ্য করে যেতে হবে এ কোন কথা?

শচীন। সত্যিই তো, রাত হয়ে গেছে। কি রকম বাজে তর্ক করে সময়টা কেটে গেল। কিছু মনে করবেন না হরিদা, তর্কের মাথায় যা' তা' বলে ফেলেছি।

হরিদা। না, মনে কিছু করি নি, তবে তোমার আর একটু সংযত হওয়া উচিত। পাগলের মত তর্ক ক'র না আর কারু সঙ্গে। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

শচীন। বসুন না, হরিদা, এখনি যাবেন কেন?

হরিদা। না পালাই, আমার কাজ আছে।

[হরিদার প্রস্থান]

অমিয়। আচ্ছা, কি নিয়ে সমস্ত সন্ধ্যেটা তর্ক করলে? তুমি আবার ফণীবাবুকে তার্কিক বল্‌ছিলে!

শচীন। উঃ, বেজায় গরম বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যেটা কেটে গেল, চল গোলদীঘিতে একটা চক্‌কর দিয়ে আসি, তা না হলে ঠিক মাথা ধরবে। তুমি যা বল্‌ছ তা ঠিক, এদেশে তর্ক করে কোনও ফল নেই আর তর্ক ছাড়া করবারও আর কিছু ত নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন।

চৈত্র, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ছন্দ।

-:*:-

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কি তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখচি শুনচি জানচি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে-জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্চে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—অনির্ব্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তাহলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন তার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না—কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তু-জ্ঞানের চেয়ে আরো প্রবলতর গভীরতর। এই জন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা

যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন সে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাক। তফাৎ এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষের যে-পরিচয় হচ্চে তিনি আপিসের বড় বাবু সেটা আপিসের খাতা পত্র দেখ্‌লেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয় তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথেয় সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলঙ্কার চাই, কেননা কেবল মাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি—এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয় হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই ত হল একটা কথার ইসারা মাত্র—অথচ আপিসের বড় বাবুকে ত আমাদের কেরাণী-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্ম্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহলেই বোঝা যাচ্চে আপিসের বড় বাবুর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা নেই—কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না, যে ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা'লক্ষ্মীকে বুঝি নে—বরঞ্চ উল্টো। কেবল কথা এই, যে, বোঝবার বেলায় মা'লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেচে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে—অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখা শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে

যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পূরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।"

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই ত আলোকের রং বদল হচ্চে, শব্দের সুর বদল হচ্চে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করচে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্য-নিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তু ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগ-বৈচিত্র্য। যদিদং সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্চে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠ্‌চে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্চে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেচে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেচে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই

হল ভাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থাম্‌বে না। "সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েচে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেচে তা সবাই জানেন। দুটি পাখীর মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথা শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে-পাখীটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখী তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণ-তার ব্যথাটিকে ত কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুট্‌তে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বত-কালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বত-কালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই ত ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয় ত বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে' আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্চে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়—সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনি-বেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র—তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মত প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়—সেই নাড়ার প্রকার-ভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে-নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত-

ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন-বেগেই নিজেকে জানে—বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রস-সাহিত্য মাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখ্‌তে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এই জন্যে, যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুন্‌তে বুন্‌তে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম—তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর দুঃখ কোন খানেই নেই কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে—সে ঘটনা এখন ঘট্‌চে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যাহোক্, দেখা যাচ্ছে, গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চল্‌চে গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা,

দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সেত সুরের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যে হেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয় এই জন্যে সুরের মত কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেচি। বলেচি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কি অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাক্‌তে হিসাব করে বলা যায় না। সেই জন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্যথেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

"রজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্চে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুল্‌তেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্ম্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দ্দান্ত প্রতাপে লড়াই করচে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে এক দিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে—কিন্তু পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে—এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাক্‌বে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্ম্মরি' ॥
জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

এই ছন্দে হয়ত বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুট্‌ল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করচে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েচে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এসমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মত কাব্যে ছন্দের আবর্ত্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ"

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্চে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেল্‌চে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আস্‌চে। "শারদ চন্দ্র" এই কথাটি ছয় মাত্রার, "শারদ" তিন এবং "চন্দ্র"ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে "শারদ চন্দ্র" এবং "বিপিন ভরল" ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ,

৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি, মালতি যুথি, মত্ত মধুপ ভোরণী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করচে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্চে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা,

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান।

এও আট পদক্ষেপ।

১ ২ ৩ ৪
(To) night the winds be- gin to rise
৫ ৬ ৭ ৮
(And) roar from yonder dropping day

এই কবিতার প্রদক্ষিণের মাত্রাভাগও আট, আবার

১ ২ ৩ ৪
When we two parted in silence and tears
৫ ৬ ৭ ৮
Half broken hearted to sever for years

এ কবিতারও তাই। কিন্তু কানে শোন্‌বামাত্রই বোঝা যায় এরা ভিন্ন জাতের ছন্দ।

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সম-মাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই তিনের যোগে বিষম মাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্চে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ। আমরা যে-দুটি ইংরেজি কবিতা উপরে উদ্ধৃত করেছি—তার মধ্যে একটার চলন সমমাত্রার অর্থাৎ দুই মাত্রার—অন্যটার চলন অসম মাত্রার অর্থাৎ তিন মাত্রার—তাল দিয়ে গুণে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে। ইংরেজিতে বিষম মাত্রার ছন্দ আমার চোখে পড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েচে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দ সংখ্যা বেশি নয়। সম মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত ঃ—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে—সেও সম মাত্রার ছন্দ। অসম মাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

১। মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান দাস।

২। জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥

৩। সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

৪। বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

বিষম মাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েচে—সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নুপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সম মাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সব চেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি করতে পারেন।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।"

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।"

ভারি হল না।

"পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।"

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

"পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

"সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।"

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপ হত্যা হবার মত হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে—যথা,

দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম অসাধারণ শোষণ-শক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উল্টো। যথা—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে,
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
দেবতার অবতার বসুধার তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হাল্কা হতে হয়। যদি লেখা যায়,

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খ-রব সংসারের তলে—

তাহলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখ, সম মাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি—যেমন—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
হরি রিহ বিহরতি সরস বসন্তে।

ইংরেজিতেও তাই—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
Ah dis- | tinctly | I re- | member |
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
It was | in the | bleak De- | cember |

বাংলা পয়ারের মত এদের গম্ভীর মন্থর চলন নয়। কিন্তু ঐ ইংরেজিতে দুইয়ের চলনের বদলে চারের চলন যেখানে আসে সেখানে কেবল যে মন্থরতা, তা নয়, ছন্দের স্বাধীনতা বাড়ে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(O) Goddess, hear these | tuneless numbers, | wrung

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২
(By) sweet enforcement | and remembrance | dear, |

এই খানে বলা আবশ্যক wrung এবং dear শব্দকে দুই মাত্রা বলে গণ্য করেছি, তার কারণ উচ্চারিত syllableএর এক মাত্রার সঙ্গে বিরামের এক মাত্রা যোগ না করলে ছন্দ সম্পূর্ণ হয় না।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে—

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্ত্তী তিন মাত্রাকে চাচ্চে, কিছুতে তর সচ্চে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে—গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মত ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্ব্বত কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরি গুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্ব্বত কন্দর তলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুইই সমান।

বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্চে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

"অহহ কল- য়ামি বল- য়াদি মণি ভূষণং
হরি বিরহ দহন বহ- নেন বহু দূষণং।"

তিন মাত্রার "অহহ" যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার "কল" তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে— আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্ত্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত, তাহলে ছন্দই হত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্চে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্চে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেচি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা

যায় না—চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বসন্ত পাঠায় দূত   রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি   নিশ্বাস বহিয়া।

এই ত পয়ার—এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্ব্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগ্‌ত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ :—

ফাগুন এল দ্বারে   কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে   ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাৎ হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে—যেমন,

"ফাগুন এল দ্বারে-এ, কেহ যে ঘরে না-আ-ই।" কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন, "ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।" কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপ-মাত্রার পরিবর্ত্তন করে যদি পড়া যায় তাহলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুন্‌তে অন্য রকম হবে। এই খানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক্—যেমন,

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ দুই ভাগ করা যাক্ যেমন,—

তালি তালি তালি তালি
ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এই চোদ্দ মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক্ঃ—দুই পাঁচ দুই পাঁচ ভাগের ছন্দ—যথা—

। । । ।
সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে *
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার তিন চার তিন ভাগ—

। । । ।
নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

* এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

কিম্বা এক ছয় এক ছয় ভাগ—

| | | | |
যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে
কে বৃথা নিবেদনে রে ফিরে তার সনে।

সাত চার তিনের ভাগ—

| | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

| | | |
চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

তিন তিন তিন তিন দুইয়ের ভাগ—

| | | | |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে।

এ'কেই ছয় আটের ভাগে পড়া যায়—

| |
ব্যাকুল বকুল ঝরিল পড়িল ঘাসে।
বাতাস উদাস আমের বোলের বাসে॥

পাঁচ চার পাঁচের ভাগ—

| | |
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি,
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন ছয় পাঁচ ভাগ করা যায়—

। । ।
নীরবে গেলে ম্লান-মুখে আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে মোর বুকে না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্চে, প্রদক্ষিণের সমষ্টি মাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কি ভাবে নিকাস করচে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দ-রসায়নে নয়, বস্তু-রসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রাভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতি-ভেদ ঘটে রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা,—

ওহে পান্থ, চল পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লান-মুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ"—এইখানে একটা থামবার ষ্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চল",—"ওহে পান্থ চল পথে", "ওহে পান্থ চল পথে পথে।" তার পরে "বন্ধু আছে" এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়—যেমন, "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা বসে", "বন্ধু আছে একা বসে সে যে।" কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এই জন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, "নিশি দিল ডুব অরুণ সাগরে।" "নিশি দিল", এখানে থামা যায়— কিন্তু তাহলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়—"নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পূরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে।

কিন্তু আবার, "নিশি দিল ডুব অরুণ" এখানেও থামা যায় না, কেননা, তিন এমন একটি মাত্রা, যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে' পড়তে চায়—এই জন্য "অরুণ-সাগর"-এর মাঝখানে থাম্‌তে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভাল কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধকাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে' দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েচেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু" তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি" তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তি যোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ

বিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্ত বাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

চকমকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এই খানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি আর সেই জন্যেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলা-কাব্যে চলচে। স্বপ্ন-প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্ত্তন দেখা গেছে। স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই—

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অমূর্ত্ত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর-নীল বিবর্ণ অনল

শিখা-সজ্ব আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মত দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। ইংরেজি কাব্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
(O) Wild West Wind, thou । breath of Autumn's
৫ ৬
being ।

এর প্রথম ভাগে চার মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে যতিসমেত ছয় মাত্রা। মিল্টনের

Hail holy light, ofspring of Heaven's first-born

এও এই ছন্দে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার মাত্রা। এমনতর ভাগে কানের কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্চে তার ধ্বনির দীর্ঘ হ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলচি। বইটির নাম ছন্দঃ কুসুম। আজ চুয়ান্ন বছর পূর্ব্বের এটি রচনা। লেখক ভুবন মোহন রায় চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেচেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকীল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । ।
দেখহ সুন্দর লৌহ র থে চড়ি লৌহ প থে কত লোক চ লে
ষষ্ঠ মু হূর্ত্তক ম ধ্য করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লৌহ-বিনির্ম্মিত তার তরে বহুদূর-অবস্থিত লোক সবে
দূর অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্য্যের বিচার ভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকীল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল—তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বল্‌চি—এর প্রত্যেক পদবিভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা—সেই দীর্ঘ হ্রস্বের ওঠা-পড়ার পর্য্যায়ই হচ্চে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা

নাই কিম্বা নাই বল্লেই হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোন গৌরব দেয় না—অযুক্তের সঙ্গে একই বাট্‌খারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রা সংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহলে তার দশা হয় এই ঃ—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহা পথে কত শত মানুষ চ- লিছে।
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে তরে' যায় টিকিট কি- নিয়া।
যে সব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া
সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে
কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি—কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্চে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েচে। এ হচ্চে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই

সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড-ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নীচে নামে। ভাল শিক্ষা প্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়—থার্ড-ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমান ভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হোক্ হসন্তই হোক্ আর যুক্তবর্ণ ই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুতঃ পদেপদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে—সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান্
শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্চে বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন—আর এক হচ্ছে "বৃষ্টি" এবং

"কন্তে" কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস করা আব্‌লুস কাঠের মত পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্ত বর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রান্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্ত বর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেচে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি—কেন না যুক্ত বর্ণ যথেচ্ছা ছড়ানো হয়েচে মাত্র, তাদের মর্য্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটয় বড়য় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলুচেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা, সাধারণ মনোরমা
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা।

দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্য সংখ্যার অক্ষরে,
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে।
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতর দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বল্‌তে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেচে ; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সঙ্কোচে তার আত্ম পরিচয়ের খর্ব্বতা হচ্চে। একদিন বাঙালীকে বলা হত বাঙালী কেরাণীগিরি করতে পারে, বিশুদ্ধ বিশেষত অবিশুদ্ধ ইংরেজি লিখ্‌তে ও বলতে তার বাহাদুরী আছে কিন্তু সে রাষ্ট্রশাসন কিম্বা যুদ্ধ করতে পারে না। এমন অবিশ্বাস ও সন্দেহের কথা যত দিন বলা হবে, ততদিন আমাদের শক্তির প্রমাণ হবে না। প্রাকৃত বাংলাকেও সেইরকম অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের উপর রাখা হয়েচে সেই জন্যে তার পূর্ণ পরিচয় হচ্চে না। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলার লক্ষ্মীর পেটরায় সংস্কৃত, পারসী ইংরেজি প্রভৃতি নানা

ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্চে—সেই জন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন বশত সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরমায়েসি-গল্প।

মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে', সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে', যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে' গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বল্‌লেন—"ঘোষাল! গল্প বল"।

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়্‌তে না পড়্‌তে তাঁর ডান-ধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে—

যে-আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বল্‌বি বল্ ত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বল্‌বে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন—পণ্ডিত মহাশয়?

একটি অস্থি-চর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানু-নাসিক স্বরে উত্তর করলেন—

—তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বল্লে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন "কেন ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

—আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—

—এ লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটা ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে গেলে, গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা-খুসি হয়ে বল্লেন—

—তা ত বটেই, তা ত বটেই! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্ত্তমান, তাতেই না অলঙ্কার শাস্ত্রে ওর নাম—আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরচ্ছিল—এইবার আবার কথা বেরল—কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলঙ্কার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চল্লুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হ'ল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগ্‌বে? ও সব গল্প যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বল্‌লে—

—হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম কর্‌তে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে—হুজুরের ত আর সে ভয় নেই!

—দেখেছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বল্‌তে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বল্‌তে? শাস্ত্রে বলে যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সেই যথার্থ রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়েসেও যে রস আছে, এ কালের যুবোদের মধ্যে হাজারে এক জনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটা গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে। বল্‌লে অশ্লীল।

—কোন গানটা রে ঘোষাল ?

—"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুভারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইষ্টুপিট্ কানে হাত দিলে ? অমন কান মলে দিতে পার্‌লি নে ? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজি পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল !

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ কর্‌লেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ব বার কর্‌লে হে উজ্জ্বল নীলমণি ?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন কর্‌লেন, তাঁর নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয় ঘোরশ্যাম ; আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নাম করণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বল্‌লেন—

—আজ্ঞে, ইংরাজিনবীশদের যে মতিগতি ফির্‌ছে তা আমি জেনে শুনেই বল্‌ছি। আমারই জনকত পাসকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে, গান ধরত

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি তারা ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায় ?

—তফাৎটা কোথায় ? বল্‌লেন ভাল পণ্ডিত মশায়! একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন!

—অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে!

—অবাক করলেন! তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই ত বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক্ আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান ত আর টোলে জন্মায় না।

—বটে! অমরু শতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়—তাহলে মনু থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা কল্লেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ কর্‌বেন না পণ্ডিত মশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃত-কাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখ্‌ছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি কর্‌ছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়—কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি একবস্তু নয়—

একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধূলোয় গড়াগড়ি দেয় ?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

—পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন—আশ্চর্য্য ! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন ; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বল্‌তে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাট্‌ব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাট্‌তে দেব না"--এই ছিল তাঁর motto. তিনি তাই একটু গরম হয়ে বল্‌লেন—

– কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল নীলমণি ! তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি যুতসই উপমা লাগাও দেখি !

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাক্‌তে পারে—কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে ? করো ত অমনি একটা রসিকতা !

—-আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান !

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাক্‌তে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা ? ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাক্‌তে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাক্‌তে নেই ?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে।

—শুনুন পণ্ডিত মশায়! যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান, আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মশায়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহা খুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনির অনুমোদন কর্‌লেন। উজ্জ্বল নীলমণি এর প্রতিবাদ কর্‌তে উদ্যত হবামাত্র, তাঁর মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য হেঁচ্চধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বল্‌লেন—

—তোমরা কটায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে! আমি শুন্‌তে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে দিলেন তর্ক—আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগ্‌গির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চল্‌বে?

উজ্জ্বল নীলমণি বল্‌লেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈঃ জলদাগমে।"

—পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্য, আছে সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বল নীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ কর্‌লে—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্‌ মধুর রসের বলে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস্‌ নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তাকি আর জানিনে?

—আর দেখ্‌, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস্‌—একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জান্‌তে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা কিম্বা চুরিকরা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তাহলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার কর্‌লে সবাই সোনাকে বল্‌বে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্‌টি।

—অন্যে যে যা বলে তা বলুক—কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়্‌বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণমাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে;—আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়্‌ছে তা জল নয়,—একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়্‌বে বলত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল্ জল চুঁইয়ে পড়্‌ছে!

—হুজুর বল্‌তে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়্‌ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না।

এই শুনে দেওয়ানজি বল্‌লেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

—সে আর বল্‌তে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তার বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যার চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বল্‌ছ হে,—আমার?

—যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে? যাক্‌ ও সব কথা, এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বল্লি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয় ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতে হবে!

—হুজুর; অধৈর্য্য হবেন না; উদ্ধার ত করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ ত আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।

—তা ত জানি, কিন্তু তুই হয়ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি! গল্প সুরু করে দিলে তোর ত আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও ত অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল,

৯৫

একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ pneumonia হবে। এ যে বাঙ্গলাদেশ, তায় আবার কলিকাল!

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে দেখ্‌বেন,—কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনো অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলছে, বাইরের জলে তার কি করবে?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোম-জামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণসন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বল্‌তে পারে? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুট জুতো। তার পর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুট্‌ছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।

—কি বল্‌লি ঘোষাল, শ্রাবণমাসে দেওয়ালি,—তুই দেখ্‌ছি পাঁজি মানিস নে!

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গেত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—তা ত ঠিকই—আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি তখনই সেই উৎসব কর্‌তে পারেন।

—শুধু কর্‌তে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাক্‌ত তাহলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি ত নয়ই—

—উনি ত ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন।

—হুজুর আমি কোথাও যেতে চাইনে—যেখানে আছি সেইখানেই থাক্‌তে চাই।

—যেখানে আছেন সেইখানেই থাক্‌তে চান! যেন উনি থাক্‌তে চাইলেই থাক্‌তে পেলেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি!

—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব!

—দেখছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ্ থাক্, লোকটা অনুগত বটে। যাক্ ও সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে—তুই এখন বল্ তারপর কি হ'ল?

তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুকচিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়্‌ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশহাত দূরে একটা পর্ব্বতপ্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোমভোলানাথ!" বলে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মার্‌তে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়্‌কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড় জল হো হা করে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়্‌ল আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না—আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত!

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই,—রবারের।

—এই যে বল্‌লি বুট?

—বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?

তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ-দিকে একটা হারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জেলে সে দেখ্‌তে পেলে—ডান-দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত—একটি মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণ সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুটি পদ্মফুলের মত, গাল দুটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত, কাণ দুটি—

—রাখ্‌ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখ্‌ছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম কর্‌লে না!

—আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন্‌ দেবতার তা সে ঠাওর কর্‌তে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোনও জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক্‌, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম কর্‌বে না?

—আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের ত কোন ঠাকুরদেবতাকে প্রণাম কর্‌তে নেই—ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

—দেখ্ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখ্‌ছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।

—আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওল্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্ সন্ন্যাসী! দেখ্ যে, কখনো সাধুসন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব—রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা ঊর্দ্ধবাহু, দাদুপন্থী অঘোরপন্থী,—দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, আর যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর এ, ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

—হুজুর আমি বার করি নি, এরা নিজেই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টেঁা টেঁা কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়—শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো মোজাও পরে,

স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে ?

—আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

—বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

—বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা কর্‌লে কে ?

—হুজুর, জর্ম্মাণরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে ? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এদেশে চালান দেয়—তেমনি ওরা শঙ্করের সঙ্গে শঙ্করী মিলিয়ে এদেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন ?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বল্‌লেন—

—ঘোষাল যাদের কথা বল্‌ছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাসকরা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুসিমত সা'র জাগায় নি এবং নি'র জায়গায় সা বসিয়ে দেন।

রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাক্‌ল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বল্‌লেন—

—তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চল্‌বে না। ইষ্টপিটরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক নয় বর্ণ-চোরা খৃষ্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহলে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহলেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছা-চারের কথা শুন্‌তে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এই-খানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল—

—হুজুর, আপনি মিছে রাগ কর্‌ছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি ? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ !

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে। তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি কর্‌লে কেউ তা মানবে না—আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বল্‌ছি। হুজুর মনোযোগ কর্‌বেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জন প্রাণী না থাক্‌ত, তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে ? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত অথচ দেবী নয়—তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।

—খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস্‌ বটে।

ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পূজো করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর এক দিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বল্‌লি—ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই কর্‌তে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না—একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরা-ভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন্ সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়! অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষে পাগল হয়।

—আরে তাতে কি গেল এল? যার সঙ্গেই হো'ক না প্রেম করলেই ত মানুষে পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রী-লোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়্‌লে লোকে মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর আপ্সরার টানে মানুষ হয় উম্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই—অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বল্‌লেন? এ অবস্থায় ও ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালবাসায় ফেলি?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হ'ল?

—আজ্ঞে তাও কি হয়? যা হল তা শুনুন—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল—ব্রাহ্মণ যুবক সিধে ভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল—কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হ'ল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বল নীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন—

—আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হ'ল। রসশাস্ত্রে যাকে

বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হ'ল কি না ম্যালেরিয়া-জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে ঘোষাল কি রসিক।

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বল্লেন—

—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই ত চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিকভাব বলছ সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

— পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্তরস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।—

দেওয়ানজি ঐ কথার প্রতিবাদ করে বল্লেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আট্‌কে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন্ গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন—

—চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও ত তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে

নাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশী সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ্ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যা দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বল-নীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ ত আর জাতবিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি, বদনায় করে। তারপরে এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

—হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন—শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে ব্রাণ্ডিপানি বল্‌লে আর কোনও গোলই হত না। জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিসটে ত দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথায়ও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস্ ভাল। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণি

দোহার। এ বিষয়ে পণ্ডিত মশায়ের মত শুন্‌তে চাই—তোদের কথা শুন্‌তে চাই নে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা রত্নাবলী মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

—তাহলে কি আপনি বল্‌তে চান স্মৃতির ধর্ম্ম এক আর কাব্যের ধর্ম্ম আলাদা?

—আজ্ঞে তা ত হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টো হয়, তাহলে মানুষে কোনটা মেনে চল্‌বে?

—ছুটোই। কাজকর্ম্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেই হোক আর কাব্যেই হোক।

—তাহলে আপনারা কি চান, যে গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক্ গল্পের মত?

—আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে……

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তাহলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন ত।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান—যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা তারপর হয় বিয়ে নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত। কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তাহলে তুই দেখ্‌ছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মার্‌বি নয় প্রাণ মার্‌বি।

—আজ্ঞে প্রাণে মার্‌তে পারি কিন্তু জাত কিছুতেই মার্‌ব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই ?

—দেখ তোকে আগেই বলেছি ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ পড়ে লোকটা মারা যায় সেও কি আমার দোষ ?—এ দুর্য্যোগ কি আমি বানিয়েছি ?

—কি বল্‌লি ? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সুমুখে, বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি ! যেমন করে পারিস মিলনান্ত কর্‌তেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে আমিও ত সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয়

তা বলতে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ দুই টিঁকিয়ে রাখব—তারপর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তাহলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে।

—আচ্ছা বলে যা।

—তবে শুনুন।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাকল না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাকাটা সামলানো মুস্কিল, তার পর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞানচৈতন্ত ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলে। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধা—আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে,—বোধহয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তারপর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব। তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে দিলে।

—"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
'পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বল্‌ছেন,—

"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর, লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি কর্‌লে হে।

"চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর"

বল্‌লে ও কবিতার আর থাকে কি? আর যার তুল্য কবিতা ভু-ভারতে কখন হয়ও নি হবেও না, তারই কি না জান মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা কর্‌ছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি তাতেই ত উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরবে তার রঙ ত লাল। তবে বল্‌তে পারিনে; হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়্‌ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়। কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব—

—হুজুর, তর্ক আমি করি? আমি একজন গুণী লোক—নভেলিষ্ট।

কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প কর্‌তে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বল্‌ছেন।

—বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন—হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়্‌বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে—মেয়েটার বয়েস কত?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা না বিধবা?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্? ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী! বাঙ্গালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙ্গালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই—বলে দিলি হিন্দুস্থানী!

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শ্বাশুড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হো'ক না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানী ও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। তাদের মেয়েদের পেটে থাক্‌তেই পাত্র ঠিক ও পত্র হয়ে যায়। জানিস দুধের দাঁত পড়্‌বার আগে মেয়ের

বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড় দেখেছিস—বল্‌ত গাধা!

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি—মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে!

—হুজুর, এই দুর্য্যোগের মধ্যে—

—দুর্য্যোগ ফুর্য্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ত দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন্ ত বেচারা যায় কোথায়? হো'ক না মুসলমান, মানুষ ত বটে,—আমাদের মত ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।

—খোপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমার হুকুম মানবি কি না বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্ নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হ'ত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা? কুলীনের মেয়ে গায়ে ওড়না ওড়ে আর কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে।

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা—আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।

—এই যে বল্‌লি সলমা চুমকির কাজ করা ?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

— তাই বল্‌। আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা……

—অমন ভুল করিস কেন ?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্‌ ছার—তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্‌ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্‌। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্‌ বল্‌ ত ? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের, প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান কর্‌ব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হল শুনুন।

ভালবাসা জিনিসটে অন্ততঃ কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা এক-জনের মনের সিগরেট থেকে আর একজনের মনের সিগরেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে, শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধরতে সুরু করলে।

—কি বললি—শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে? গাছে না উঠতেই এক কাঁধি—বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস? পোর্ট বল্ ক্লারেট বল্ জিন বল্ রম্ বল্ হুইস্কি বল্ ব্রাণ্ডি বল্,—আমার ত আর কিছু জানতে বাকী নেই। শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরেনা, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রেস্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়।

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ্ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না—কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোনও বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তাহলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার যো নেই?

—আমি ত তা বলিনি,—আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ,

তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন।

তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুতের। সে বিদ্যুৎ স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল—তারপর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ।"

—উজ্জ্বল নীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন্ আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ "নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসের" বেশী আর আমি যেতে দেব না।

—আজ্ঞে এর একটা ত আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে ওঠে চুম্বক।

—বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বল নীলমণির—এখন দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই।

— হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ও সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন—"যব গোধুলী সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি।"

—ঘোষাল নিজে কর্‌বি কুকীর্ত্তি আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি নি—বাংলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না কর্‌লে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বস্‌ব,—আমি ত একজন ছোট গল্পকার। মহাজনো যেন গতা স পন্থা হিসেবেই আমি চলি।

—বাংলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চ্চা আর বেশী কর্‌তে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।

—তাহলে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলেছিস্ মন্দির আর এখন বলছিস ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভিতর ঠাকুর থাক্‌ত না? আগেই ত বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে। খুব ডিগ্‌বাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি!

—আচ্ছা যাক্, এখন তুই গল্প বলে যা, গল্পটা এতক্ষণে জম্‌ছে।

—হুজুর তার পর—

ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়ল আর তার অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মত লাল টুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্ সিঁদুরের কথা কি বললি?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি।

—উঃ তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস—

—তাহলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে হয়ে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে সধবাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?

—কি বল্লে উজ্জ্বল নীলমণি, ক্ষতি কি?

—আজ্ঞে আমি বলছিলুম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে উঠল। উজ্জ্বল নীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন—

—হয় কি না হয় তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের করচা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, 'এমন কি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত.........

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে এক সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু করলে—কেউ কারও কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বল নীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলোর" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে

ছাড়িয়ে ওঠে—তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুন্‌তে পেলে তিনি বলছেন—

—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন—তারপর যত খুসি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মীনারী"—সে না হলে সংসার চলে না; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান ত পদাবলীতে.........

—রক্ষা করুন গোঁসাইজি থামুন, আপনার ও সব মত এখানে চল্‌বে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হ'লে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিত মশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস,—যা মুখে আস্‌ছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হ'ল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধর্‌তে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। একালে ও ওসব কথা মুখে আন্‌তেও নেই, কেননা তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে

চালাও, দু'দিন পরে তা সমাজে চলবে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে—তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠোনো ভার। আজ যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে পণ্ডিত মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিকচ্ছ হওয়ায় তাঁর গতিরোধ হ'ল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে—

—আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি আমাকে বিনা অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলে যে সধবা হতেই হবে এমন ত কোনও কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল রুলি।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হ'ল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বললেন—

—ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর্—নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদি অন্ত নেই—আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি

গেরস্তর ঝি বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কিরে—

—হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন। শুনুন—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বললে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বেস করলে না। "আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়্ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিন্‌তে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণ সন্তান বুঝতে পার্‌লে "এই সেই"; অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত "তত্ত্বমসি" বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছুই পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুঁকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখাগেল মন্দির একেবারে শূন্য

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি।

—হুজুর ভূতের গল্প শুন্‌তে চেয়েছিলেন তাই শোনালুম।

বলা বাহুল্য ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সব

চেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল নীলমণি। তিনি দাঁত-খিঁচিয়ে বল্লেন-

ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প!

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খবর এলো যে মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও ভঙ্গ হ'ল।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।